চিন্ময় গুহ

চিলেকোঠার উন্মাদিনী

ফরাসি সাহিত্য বিষয়ক
ও অন্যান্য প্রবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিলেকোঠার উন্মাদিনী

ফরাসি সাহিত্য বিষয়ক ও অন্যান্য প্রবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিলেকোঠার উন্মাদিনী

ফরাসি সাহিত্য বিষয়ক ও অন্যান্য প্রবন্ধ

চিন্ময় গুহ

আ ন ন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৭
পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৬

© চিন্ময় গুহ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7756-652-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

CHILEKOTHAR UNMADINI
[Essay]
by
Chinmoy Guha

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২০০.০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শঙ্খ ঘোষ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

•

•

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের
অন্যান্য গ্রন্থ

•

গাঢ় শঙ্খের খোঁজে ও অন্যান্য প্রবন্ধ
ঘুমের দরজা ঠেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

উচ্চভ্রূ নয়, সাধারণ পাঠকের জন্য বিভিন্ন সময়ে রচিত এই নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি একসঙ্গে প্রকাশিত হলে সেটা কারুর কারুর কাজে লাগতে পারে মনে করেই এই বইয়ের পরিকল্পনা। চুরমার হতে থাকা আজকের এই পৃথিবীতে এগুলির মধ্যে কোনও গোপন অন্তঃসূত্র পাওয়া যাবে বলে ভাবতে চাই।

এগুলির মধ্যে কয়েকটি রচনা গ্রন্থ-সমালোচনা হিসেবে প্রথমবার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও কিছু নতুন তথ্য ও ইশারার সন্ধান দিতে পারে মনে করে এ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হল। 'অন্নদাশংকর ও রম্যাঁ রলাঁ' এবং জর্জ সাঁদ বিষয়ক প্রবন্ধ দুটি যথাক্রমে তাঁদের জন্মশতবার্ষিকী ও দ্বিশতবার্ষিকীর সময় সাহিত্য অকাদেমি ও আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনাচক্রের জন্য লেখা হয়েছিল। সেই দুটি বাদে বাকি লেখাগুলি বিভিন্ন সময়ে 'দেশ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বহুরূপী', 'অনুষ্টুপ', 'বিভাব', 'প্রমা', 'সানন্দা', 'জলার্ক' প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপা হয়।

টি. এস. এলিয়ট ও রম্যাঁ রলাঁ-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে কখনও কখনও দু-একটি পুনরাবৃত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে, সেগুলি হয়তো কিছুটা অনিবার্য ছিল। যেসব লেখায় ফুটনোট ছিল না, সেগুলিকে আর নতুন করে টীকাকণ্টকিত করিনি।

বানান-সমস্যার জন্য যাঁদের বিরক্ত করেছি তাঁরা হলেন আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী, শ্রীসুভাষ ভট্টাচার্য ও শ্রীস্বপন মজুমদার। বিদেশি নামের উচ্চারণের ব্যাপারে শ্রীভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণা ও সাহায্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। সস্নেহে সূচিপত্র সাজিয়ে দিয়েছেন শ্রীশঙ্খ ঘোষ। সবরকম সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী অনসূয়া গুহ।

এই বই প্রকাশ করার জন্য যিনি বারবার অনুরোধ করেছেন সেই শ্রীশান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতে চাই। শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিও আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

২৫ নভেম্বর ২০০৬ **চিন্ময় গুহ**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

আত্মহত্যার ইতিহাস ১১

চিলেকোঠার উন্মাদিনী: ভিভিয়েন এলিয়ট ২৪

কবর খোঁড়া কবিতা ৪১
এক অনাবিষ্কৃত আকাশ ৪৯
এলিয়টের ফরাসি ঋণ ও কিছু প্রশ্ন ৫৯

লা রোশফুকোর মাক্সিম ৭০
প্রতিহিংসার অভিধান ৮৪
অন্য এক বিপ্লব ৯৬

নতুন পৃথিবীর নতুন মানবী: জর্জ সাঁদ ১০৩
মালার্মে-কাহিনি ১১১
আঁরি মিশো: কেন্দ্র ও অনুপস্থিতির মাঝখানে ১২২
স্বপ্নের কারিগর ১৩১
শূন্যতার মহাকাব্য ১৩৮

আয়না ভাঙতে ভাঙতে ১৪৩
সার্ত্র: নিখাদ জীবনের খোঁজে ১৫৪
বরফে ঢাকা আগ্নেয়গিরি ১৬৩
রম্যাঁ রলাঁ ও ভারতবর্ষ: বিস্মৃত এক সংলাপ ১৭২
ভালবাসার সেতু: রম্যাঁ রলাঁ-কালিদাস নাগ চিঠিপত্র ১৮৬
পরিশিষ্ট ১: রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রলাঁর একটি ব্যক্তিগত চিঠি ১৯৭
পরিশিষ্ট ২: দিনান্তের চিঠি ২০৮
অন্নদাশংকর ও রম্যাঁ রলাঁ ২১১
এক অসম্পূর্ণ গবেষণার খতিয়ান ২১৬

সুরের বাঁধনে: রবীন্দ্রনাথ ও স্যাঁ-জন পের্স ২২১
রদ্যাঁ ও সত্যজিৎ: ভাস্কর্যের চলচ্চিত্র ২৩০
বাংলায় অনুবাদের সমস্যা ২৩৩
অন্য জলবাতাস অন্য তুলিতে ২৪১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যার ইতিহাস

আমরা মনকে বলি, না, কিন্তু যতই ঘুরিয়ে নিই মুখ, উটের গ্রীবার মতো কোনও এক নিস্তব্ধতায় সে ফিরে ফিরে আসে। বন্ধু পরিজনের দুঃসংবাদ ধামাচাপা দিতে চাই, পরিসংখ্যানের অস্বস্তিকর খবর রাখতে চাই না, তবুও কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা একটি প্রশ্ন আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে খেলা করে।

আমরা জেনেও জানতে চাই না পিথাগোরাস ও ডেমোস্থেনেস আত্মহত্যা করেছিলেন, যেমন করেছিলেন ক্লেওপাত্রা, কাতো, সেনেকা ও লুক্রেশিয়ুস। আর এ যুগে গত দেড়শো বছরেই জেরার দ্য নেরভাল, মোপাসাঁ, নীচে, মঁতেরলাঁ, মায়াকোভস্কি, স্টেফান ৎসোয়াইগ, ভার্জিনিয়া উলফ ও সিলভিয়া প্লাথ। প্রথম যৌবনে এক প্রিয়জনের আত্মহত্যা ঘনান্ধকার রাত্রির মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে; অনেকদিন পরে তিনি হঠাৎ ব্লেড দিয়ে শিরা কেটে ফেলার সহজতার কথা বলেছিলেন রানী চন্দকে। জীবনানন্দের মৃত্যু যে আসলে আত্মহত্যা এমন কথা বিশ্বাস করতেন অনেকে, বিশেষত কবি-বন্ধু সঞ্জয় ভট্টাচার্য, যিনি নিজেও আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। আর আমরা হতভম্ব হয়ে যাই জেনে যে স্বয়ং মহাভারতের রচয়িতা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, যুধিষ্ঠির একাধিকবার জীবন সম্পর্কে ক্লান্তির কথা বলেছেন, ভীষ্ম বা কৃষ্ণের 'স্বেচ্ছামৃত্যু'কে আত্মহনন ছাড়া কী বলব?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের মতে সারা বিশ্বে দশ লক্ষাধিক মানুষ আত্মহত্যা করেন, গত ৪৫ বছরে এই মৃত্যু বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬০ ভাগ, ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সের তরুণদের ক্ষেত্রে এটি মৃত্যুর তিনটি প্রধান কারণের একটি, প্রতি ৪০ সেকেন্ডে বা তারও কম সময়ে অন্তত একজন আত্মহত্যা করেন। আমেরিকাতেই আত্মহত্যার সংখ্যা হত্যা বা এডস-এ মৃত রোগীর চেয়ে বেশি। গরিব ধনী সব দেশেই এই বিকল্প ধারাটি গোপন ঝরনার মতো বহমান। অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিথুয়ানিয়া, বেলারুস, এস্তোনিয়া, কিউবা, ডেনমার্ক, পোল্যান্ড, জার্মানি, জাপান, হাঙ্গেরি, রাশিয়া, ইউক্রেন, নিউজিল্যান্ড, মরিশাস, সুইটজারল্যান্ড... সর্বত্র দেখা যাবে আত্মহত মানুষের ভিড়। আর ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র ও কেরালাকে ছাড়িয়ে গেছে খোদ পশ্চিমবঙ্গ! আমরা জানি আত্মহত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টাগুলিকে ধরলে এই সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। মিনোয়ার দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ফ্রান্সেই মোট প্রচেষ্টার দশ ভাগের এক ভাগ 'সফল' হয়। তবুও জীবনকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার, জীবনকে নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন তোলার এইসব উদাহরণ নিঃশব্দে মাটির নীচে চাপা দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে চলেছি আমরা।

বিশিষ্ট ফরাসি গবেষক জর্জ মিনোয়ার ফরাসি ভাষায় রচিত 'আত্মহত্যার ইতিহাস : স্বেচ্ছামৃত্যুর মুখোমুখি পাশ্চাত্য সমাজ' ('ইসতোয়ার দ্যু স্যুইসিদ : লা সোসিয়েতে অকসিদাঁতাল ফাস আ লা মর ভোলঁতের') বইটির দৃষ্টি পশ্চিম ইউরোপে, প্রধানত ফ্রান্স ও ইংলন্ডে নিবদ্ধ থাকলেও অনেকগুলি সর্বগ্রাহ্য সংকেত ছুড়ে দেয়।

বিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে মিশেল ভোভেল, ফ্রাঁসোয়া লোব্রাঁ, পিয়ের শোন্যু, ফিলিপ আরিয়েস, জন ম্যাকম্যানারস প্রমুখেরা অতীতের মৃত্যু-ইতিহাস নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ হিস্টরিওগ্রাফি তৈরি করেন, তাতে একটি বিষয় বাদ রাখা হয়: আত্মহত্যা। অথচ বইগুলির নাম ছিল : 'লা মর এ লকসিদাঁ দ্য ১৩০০ আ নো জুর' ('১৩০০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মৃত্যু ও পাশ্চাত্য'), 'লা মর আ পারি : সেজিয়েম ও দিজয়্যুইতিয়েম সিয়েকল' ('প্যারিসে মৃত্যু, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক'), 'লম দ্যভাঁ লা মর' ('মৃত্যুর সামনে মানুষ'), 'ডেথ অ্যান্ড দ্য এনলাইটেনমেন্ট'।

এই অনুপস্থিতির কারণ আমাদের জানা। স্বাভাবিক মৃত্যুর মতো এই মৃত্যুর খতিয়ান সহজলভ্য নয়। যেহেতু আত্মহত্যা একটি অপরাধ বলে পরিগণিত, ঐতিহাসিককে অনেক সময় আদালতের দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখতে হয়। তা ছাড়া আত্মহত্যা সংক্রান্ত কাগজপত্র খুবই এলোমেলো, বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত বলে প্রায়শ তার কোনও মাথামুন্ডু থাকে না, এবং সবচেয়ে বড় কথা, তা যথেষ্ট নয়। সেগুলি তৈরি হয় স্মৃতিকথা, ক্রনিকল, খবরের কাগজের আধা-মনগড়া রিপোর্টাজ দিয়ে। তা ছাড়া

তথ্যের অভাবে আত্মহত্যার সংখ্যা নগণ্য মনে হয় : যেমন, ফ্রান্সে বছরে মাত্র কয়েকশো আত্মহত্যা সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য খবর পাওয়া যায়, যা সিরিয়াস ডেমোগ্রাফিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। মিনোয়ার মতে, এই মেথডোলজিকাল কারণগুলির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে একটি গভীরতর কারণ: আত্মহত্যার তাৎপর্য জনগণনাতত্ত্বে বা পরিসংখ্যানে নয়, তা নিহিত রয়েছে দর্শনে, ধর্মে, নৈতিকতায়, সংস্কৃতিতে, যদিও তা নৈঃশব্দ্য ও লুকোছাপার এক ধোঁয়াটে চাদর দিয়ে ঢাকা।

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরকহাইমের 'আত্মহত্যা' প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে। তার পরেই সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ডাক্তারেরা সমকালীন পরিসংখ্যান ব্যবহার করে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ শুরু করেন। সাহিত্যসূত্র থেকে আহৃত ইয়োলাঁদ গ্রিজের 'ল্য স্যুইসিদ দঁ লা রোম আঁতিক', জাঁ-ক্লোদ স্মিটের অসাধারণ নিবন্ধ 'মধ্যযুগে আত্মহত্যা' ও রনেসাঁসের সময় আত্মহত্যা নিয়ে বেরনার পোল্যাঁর গ্রন্থটি ছাড়াও ১৯৯০ সালে প্রকাশিত মাইকেল ম্যাকডোনাল্ড ও টেরেন্স মারফির 'স্লিপলেস সোলস: সুইসাইড ইন আর্লি মডার্ন ইংল্যান্ড' ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইংলন্ডের আত্মহত্যা-সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ দলিল বলে চিহ্নিত হবে। মিনোয়া জানাচ্ছেন, পুরাকাল থেকে বিশ শতক পর্যন্ত তথ্যের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই আলবের বাই রচিত 'ল্য স্যুইসিদ এ লা মরাল'। জাঁ বাকলার দেখিয়েছেন জন্তুজানোয়ারের আত্মহত্যা আজ একটি মিথ বলে প্রমাণিত, একমাত্র মানুষই পারে তার অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে, জীবনকে ছোট করার সিদ্ধান্ত নিতে। আদ্যিকাল থেকে মনুষ্যজাতির সিংহভাগ বেঁচে থাকতে চেয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ—যেমন পাশ্চাত্যে কাতো বা সেনেকা—এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে আত্মহত্যার সবিশেষ মানবিক সিদ্ধান্তই হল মানবস্বাধীনতার শেষতম প্রমাণ। রেমঁ আরঁ-র ভাষায়, 'আত্মহত্যা মানে কি যন্ত্রণার সামনে চুরমার হয়ে যাওয়া, না নিজের জীবনকে শক্ত মুঠোয় ধরে তার ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করা?'

মিনোয়ার বইয়ের কালো প্রচ্ছদে গুইদো কান্নিয়াচির আঁকা আত্মহত লুক্রেশিয়ুসের ছবি, এপিগ্রাফে 'হ্যামলেট' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যের সেই প্রশ্নময় স্বগতোক্তি: 'To be, or not to be'। জীবন সম্পর্কে হ্যামলেটের ওই প্রাথমিক প্রশ্নই এই বইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয়। একই প্রশ্ন

তুলেছেন কাম্যু তাঁর 'সিসিফাসের মিথ' গ্রন্থে, যার প্রথম লাইন: 'জীবনে একটিই সত্যিকারের দার্শনিক সমস্যা রয়েছে: সেটি হল আত্মহত্যা।' তবু বিশ শতকের স্বদেশি কাম্যুর চেয়ে রনেসাঁসের এক ইংরেজি টেক্সটকেই গুরুত্ব দিয়েছেন মিনোয়া, কারণ তাঁর অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হল রনেসাঁসেই প্রথম এ বিষয়ে গূঢ় চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয়।

আত্মহত্যা চিরকালই সামাজিক নিন্দার তালিকায় শীর্ষে। মধ্যযুগ সেটিকে ঈশ্বরের অবমাননা হিসেবে, জঘন্যতম অপরাধগুলির একটি বলে গণ্য করেছে, এবং আত্মহত্যাকারীদের জন্য বিদঘুটে ও ভয়ঙ্কর সব শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। প্রথম অধ্যায়ে লেখক ফরাসি দেশে তেরো থেকে পনেরো শতকের আত্মহত্যার খতিয়ান থেকে দেখিয়েছেন ১২৪৯ সালে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেদেরিকের মন্ত্রী, কবি ও আইনজ্ঞ পিয়েত্রো দেল্লা ভিন্যা আত্মহত্যা করেন। অতঃপর তাঁর স্থান হয় দান্তের 'নরকে'। ১২৫৭ সালে এক প্যারিসবাসী স্যেন নদীতে ঝাঁপ দেয়। মৃত্যুর আগে তাকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়, সে ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা করলেও বিচারালয় তার দেহকে ছিন্নভিন্ন করার নির্দেশ দেয়। ১২৭৪ সালে খুনের দায়ে অভিযুক্ত পিয়ের ক্রোশে আত্মহত্যা করে। চার্চ তার মৃতদেহকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ১৩৫৮ সালে এক বিদ্রোহী কৃষক কারারুদ্ধ অবস্থায় হতাশায় গলায় দড়ি দেয়। ১৩৯৯ সালে স্ত্রাসবুরের এক বিরাট ধনী ও ধার্মিক ব্যক্তি গির্জায় স্বীকারোক্তির পর নদীতে ঝাঁপ দেয়। ১৪১৮ সালে গৃহযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও পুত্রশোকে বিপর্যস্ত সারসেলের এক বৃদ্ধ কশাই গাছে ঝুলে আত্মহত্যা করে। ১৪২৩ সালে প্যারিসের এক দরজি প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায় জানালা থেকে লাফ দেয়। ১৪২৬ সালে এক দড়ি বিক্রেতার ধার্মিক স্ত্রী ব্যভিচারী স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গলায় দড়ি দেয়। ১৪৬০ সালে প্যারিসে লোকসভার উপদেষ্টা ফিলিপ ব্রাক সেলারের ভেতর আত্মহত্যা করেন। ১৪৮৪ সালে এক তরুণীকে নিয়ে বিবাদের পর মেজ-এর এক বাসিন্দা গলায় দড়ি দেয়। স্মৃতিকথা, খবরের কাগজ, আইনি দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত এই এলোমেলো খতিয়ান থেকে মিনোয়া বোঝাতে চেয়েছেন যে ১) সব শ্রেণির পুরুষ ও নারীর মধ্যে আত্মহত্যার প্রচলন ছিল। ২) এর কারণগুলি আজকের মতোই: দারিদ্র, অসুস্থতা, শাস্তির ভয়, আত্মমর্যাদা, অবমাননা, প্রতিশোধ,

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেম ও ঈর্ষা। ৩) সামাজিক ও ধর্মীয় আইন হাত মিলিয়ে এটিকে 'শয়তানের প্রলোভন' ও পাগলামি বলে চিহ্নিত করে। এটিকে দমন করার প্রচেষ্টার অঙ্গ ছিল শবদেহের ওপর অত্যাচার ও পরিবারের সম্পত্তি অধিগ্রহণ। লাশটিকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হত, পা থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হত, পুড়িয়ে বা ছুড়ে ফেলে দেওয়া হত, আর ইংলন্ডে চৌরাস্তায় মাটিতে পুঁতে ফেলা হত যাতে 'নরকবাস সুনিশ্চিত হয়।'

আত্মহত্যা সম্পর্কে মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্যের দ্বিধার কথা লিখতে গিয়ে জর্জ মিনোয়া গির্জা ও খ্রিস্টধর্মকেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, 'ঈশ্বর তোমাকে জীবন দিয়েছেন, তাঁকে অবমাননা করা পাপ।' এই নিষেধাজ্ঞার মূল ভিত্তিটিই নড়বড়ে। নিউ টেস্টামেন্ট সরাসরি এই সমস্যার কথা না বললেও মিনোয়া প্রশ্ন তুলেছেন, যিশুর মৃত্যু আত্মহত্যা ছাড়া আর কী? 'La mort de Christ n'est-elle pas un véritable suicide?' (পৃ. ৩৪) উদ্ধৃত করেছেন যিশুর সেই অমোঘ উক্তি: 'No one takes it (my life) from me, but I lay it down of my own accord.' (জন ১০, ১৮) মিনোয়ার মতে, খ্রিস্টধর্মের প্রাথমিক ভিত্তিই যখন এক আত্মহত্যা, করুণা (compassion) জাগানোই যার লক্ষ্য, শিষ্যেরা যার জয়গান করেছেন, তখন এত অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধিতা কেন? 'জীবন অসহনীয়, কিন্তু তাকে সহ্য করতে হবে; মৃত্যু বরণীয়, কিন্তু স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে গ্রহণ করা চলবে না, এই কঠিন পরীক্ষার ওপর খ্রিস্টধর্ম স্থাপিত।' (পৃ. ৩৬) সুতরাং, লেখকের মতে, আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করার নীতি তৈরি করার জন্য সবরকম 'ধর্মতাত্ত্বিক চাতুরী'র প্রয়োজন হয়েছে।

গ্রিক-রোমান সভ্যতায় আত্মহত্যা নিয়ে গোটা একটি অধ্যায় রয়েছে। রনেসাঁসের মানুষ মুগ্ধ হয়ে জেনেছে আরিস্তোদেমাস, ক্লিওমেনাস, ইসোক্রেতাস, নেমোস্থেনিস, পিথাগোরাস, এমপিদোক্লিস, দেমোক্রিতাস, দিওজেনাস, হেগেসিয়াস, ক্লিয়েন্থাস, ক্রাসুস, মারিয়ুস, কাতো, আন্তোনিয়ুস, ক্লেওপাত্রা, ব্রুতুস, কাস্‌সিয়ুস, সিলেনাস ও সেনেকার আত্মহত্যার কথা। ওই রকম সম্মানজনক এক তালিকা কি কাপুরুষতার সাক্ষ্য বহন করতে পারে? তবু প্লাতোন আত্মহত্যা সম্পর্কে কিছুটা অনিশ্চিত, আরিস্তোতল মনে করতেন তা সম্পূর্ণত নিন্দনীয়, নিজের ও রাষ্ট্রের প্রতি অবিচার। অন্য দিকে, রোমানরা আত্মহত্যার সবচেয়ে বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্থক ছিলেন। ইওলাঁদ গ্রিজে রচিত 'প্রাচীন রোমে আত্মহত্যা' নামক ফরাসি গ্রন্থে খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী থেকে ২য় শতাব্দী পর্যন্ত ৩১৪টি আত্মহত্যার নমুনা পেশ করা হয়েছে। কোনও নিষেধ বা আইনি সমস্যা ছিল না, শেষকৃত্য সম্পন্ন হত স্বাভাবিকভাবে। অবশ্য গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যু পছন্দ করা হত না। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫ সালে ৪৫ বছর বয়সে কবি লুক্রেশিয়ুস আত্মহত্যা করেন। তিনি লিখেছিলেন' 'প্রত্যেকেই নিজের কাছ থেকে পালাতে চায়, কিন্তু পারে না, শুধু অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের সঙ্গে নিজেকে ঘৃণা করে বেঁচে থাকে।'

যে নৈতিক নিষেধাজ্ঞার কাঠামোতে তিনি বড় হয়েছেন এবং যে বৌদ্ধিক উন্মুক্ত ভাবনা তিনি ভাবতে চান তার মাঝখানে দোদুল্যমান টমাস মোর ১৫১৫ সালে লিখেছিলেন ইউটোপিয়ার দ্বীপের দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বাসিন্দারা পাদ্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে আত্মহনন করতে পারে: সেক্ষেত্রে সেটা হবে এক পরম মহত্ত্বের কাজ। এই স্টোইসিজম্ সেনেকার কথা মনে করিয়ে দেয়: 'যখন জানব যে আমার কষ্টের শেষ হবে না, তখন নিজেই জীবন থেকে সরে যাব।' বইয়ের এই অংশটি এতই স্পষ্ট ও অস্বস্তিকর যে ধার্মিক কায়েমি স্বার্থ সঙ্গে সঙ্গে তাতে কাঁচি চালায়। ১৫৩৪ সালে টাওয়ার অফ লন্ডনে বন্দি অবস্থায় কিন্তু টমাস মোর আত্মহত্যা করেননি, উলটে একটি বই লেখেন যার নাম 'এ ডায়ালগ অফ কমফর্ট।' সেখানে মোর লিখে বসলেন আত্মহননের চিন্তা সবসময়ই শয়তানের থেকে উদ্ভূত এবং সেন্ট অগাস্টিনের মতো স্যামসনও নিশ্চয় ঈশ্বরের ডাক পেয়েছিলেন। এর ফলে যুক্তি ও প্রথাগত নৈতিকতার মধ্যে ঠিক কোনটা তাঁর কাছে বেশি কাম্য বোঝা যায় না।

ইউরোপীয় রনেসাঁসের যে ব্যাপক সংস্কারমুক্ত জীবনজিজ্ঞাসা, আত্মহত্যা তার অংশ হয়ে গিয়েছিল। ১৬০০ সালে ছুড়ে দেওয়া হ্যামলেটের মৌলিক প্রশ্নটি আধুনিকতার জন্মের সঙ্গে যে গভীর অসুখের জন্ম তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ১৫৮০ সালে স্যর ফিলিপ সিডনি তাঁর 'আরকেডিয়া'-তে আত্মহত্যার পক্ষে-বিপক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেন। মঁতেনের 'লা কুত্যুম দঁ লিল দ্য সেয়া' নামক আত্মহত্যা-বিষয়ক প্রবন্ধে ১৫৮৮ সালে নটি ও ১৫৯২ সালে উনিশটি অংশ যোগ করেন। মৃত্যুর পর আরও দুটি অংশ যুক্ত হয়। এ ছাড়া তাঁর

অন্যান্য প্রবন্ধে অন্তত তিরিশ বার আত্মহত্যার প্রসঙ্গ আসে। 'প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে একটি প্রবেশপথ, শত বহির্পথ।' 'মৃত্যুতেই সব অসুখ ও কষ্টের সমাপ্তি।' 'আমাদের জীবন নির্ভর করে অন্যদের ওপর, মৃত্যু আমাদের ওপর।' 'কেন আমি হত্যার জন্য নিন্দিত হব, যখন আমি নিজেই নিজের প্রাণ নিচ্ছি?' মঁতেন আত্মহত্যাবিরোধী মোটিফগুলি (ধার্মিক, সামাজিক, নৈতিক ও দার্শনিক) নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে শেষে বলতে চেয়েছেন অনস্তিত্বের কাছে আশ্রয় নেওয়াতে কোনও লাভ নেই। শূন্যতা কোনও সমাধান হতে পারে না। মঁতেন মনে করেন আত্মহত্যা কোনও সর্বজনীন জাগতিক সমাধান নয়, একটি বিশেষ অবস্থার নৈতিক প্রশ্ন মাত্র! বিখ্যাত ব্যক্তিদের আত্মহত্যার উদাহরণ দিতে গিয়ে মঁতেন সাধারণভাবে প্রশংসা করলেও মাঝে মাঝে তাঁর মন্তব্য কঠোর ও শ্লেষাত্মক। যথা, ব্রুতুস ও কাস্‌সিয়ুস বেঁচেবর্তে থাকলে তাঁদের আদর্শকে আরও ভাল করে রক্ষা করতে পারতেন। অবশ্য ধর্ষণজনিত আত্মহত্যা প্রসঙ্গে মঁতেনের তীব্র পুরুষতান্ত্রিক মন্তব্য ('নারীটি তো কিছুটা উপভোগও করেছে') আজ আর কোনও সুস্থ যুক্তিবাদী মানুষ গ্রহণ করবে না।

১৫৮৮ সালে মঞ্চস্থ হয় শতাব্দীর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ টেক্সটগুলির একটি, মার্লোর ডক্টর ফসটাস। মানবাবস্থার সীমা চিহ্নিত করা ওই নাটকে নতুন আদম ফসটাস ঈশ্বর থেকে চ্যুত এবং শয়তানের কাছে লাঞ্ছিত অবস্থায় বলে ওঠে:

> Fearful echoes thunder in mine ears,
> 'Faustus, thou art damned': then swords and knives,
> Poison, guns, halters and envenomed steel
> Are laid before me to dispatch myself :
> And long ere this, I should have done the deed,
> Had not sweet pleasure conquered deep despair.
>
> 'ডক্টর ফসটাস', ২য় অঙ্ক, ২০-২৫

১৬০১ সালে পিয়ের শারোঁর আত্মহত্যার সপক্ষে রচিত 'দ্য লা সাজেস' মঁতেনের দ্বারা প্রভাবিত। একই সময় ইতালিতে পিককোলিমিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বিষয়ে প্রকাশ্য তর্কের আহ্বান করেন। ১৬০৪ সালে ফ্লেমিও মানবতাবাদী জুস্তে লিপসে 'থ্রাসেয়াস' নামক গ্রন্থে আত্মহত্যার পক্ষে-বিপক্ষে যা লেখেন ('এত মৃত্যু সহ্য করেও নিজে না মরতে পারা কী কাপুরুষতা!') তা পুড়িয়ে ফেলতে মনস্থ করেন। ১৬০৭ সালে ফ্রান্সিস বেকন তাঁর মৃত্যু-বিষয়ক প্রবন্ধে আত্মহত্যাকে বিশ্লেষণ করেন একবারও নিন্দে না করে। পরে ১৬২৩ সালে 'দ্য হিস্ট্রি অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ'-এ গলায় দড়ি দিতে যাওয়া একটি লোকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিকভাবে আত্মহত্যাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। লোকটির ব্যথা লাগেনি, সে শুধু দেখেছিল আগুনের শিখা, তারপর কালো-সবুজ আর সবশেষে সমুদ্রনীল ধোঁয়া।

১৬১০ নাগাদ কবি ও ধর্মযাজক জন ডান 'বিয়াথানাটস' নামে একটি বই লেখেন আত্মহত্যার সপক্ষে, কিন্তু বিষয়বস্তুর জন্য মৃত্যুর আগে তা প্রকাশ করেননি। ডানের মনে হয়েছিল তাঁর জীবন ব্যর্থ। তবে অন্যদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য, তিনি খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে ধার্মিক যুক্তি দিয়ে আত্মহত্যাকে অনুধাবন করতে চেয়েছেন। ডানের বই তিন ভাগে বিভক্ত: আত্মহত্যা কি প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী, যুক্তির বিরোধী, ঈশ্বরের বিরোধী? তাঁর মতে, বাইবেলে আত্মহত্যাকে নিন্দে করা হয়নি। স্বেচ্ছায় শহিদ হওয়া কি আত্মহত্যা নয়? যিশুর মৃত্যু কি আত্মহত্যা নয়? তাঁর সমকালীন পিয়ের দ্য বেরুলেরের মতো, জন ডানও তাঁর বইতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা তোলেন, এবং কোপের্নিকুস, জর্দানো ব্রুনো ও গালিলেও-র কথা উল্লেখ করেন। সতেরো শতকের গোড়ায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কার পুরনো ধ্যানধারণাকে ধাক্কা দিয়েছিল এবং নতুন ভাবে ভাবতে সাহায্য করেছিল। ডান শুধু বন্ধুদের মধ্যে পাণ্ডুলিপির কপি বিলি করেন। তাঁর মৃত্যুর ষোলো বছর পরে বইটি ছাপা হয়। আঠেরো শতকে ডেভিড হিউমও আত্মহত্যাবিষয়ক ভাবনাগুলি জীবৎকালে প্রকাশ করেননি। ১৭৭০ সালে প্রথমে ফ্রান্সে ও পরে ১৭৭৭ সালে ডেভিড হিউমের 'এসেজ অন সুইসাইড অ্যান্ড দ্য ইম্মরটালিটি অফ দ্য সোল' গ্রন্থে বলা হয়েছিল আত্মহত্যা ঈশ্বরের অবমাননা করে না, সমাজের ক্ষতি করে না, আত্ম-অবমাননাও নয়। বরঞ্চ তা হয়ে উঠতে পারে এক পরম সমাধান।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেকসপিয়ার মরালিস্ট নন, মানবাবস্থার এক দর্শক। তাঁর নাটকগুলিতে ৫২টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। হ্যামলেট নিজে আত্মহত্যা না করলেও ওফেলিয়ার নিঃশব্দ আত্মহত্যা, অ্যান্টনি, ক্লিওপেট্রা, লেডি ম্যাকবেথ, রোমিও-জুলিয়েটের আত্মহত্যা আমাদের অন্য এক বিস্তারে নিয়ে যায়। ডোভার-চূড়ায় অন্ধ গ্লস্টারের আত্মহত্যা-প্রচেষ্টা হয়ে ওঠে গ্রোটেস্ক! আত্মহত্যা এত বাঙ্ময় হয়ে ওঠেনি আর কোনও সাহিত্যস্রষ্টার রচনায়।

রনেসাঁসে উত্থিত এই মানবিক আত্মজিজ্ঞাসা, নিজের জীবন সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্তের প্রশ্ন প্রাচীন মূল্যবোধ তছনছ করে দেয় বলেই এত প্রতিরোধ। হবস ও দেকার্ত যথাক্রমে রাষ্ট্র ও যুক্তির নামে আত্মহত্যার বিরোধিতা করেছেন। দেকার্ত কোনও ধর্মীয় নীতির ধার ধারেননি। তাঁর কাছে আত্মহত্যা কোনও নৈতিক সমস্যা নয়, যুক্তির প্রশ্ন। নিজেকে হত্যা করা 'পাপ' নয়, ভুল। এক শতাব্দী পরে স্বয়ং ভলতেরও ঘোষণা করেন যে আত্মহনন ভদ্রলোকদের জন্য নয় ('ce n'est pas aux gens aimables de se tuer')।

অন্য দিকে, মঁতেসকিও অন্তত তিন বা চার বার (১৭২১, ১৭৩৪ এবং ১৭৪৮) আত্মহত্যা-সংক্রান্ত ভাবনায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত পারসীয় পত্রাবলির ('lettres persanes') ৭৬ সংখ্যক চিঠিতে প্রথমবার তিনি আত্মহত্যার আইনি অবদমনের প্রবল বিরোধিতা করেন: 'যখন আমি যন্ত্রণায় আর আত্মগ্লানিতে মুহ্যমান হয়ে আছি, তখন কেন আমাকে আমার কষ্টের অবসান ঘটাতে দেওয়া হবে না, যে ওষুধ আমার হাতে রয়েছে কেন তা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না?' অবশ্য ১৭৩৪ সালে মঁতেসকিও-র মনে হয়েছিল অতিরিক্ত আত্মপ্রেমই (amour-propre) আত্মহননের আসল কারণ: 'আমরা জীবনের চেয়েও নিজেদের বেশি ভালবাসি।'

অস্তিত্ব সম্পর্কে হ্যামলেটের প্রশ্নের ঠিক একশো বছর পর ১৭০০ সালে টমাস ক্রীচ নামে অক্সফোর্ডের এক বিশিষ্ট প্রকাশক আত্মহত্যা করেন। গলায় দড়ি দেওয়ার আগে তিনি লুক্রেশিয়ুসের রচনাবলির অনুবাদ শেষ করেছিলেন। ঘটনাটি দ্রুত মিথে পরিণত হয়। কেউ কেউ এটিকে দার্শনিক আত্মহত্যা হিসেবে দেখেন, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ক্রীচ নাকি 'বিয়াথানাটস' পড়ছিলেন, তাঁর এক হাতে ছিল সেই বই, অন্য হাতে দড়ি। অন্য একটি গল্পকথা অনুযায়ী তিনি লুক্রেশিয়ুসের পাণ্ডুলিপিতে লিখে

রেখেছিলেন : 'ভাষ্যটি শেষ করে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।' একথা শুনে ভলতের যে শ্লেষাক্ত উক্তিটি করেন সেটি পাওয়া যাবে তাঁর 'দিকসিয়নের ফিলজফিক' বা 'দার্শনিক অভিধান'-এ: 'তিনি লেখকের মতো মৃত্যুবরণ করে আনন্দ পেতে চেয়েছিলেন। তিনি যদি ওভিদের ভাষ্যকার হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আরও বেশিদিন বাঁচতেন।'

১৭৮০-র দশকে লন্ডনে প্রকাশ্য বিতর্ক শুরু হয়। ১৭৮৬-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি 'টাইমস' পত্রিকা 'আত্মহত্যা কি সাহসিকতার পরিচায়ক?' বিষয়ে বিতর্কের সুচনা করে। ১৭৮৯ সালে ওই পত্রিকা জানায়, 'সমস্ত সামাজিক শ্রেণিতে এটি আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।' গ্রিনিচ পার্কে এক প্রকাশ্য জনসভায় এত ভিড় ও হইহট্টগোল হয় যে আলোচনা নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে যায়।

ফরাসি বিপ্লব আত্মহত্যাকারীর শাস্তি তুলে নেয়, কিন্তু তাকে সমর্থন করেনি। মিনোয়া দেখিয়েছেন, দুই জমানায় আদৌ কোনও তফাত ছিল না। পূর্ববর্তী জমানায় প্রজাদের জীবন রাজার প্রতি উৎসর্গীকৃত হবে মনে করা হত; আর বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে বলা হল নাগরিকের উচিত প্রজাতন্ত্রের জন্য জীবনকে সংবরণ করা। সমস্ত দেশাত্মবোধক ভাষ্য আত্মহত্যাকে 'অপরাধ' হিসেবেই গণ্য করে। অথচ বিপ্লবের সময় বিপ্লবী, প্রতিবিপ্লবী ও রাজপন্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক আত্মহত্যার আধিক্যের কথা আমরা জানি। মিনোয়া আঠেরো শতকের শেষ পর্বে পনেরো শতাব্দীর খ্রিস্টধর্ম অতিক্রম করে রোমান ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজতে চেয়েছেন, রোমান ও রোমান্টিক ধারার এই তথাকথিত মিলনকে তিনি কাতো ও ভেরতেরের সমন্বয় বলে অভিহিত করেছেন। এই সমন্বয়ের প্রতীক আদাম ল্যুক্স, বোরপের, রবেসপিয়ের, বাবফ। আর সাধারণ মানুষ? একটি গবেষণাপত্রে জানা যাচ্ছে ১৭৯৫-এর শেষ থেকে পাঁচ বছরে প্যারিসে অন্তত ২১১ জন পুরুষ ও ৬৩ জন মহিলা আত্মহত্যা করেন, অধিকাংশই স্যেন নদীতে ডুবে। ১৭৯১ সালের ফরাসি পেনাল কোড আত্মহত্যাকে সিভিল আইনে আর অপরাধ নয় বলে গণ্য করলেও ১৭৯৭ সালের ন্যাশনাল কাউন্সিল আত্মহত্যা সম্পর্কে নীরব থাকে।

পাশ্চাত্য রনেসাঁস থেকে 'আলোর শতাব্দী' পর্যন্ত চিন্তাভাবনার ফলাফলকে বহুলাংশে মুছে দিল উনিশ শতক। রনেসাঁস প্রশ্ন তুলেছিল

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকব, না থাকব না, পরে সেই প্রশ্নটিকে ধামাচাপা দেওয়া হয়, আঠেরো শতক বিতর্কটিকে নতুন করে উন্মুক্ত করতে চেয়েছিল। উনিশ শতক সেই বিতর্ক বন্ধ করে দেয়: বাঁচা না-বাঁচার প্রশ্ন যেন একটি অস্বস্তিকর, বেখাপ্পা ব্যাপার। সুতরাং, নীরবতা। আত্মহত্যার হার বাড়ছে, কাজেই কারণ অনুসন্ধান চলতে পারে, তবে তাকে আইনসঙ্গত করার প্রশ্নই ওঠে না। আত্মহত্যা একটি মানবিক, নৈতিক, শারীরিক, সামাজিক অসুখ। এই একটি ব্যাপারে রাজনৈতিক, ধার্মিক ও নৈতিক প্রশাসন একমত। মিনোয়া দেখাতে চেয়েছেন উনিশ ও বিশ শতকে আত্মহত্যা নিয়ে তেমন কোনও মুক্তচিন্তার সাক্ষাৎ মেলেনি, এ যুগেও 'নিজেকে খুন করা' সমানভাবে একটি ট্যাবু হয়ে আছে।

রনেসাঁস থেকে আঠেরো শতক যেভাবে জীবনের একটি গূঢ় ও মৌলিক জিজ্ঞাসা হিসেবে আত্মহত্যাকে দেখতে শুরু করেছিল, বর্তমান পৃথিবী তা না পারলেও মানববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষের এই আচরণকে অনুধাবন করতে চেয়েছে। দুরকহাইমের তথ্যসাবুদ ঠাসা বইয়ে (১৮৯৭) প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল, আত্মহত্যার কারণগুলি সবসময়ই সামাজিক। এই সামাজিক তত্ত্বকে পরিপূরণ করে মরিস হলবওয়্যাকসের 'আত্মহত্যার কারণ' (১৯৩০) গ্রন্থটি প্রমাণ করতে চাইল যে যাবতীয় আত্মহত্যাকেই এক সূত্রে গ্রথিত করে একটিই উপাদান, যার নাম নির্জনতা, এক চূড়ান্ত ও উৎসারহীন নির্জনতা। ফ্রয়েড তাঁর প্রাথমিক ব্যাখ্যায় (১৯০৫) বলেন, এ হল নিজের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠা। মানুষের আক্রমণ যদি সামাজিক চাপের জন্য উদ্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশিত না হতে পারে, তবে তা নিজের দিকে ঘুরে যায়। মিনোয়া দেখিয়েছেন, এই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের পিছনে ছিল লুইজ কোলেকে লেখা ফ্লবেরের একটি চিঠি, 'Tout suicide est peut-être un assassinat rentré' '(হয়তো প্রতিটি আত্মহত্যাই এক বিপরীত হত্যা)। ১৯২০ সালে অবশ্য ফ্রয়েড অন্য একটি বিতর্কিত তত্ত্ব পেশ করেন: সেটি হল প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু-প্রবৃত্তি, যা জীবন ও প্রজনন-প্রবৃত্তি বা 'লিবিডো'র বিপরীত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা মারাত্মক হতে পারে, যখন তা নিজেকে অতিক্রম করে অন্যের প্রতি নিজেকে নিয়োজিত করার উত্তরণে (sublimation) পৌঁছয় না। সুতরাং সবচেয়ে 'সুগঠিত' সমাজেও আত্মহত্যার অনুপাত বৃদ্ধি পেতে

থাকে, যদিও সেখানে বহির্হিংসা কঠোর অনুশাসনে ঘেরা এবং হত্যার পরিসংখ্যান নিম্নগামী। তৃতীয় দৃষ্টিকোণটি মিলবে জাঁ বাকলারের 'লে স্যুইসিদ' গ্রন্থে, যেখানে তা ব্যক্তিনির্ভর, জেনেটিক ও মনস্তাত্ত্বিক। জ্যাক ডগলাস ('দ্য সোশ্যাল মিনিং অফ সুইসাইড') ও বাকলার দু'জনেই মনে করেন স্বেচ্ছামৃত্যুকে পরিসংখ্যান দিয়ে পরিমাপ করা যাবে না, করা যাবে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত থেকে: আত্মহত্যা একটি বিশেষ মানবিক ও ব্যক্তিগত আচরণ। বিশেষ বিশেষ অবস্থা এই আচরণের 'অনুকূল'। অন্য দিকে সামাজিক সঙ্কট ও যুদ্ধের সময় আত্মহত্যা কমে যায়, কারণ বিচ্ছিন্নতাবোধের বদলে সেখানে জেগে ওঠে এক একাত্মতার বোধ, যা উসকে দেয় বাঁচার ইচ্ছে।

এইসব ব্যাখ্যা পরস্পরকে খণ্ডিত করার চেয়ে পরিপূরণ করে বেশি, তুলে ধরে এক অন্তহীন জটিল মনস্তাত্ত্বিক অঙ্ককে। শেষ সিদ্ধান্ত তো ব্যক্তির। মিনোয়া উদ্ধৃত করেছেন 'ল্য ত্রেজিয়েম সেজার' গ্রন্থে মঁতেরলাঁর মন্তব্য: 'আত্মহত্যার চেয়ে রহস্যমেদুর কিছু নেই। কাউকে যখন আত্মহত্যার কারণ দর্শাতে দেখি, আমার মনে হয় সেটা চূড়ান্ত অনধিকার চর্চা। কারণ শুধু আত্মহত্যাকারীই জেনেছে ও বুঝেছে সেইসব কারণ। কোনও তৃতীয় ব্যক্তির তা ধরাছোঁওয়ার বাইরে।'

ধরাছোঁওয়ার বাইরে, ঠিকই, কিন্তু তবু বিচার করা হবে। অপরাধবোধে ভুগতে ভুগতে সরকার ভাববে এটা তার দোষ, সুতরাং আইনের সাহায্যে দমন কর। বৈপরীত্যগুলি খুবই এক রকম: সাহিত্যে আত্মহত্যা সম্পর্কে মুগ্ধতা, যুদ্ধে আত্মাহুতি দেওয়া সৈনিক, প্রবল অত্যাচারের সামনে মুখ না খোলা আত্মহত্যাকারী বিদ্রোহীর সম্পর্কে ভাবাবেগ। আর অন্য দিকে একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের আত্মহত্যা সম্পর্কে ঘৃণা। বিশ শতকে আত্মহত ব্যক্তিদের মিছিল আমাদের ঘুমকে আলোড়িত করে: স্টেফান ৎসোয়াইগ, মঁতেরলাঁ, মায়াকোভস্কি, চেজারে পাভেজে, ম্যাক্স লিনডার, আর্থার কোয়েসলার, ইভ লোরাঁ, মিশিমা, মেরিলিন মনরো, সিলভিয়া প্লাথ... ১৩ মার্চ ১৯৯০ ব্রুনো বেটেলহাইমের আত্মহত্যা সম্পর্কে ওদিল ওদুল লিখেছেন: 'হতাশা নয়, এ হল জীবনের অনুশাসনকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাহস।'

১৯৮৭ সালের আত্মহত্যা-দমনকারী ফরাসি আইন প্রসঙ্গে লিখতে

গিয়ে আইনজ্ঞ জেনাতি লিখেছেন, আত্মহত্যাকারী এক spoil-sport, মজা মাটি করাই তার উদ্দেশ্য, কারণ তা সামাজিক 'ভারসাম্য'কে টলিয়ে দেয়, সমাজের মিথ্যে আত্মবিশ্বাসে আঘাত করে, গোটা সমাজকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, এবং সমাজ এক চাপা অপরাধ-গূঢ়ৈষায় ভোগে। দানিয়েল মাইয়ারের মতে, তাৎপর্য ও ফল দুদিক থেকেই আত্মহত্যা সমাজকে বিচলিত করে বলে প্রায় অনিবার্য স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় তা আপন আত্মরক্ষার অস্ত্রটিকে প্রবলভাবে ব্যবহার করতে চায়—অবদমন। ফলে সামাজিক বচনে আত্মহত্যার কারণ শুধু দুর্বলতা, কাপুরুষতা, পাগলামি, মনোবিকৃতি, 'রক্তের দোষ'। সব কিছু শুধু মানব-স্বাধীনতার অভিব্যক্তি ছাড়া।

তবু হ্যামলেটের প্রশ্ন ছাইয়ের মধ্যে থেকে অলক্ষে জেগে উঠে বারবার ছোবল মারে। এক দিকে ত্রাসের সৃষ্টি করে, আর অন্য দিকে আজও সমস্ত নির্জনতম সঙ্কটের চূড়ান্ত সমাধান হয়ে থাকে, যা পৃথিবীর কোনও আইন বা শক্তি বন্ধ করতে পারেনি।

২০০৫

চিলেকোঠার উন্মাদিনী: ভিভিয়েন এলিয়ট

১

I looked at you and you had stretched your arms
above your head
With such an air of weariness
Like some very old monkey.
I looked at you and you looked at me
I longed to speak to you
but I didn't. I longed
to come and stand beside you at the window.
And look out at the fleeing cold English sunshine and say
Is it necessary—
Is it necessary—
Tell me, is it necessary that we go through this?

২

It was after the acrobats
And I left my box
And ran along the corridor
Fast
Because I wanted to get into the air
And in the suffused light of the empty corridor
In the stale air and soft diffused light of the corridor

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

In the deathly airlessness of the silent corridor
In the stifling scent of death and suffocation of the corridor
I met my own eyes
In another face.

কার এ কবিতা? নদীর মতো এক নারীর, যে জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়। নাম তাঁর ভিভিয়েন। স্টিফেন স্পেন্ডার লিখেছেন, স্বামী টি. এস. এলিয়টের বন্ধুরা তাঁকে বলত The River Girl!

কেউ তাঁকে ভালবাসেনি। তাঁকে নিয়ে নাসিকা কুঞ্চন করেছেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ। সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি চিরকালের মতো চিহ্নিত হয়ে গেছেন চিলেকোঠার উন্মাদিনী হিসেবে।

প্রায় রাতারাতি আধুনিক ইংরেজি কবিতার খোলনলচে পালটে দেওয়া তরুণ কবিটির বিস্ফোরক আবির্ভাবের প্রধান সাক্ষী তিনি, শুধু তাঁরই জন্য ইংলন্ডে পড়তে আসা হারভার্ডের মুখচোরা ছাত্রটি দেশে ফিরে যাননি। ১৯১৫ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত এলিয়টের সবচেয়ে সৃজনশীল সময়ে তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী— ক্রমশ হিংস্র, অতৃপ্ত, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ এক অভাজন, যাঁকে ছেড়ে কবি চলে গিয়েছিলেন বিয়ের ১৭ বছর পরে। এজন্য বন্ধু পরিজনরা কেউ দোষ দেননি এলিয়টকে।

শেষ পর্যন্ত, স্বামী-পরিত্যক্তা ওই নারী ন' বছর এক মনোরোগ সেবাশ্রমে কাটিয়ে ১৯৪৭ সালে আত্মহত্যা করেন, তাঁর স্বামীর নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির আগের বছর। হ্যারোর পিনার সমাধিক্ষেত্রে, যেখানে তিনি সমাহিত হতে চাননি, পরম অবহেলায় তিনি শায়িত। এমনকী সমাধি-ফলকে খোদিত তাঁর মৃত্যুর ভুল তারিখটি পর্যন্ত শুধরে দেননি কেউ। সেখানে তাঁর ভুবনবিখ্যাত স্বামীর কোনও উল্লেখ নেই।

ভিভিয়েন যেন অস্থির, কম্পমান এক রঙ করা ছায়া ('a restless shivering painted shadow')। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের ভাষায়, সে এক পাউডারের ছোপওলা দুরন্ত ওফেলিয়া, হায় কোনও হ্যামলেট যাকে ভালবাসবে না! তিনি ভিভিয়েনকে নিন্দে করেছেন টমের গলায় ঝুলে থাকা 'bag of ferrets' বলে। অলডাস হাক্সলির মতে, ভিভিয়েন এক শিকারি রমণী যে তার যৌন আবেদন দিয়ে নিউ ইংল্যান্ডারটিকে বশ করে। রাসেলের মতে, 'She is a person who

lives on a knife-edge and will end a criminal or a saint. She has perfect capacity for both.' এক অসুস্থ, অপ্রকৃতিস্থ নারীর সঙ্গে নারকীয় দাম্পত্যের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছেন বলে 'বেচারা টম'-এর প্রতি এলিয়টের জীবনীকারদের সহানুভূতির অন্ত নেই। ব্যর্থ বিবাহের জন্য বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়পরিজন সকলেই অনিবার্যভাবে দায়ী করেছেন ভিভিয়েনকে। কিন্তু কবিপত্নীর মৃত্যুর ৫৪ বছর বাদে প্রকাশিত, ক্যারল সেমুর জোনস রচিত তাঁর প্রথম জীবনীটি (*The Painted Shadow*) কি অবশেষে আট দশক ধরে লালিত প্রচলিত ধারণায় ফাটল ধরাতে চলেছে?

এমন একেকটা বই লেখা হয় কখনও কখনও যা পুরনো ধ্যানধারণার শিকড় উপড়ে দেয়। এই বইটিও সেই রকম, যদিও তা—জীবনানন্দের ভাষায়—বিমর্ষ পাখির রঙের ভরা! ভিভিয়েন কি ছিলেন তাঁর স্বামীর অবিচারের শিকার? তাঁদের ব্যর্থ দাম্পত্যের কারণ কি শুধু এলিয়টের শারীরিক অক্ষমতা কিংবা ভিভিয়েনের স্নায়বিক ও মানসিক অস্থিরতা নয়, অন্য কিছু যা এতদিন হিমশীতল অন্ধকারে লুকোনো ছিল? নিষেধাজ্ঞার বাধা অতিক্রম করে, অস্পষ্টতার আলো-আঁধারি পেরিয়ে এই নতুন অনুসন্ধান কি পারল আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে এক ভিন্ন মানবীকে? ভয়ংকর দুটি স্বীকারোক্তি ভিভিয়েনের এই পুনর্মূল্যায়নকে উসকে দিয়েছে। তার একটি হল ১৯৮০ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে ভিভিয়েনের ভাই, এলিয়টের শ্যালক ও বন্ধু মরিস হে-উডের অন্তিম স্বীকারোক্তি: 'It was only when I saw Vivie in the asylum for the last time I realised I had done something very wrong...She was as sane as I was... What Tom and I did was wrong. And Mother. I did everything Tom told me to.' অন্যটি ১৯৩৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর এলিয়ট পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু লেডি অটোলিন মোরেলকে লেখা ভিভিয়েনের চিঠি: 'Dearest Ottoline... the truth will come out, if not in *our* life—*then after it*.' (বক্রলেখ লেখিকার)

কোন সত্যের কথা বলতে চেয়েছেন ভিভিয়েন? ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মে ম্যাসাচুসেটস থেকে হামবুর্গ হয়ে ইংল্যান্ডের পৌঁছেছিলেন এলিয়ট। পরের বছর মার্চ মাসে কেমব্রিজে মার্কিন বন্ধু স্কোফিল্ড থেয়ারের সঙ্গে নৌকাবিহারে গিয়েছিলেন তিনি—সঙ্গে স্কোফিল্ডের বোন লুসি ও এক প্রাণোচ্ছল ইংরেজ তরুণী, যাঁর নাম ভিভিয়েন হে-উড! (লিনডাল গর্ডনের দেওয়া এই তথ্যের

সঙ্গে অবশ্য একমত নন ভিভিয়েন-জীবনীকার ক্যারল সেমুর জোনস: তাঁর মতে, টম ও ভিভিয়েনের দেখা হয় এক নাচের আসরে)। তখন তাঁদের দুজনেরই বয়স ২৬—ভিভিয়েন কয়েক মাসের বড়। কিছুদিন আগেই যাঁর সঙ্গে ইস্কুল-শিক্ষক চার্লস বাকলের ভালবাসার সম্পর্ক ভেঙে যায়। ন' মাস ধরে ভিভিয়েনের চেঁচামেচি, গালিগালাজ, 'স্বর্গীয়' মিলন, উন্মাদিনীর মতো টেলিগ্রাম-টেলিফোন সহ্য হয়নি বাকলের। ভিভিয়েনের বাবা ছিলেন চিত্রকর, তিনি নিজেও ছবি আঁকতেন, ব্যালে শিখেছিলেন, শিল্প-সাহিত্যের খবর রাখতেন, পরে কবিতা ও গল্প লিখেছেন, ঝর্নার মতো তাঁর কথার ধারা, পরনে চটকদার পোশাক, আঙুলের ফাঁকে সিগারেট-হোল্ডার। তিনি সদা-উত্তেজিত, সাবলীল, পার্টিতে হই হই করতে ভালবাসতেন, বেসবল টিমের উন্মাদনা তাঁর ভাল লাগত, প্রায় সর্বার্থে এলিয়টের বিপরীত। বাখ-সেজান ভাল না লাগলে ভাল বলার পাত্রী তিনি নন। প্রায় নির্বাক লাজুক আমেরিকানটির পক্ষে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিছুদিন আগেই তিনি কনরাড এইকেনকে লিখেছিলেন, তিনি 'প্রেমের জন্য প্রস্তুত'। অন্যদিকে, ভিভিয়েনের মনে হয়েছিল, এলিয়ট এক মার্কিন 'রাজকুমার', তাঁর কাটা কাটা পরিচ্ছন্ন মুখরেখা, শ্যেনদৃষ্টি, গভীর ও উত্তেজক কণ্ঠস্বর তাঁকে পূর্বতন প্রেমিক ইস্কুল-শিক্ষক চার্লস বাকলের সঙ্গে বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। এলিয়ট যেন চলচ্চিত্রের পর্দা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। শিগ্গিরই তাঁরা মধ্যাহ্নভোজনে মিলিত হন এবং জুন মাসের মধ্যে বিয়ে। বন্ধুদের কারও কারও মতে, যেমন অল্ডাস হাক্সলি, তাঁদের মধ্যে যেন একটি 'sexual nexus' তৈরি হয়েছিল: 'One sees it in the way he looks at her...She's an incarnate provocation.'

এলিয়ট হয়তো ভেবেছিলেন দর্শন ও কাব্যের বিমূর্ত ভুবন থেকে ভিভিয়েন তাঁকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু তাঁর কবিতার হ্যামলেটীয় চরিত্র জে. অ্যালফ্রেড প্রুফ্রকের মতোই বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া যে কত কঠিন বুঝতে পারছিলেন তিনি। আর্থিক সংকট তো ছিলই, এলিয়টের বাবা-মা এ-বিয়ে সমর্থন করেন নি, তার ওপর যৌথ জীবনের ব্যর্থতা। 'ওড' নামে একটি কবিতায় এলিয়ট এক অপরিণত দম্পতির ভয়াবহভাবে ব্যর্থ মিলনের কথা বলেছেন, মেয়েটি সেখানে গল্পে 'succuba eviscerate.' পরবর্তীকালে লেখা একটি গল্পে ভিভিয়েন একটি মেয়ের কথা লিখেছেন যে নাচের আসরে স্বামীর কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস্ করে: 'তোমার কি একটুও শক্তি নেই?'

ভিভিয়েন নাকি ইস্টবোর্নে মধুযামিনী কাটাতে গিয়ে আত্মহত্যা করতে বসেছিলেন। বিয়ের এক মাস পরে নৈশভোজের সময় ভিভিয়েন বার্ট্রান্ড রাসেলকে বলেন যে, তিনি তাঁর স্বামীকে উত্তেজিত করার জন্য বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। টম একথার প্রতিবাদ করেননি, কেবল ক্লান্তভাবে টেবিলে এলিয়ে পড়েন।

রাতের পর রাত তাদের যন্ত্রণাক্ত জেগে থাকা: 'the unspoken voice of sorrow in the ancient bedroom.' এখন অবশ্য জানা যাচ্ছে, একটি নয়, দুটি ঘরে জেগে থাকতেন তাঁরা। দুজনেরই স্নায়ুর ওপর, বিশেষ করে ভিভিয়েনের স্নায়ুর ওপর, যে চাপ পড়ে তা দ্রুত শারীরিক অসুস্থতায় পর্যবসিত হয়—কোলাইটিসের ব্যথা, যকৃতের অসুখ, ক্লান্তি, মাথার যন্ত্রণা, চোখ ফুলে যাওয়া...। ব্লুমসবেরি পার্টিগুলিতে ও লন্ডনের সাহিত্য-সমাজে উদীয়মান মার্কিন কবিটিকে নিয়ে নানা মুখরোচক গুজব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু একটি বিষয়ে ব্লুমসবেরির নারীবাদীদেরও (যেমন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ) মনে কোনও সন্দেহ থাকেনি: সেটি হল টম নির্দোষ, সে বেচারা এক শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ রোগিনীর কবলে পড়ে শেষ হয়ে যেতে বসেছে। এলিয়টের মাস্টারমশাই বার্ট্রান্ড রাসেল ছাত্রের দাম্পত্য-সমস্যা মেটাতে গিয়ে উলটে ভিভিয়েনকে বশীভূত করে বসায় এলিয়ট আরও ভেঙে পড়েন। পিটার অ্যাক্রয়েডের এলিয়ট-জীবনীতে ভিভিয়েনের সঙ্গে রাসেলের ঘনিষ্ঠতার কথা ছিল। এই ত্রিকোণ দাম্পত্য, 'মেনাজ আ ত্রোয়া' শেষ পর্যন্ত এলিয়টকে চুরমার করে দেয়, এমনই এক সমীকরণ তৈরি করা হয়েছিল।

আমরা জানি, শেষ পর্যন্ত এলিয়ট সত্যিই স্নায়বিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন ও তাঁকে সুইজারল্যান্ডের এক মনোবিদের স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি হতে হয়। এই সময় লেখা হচ্ছিল 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড', ভেঙে পড়া আধুনিক সভ্যতার নারকীয়তার সম্ভবত শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপ। কিন্তু এলিয়ট নিজে বলেছেন এটি ছিল শুধুমাত্র 'personal and wholly insignificant grouse against life' থেকে মুক্তির একটি পথ। নিজের অজান্তে, ভঙ্গুর ভিভিয়েন হয়ে উঠলেন দান্তের 'দিভিনা কমেদিয়া'র নরক। এলিয়ট লিখেছেন একমাত্র ভিভিয়েনই কবিতাটির আসল তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবেন। আর 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যাবে ভিভিয়েনের ক্ষুব্ধ হস্তাক্ষর: 'What (did) you get married for, if you don't want to have children?'

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামীর ক্রমবর্ধমান ধর্মাচ্ছন্নতা, বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মের ভেতরে লুকনো নারীবিদ্বেষ, মোটেই পছন্দ করেননি ভিভিয়েন। তবু তাঁর নতুন উত্তরণের কবিতা 'অ্যাশ ওয়েডনেসডে' তাঁকেই উৎসর্গ করেন এলিয়ট। অতঃপর ১৯৩২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি আট মাসের সফরে আমেরিকা রওনা হন। ভিভিয়েন নিজে তাঁকে ওয়াটারলু স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসেন। আর কোনওদিন এলিয়ট ৬৮ ক্ল্যারেন্স গেট গার্ডেনসের বাসায় ফিরে আসেননি।

ভিভিয়েন শত চেষ্টাতেও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। ফেবার অ্যান্ড ফেবারের অফিসে দেখা মেলেনি। চিঠির উত্তর আসেনি। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ তিনি 'দ্য টাইমস' পত্রিকায় ব্যক্তিগত কলমে একটি বিজ্ঞাপন দেন: 'Will T. S. Eliot please return to his home 68 Clarence Gate Gardens, which he abandoned on September 17, 1932.' বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়নি। প্রকাশ্য সভায় দেখা করলে এলিয়ট চিনতে পারেননি। ১৯৩৮ সালের ১৪ জুলাই ভিভিয়েনের ভাই মরিস এলিয়টকে জানান ভোর পাঁচটার সময় তাঁর বোনকে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় রাস্তায় ঘুরতে দেখে মেরিলিবন পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে ইন্সপেক্টরের মনে হয়েছে তাঁর কথা খুবই অসংলগ্ন। কয়েকদিন পরে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও দুজন চিকিৎসকের সার্টিফিকেট দেখিয়ে তাঁকে নরদামবারল্যান্ড হাউস নামে লন্ডনের এক মনোরোগ সেবাশ্রমে ভর্তি করে দেওয়া হয়। চুক্তিপত্রে নিজের নাম সই করতে রাজি হননি এলিয়ট। হয়তো বিবেকদংশন ছিল, কিংবা ঝুঁকি নিতে চাননি। কাজেই সই করতে হয় মরিসকে। মৃত্যুর আগে ভিভিয়েন সম্পর্কে মরিস বলেন: 'She was never a lunatic I'm as sure as the day I was born.' এলিয়টের ভক্তেরা যতই মিথ্যে জনশ্রুতি ছড়ান, ভর্তির দিনের পর আর একদিনও তিনি ভিভিয়েনকে দেখতে যাননি। অবশ্য ১৯৪৭ সালে ভিভিয়েনের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে 'ফোর কোয়ার্টেটস'-এর কবি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। জীবনী রচয়িতা সেমুর-জোনসের ধারণা, ভিভিয়েন বেশি মাত্রায় ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। অনেক দিন আগে বিশের দশকে ভিভিয়েন লিখেছিলেন, 'Life is like a hurried walk in the dark: a blind stumble. Death must be like the opening of a door into a lighted house...'

সাহিত্যের ইতিহাস নিঃশব্দে তাঁকে মুছে ফেলে। এলিয়টের প্রথমা স্ত্রী চিহ্নিত হয়ে রইলেন একজন দ্বিতীয় জেলডা ফিটজেরাল্ড হিসেবে, অর্থাৎ আর একজন বিখ্যাত লেখকের অস্বাভাবিক স্ত্রী। ১৯২৫ সালেই এলিয়ট তাঁর নিজের জীবনী লেখা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর উইলেও এই নিষেধাজ্ঞার কথা আছে। জন হেওয়ার্ডের প্রতি তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ: 'Your job will be to suppress everything suppressible.' ১৯৬৫ সালে কবির মৃত্যুর পর থেকে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ভালেরি জীবনীকারদের জন্য সবরকম বাধার সৃষ্টি করেছেন। যদিও ঠেকাতে পারেননি 'টম অ্যান্ড ভিভ' নামক নাটক ও চলচ্চিত্র। তাঁরই কৃতিত্বে 'অ্যাশ ওয়েডনেজডে' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রটি ('For my wife...' অর্থাৎ ভিভিয়েন) অদৃশ্য হয়।

ভিভিয়েনের অধিকাংশ চিঠিপত্রও রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যায়। ভিভিয়েন তাঁর ডায়েরিগুলি অক্সফোর্ডের বোডলেয়ান গ্রন্থাগারে জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার সামান্য অংশই মরিস জমা দেন, বাকি কাগজপত্র নাকি একটি গ্যারেজে আগুন ধরায় পুড়ে যায়!

মৃত্যুর এতদিন পরে প্রকাশিত, বহু বাধা অতিক্রম করে রচিত ভিভিয়েনের জীবনীতে বলা হয়েছে এলিয়টের মূল সমস্যা ছিল তাঁর সমকামিতা। প্রথম জীবনে তিনি কিছু লাগামছাড়া যৌনকবিতা লিখেছিলেন (যা 'Bolo poems' নামে *Inventions of the March Hare* [১৯৯৬] গ্রন্থে প্রকাশিত), এবং যা তিনি অজ্ঞাত কারণে ধ্বংস করেননি, তাঁর সারা জীবনের সবচেয়ে গোপন কথাটিকে ফাঁস করে দেয়। প্রথম পুরুষে লেখা এইসব কবিতায় পাঠককে বারবার 'buggery'-তে প্ররোচিত করা হয়। পরে ১৯৩৪ সালের ৩ জানুয়ারি তিনি এজরা পাউন্ডকে অভাবনীয় রকম উগ্র কয়েকটি সমকামী কবিতা পাঠালে স্বয়ং পাউন্ড পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে বলে ওঠেন: 'Jess try to normalfy your vices.' ভুক্তভোগী ভিভিয়েন ছাড়া, এলিয়টের ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে শুধু এজরা পাউন্ড, মেরি ট্রেভেলিয়ান ও অটোলিন মোরেল সমস্যাটি জানতেন।

১৯১৭ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রুফ্রক অ্যান্ড আদার অবজারভেশনস' যে মৃত বন্ধুটিকে উৎসর্গ করেন এলিয়ট, সম্ভবত সেই ডাক্তারির ছাত্র জাঁ ভেরদ্যনালের সঙ্গে তাঁর প্রথম পুরুষ-বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা হয় প্যারিসে ১৯১০-১৯১১ সালে, যখন তাঁরা লাতিন কোয়ার্টারের রু্য স্যাঁ-জাক-এ এক বোর্ডিংয়ে থাকতেন। সেই বন্ধুত্বকে এলিয়টের বিখ্যাত পংক্তি 'the awful

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

daring of a moment's surrender'-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছেন সেমুর-জোনস। উৎসর্গপত্রে দান্তের 'পুরগাতোরিও' থেকে উদ্ধৃতিটি নাকি পুরুষ-সমকামিতার পরিচায়ক। ইংরেজি অনুবাদে লাইনগুলি হবে: 'Now you are able to comprehend the quality of love that warms me towards you/When I forget our emptiness/Treating shades as if they were solid.' ১৯১৫ সালে বিশ্বযুদ্ধে মৃত ওই ফরাসি বন্ধুর দুঃখ ভুলতে ভিভিয়েনকে বিয়ে করা অসম্ভব নয়। অনেক দিন পরেও ১৯৩৪ সালে নিজের 'ক্রাইটেরিয়ন' পত্রিকায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এলিয়টের মনে পড়েছে লাইল্যাকের ডাল হাতে নিয়ে প্যারিসের লুকসাঁবুর বাগান পেরিয়ে সন্ধেবেলা ভেরদ্যনালের হেঁটে আসার দৃশ্য।

বিয়ের কিছুদিন আগে অক্সফোর্ডে কার্ল কাপলিন নামে এক ইঙ্গ-জার্মান ছাত্রের সঙ্গে এলিয়টের 'জীবনের অন্যতম গভীরতম' বন্ধুত্বের কথা লিখেছেন সুহৃদ রবার্ট সেনকোর্ট। ১৯২৩ সালে ওল্ড ফিশবোর্নের মাইলস্টোন কটেজে এলিয়টদের সঙ্গে থাকতে আসে জ্যাক নামে এক জার্মান তরুণ, যাকে প্রথমে ভিভিয়েনের চমৎকার লাগলেও যে ক্রমশ ভয়ংকর রূপ ধারণ করে।

দুটি রচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সমকামিতার অভিযোগ ওঠে। প্রথমটিতে প্রতিবন্ধী বন্ধু জন হেওয়ার্ডকে জড়িয়ে তোলা হলে ক্রুদ্ধ এলিয়ট আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন। সেইসঙ্গে তিনিই আবার তাঁর ও ভিভিয়েনের বন্ধু মেরি ট্রেভেলিয়ানকে বলেন সমকামীরা 'live a life of fear and ostracism—like souls in hell. I believe in hell, yes, I do... I live in constant fear of it myself.'

হয়তো এই ভয় ভুলতে এলিয়ট আমেরিকাবাসিনী এমিলি হেলের সঙ্গে দীর্ঘকাল যোগাযোগ রাখেন, যদিও তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী এমিলির সমস্ত চিঠি তিনি তাঁর ফেবার অ্যান্ড ফেবারের অফিসঘরে পুড়িয়ে ফেলেন। তিনি কি সত্যিই এমিলি হেলের প্রেমপ্রার্থী ছিলেন? যেহেতু ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসের আগে এমিলিকে লেখা এলিয়টের চিঠিগুলি পড়া যাবে না, আমরা এ বিষয়ে কোনও অনাবশ্যক মন্তব্য করতে চাই না। শুধু সভয়ে লক্ষ করব যে এলিয়ট কোনও দিন প্রেমের কবিতা লিখতে পারেননি! আমরা শুধু বলব, নৈর্ব্যক্তিকতার দেয়াল ভেদ করে এলিয়টের কবিতা হয়ে উঠেছে তাঁরই আত্মকাহিনী। এলিয়ট শত চেষ্টাতেও তা ঠেকাতে পারেননি:

Love is the unfamiliar name
Behind the hands that wove
The intolerable shirt of flame
Which human power cannot remove,
We only live, only suspire
Consumed by either fire or fire.
(*Little Gidding*)

ভিভিয়েনের জীবনীতে রাসেল, টম ও ভিভিয়েনের অস্বস্তিকর ত্রিকোণ সম্পর্কের ওপর এক ঝলক নতুন আলো পড়েছে। রাসেল (এলিয়টের জীবনীকার পিটার অ্যাক্রয়েড আগেই তা উদ্ধৃত করেছেন) সারের ট্যানহার্স্ট ফার্মে ভিভিয়েনের সঙ্গে তাঁর রাত্রিবাসকে 'বীভৎস' বলে অভিহিত করেছিলেন। ২৫ অক্টোবর ১৯১৭ রাসেল তাঁর বান্ধবী অভিনেত্রী কোলেৎ-কে লিখেছিলেন: 'At last I spent a night with her. *It was utter hell*. There was a quality of loathsome in it I cannot describe.' কিন্তু সেমুর জোনস আবিষ্কার করেছেন কোলেৎ-কে লেখা রাসেলের পরবর্তী একটি চিঠি, যেখানে তিনি এর উলটো কথা বলেছেন। ৭ নভেম্বর লিখেছেন: 'I had a very satisfactory time with Mrs Eliot.' সেমুর জোনস অবশ্য বলতে পারেননি ভিভিয়েনের মতো ভঙ্গুর স্নায়ুসর্বস্ব এক নারী কীভাবে এইরকম একটা দানবীয় সম্পর্ক চালাতে পেরেছিলেন! জীবনীকার জানাচ্ছেন এলিয়ট ভিভিয়েনের কাণ্ডকারখানা শুধু যে নীরবে সহ্য করেছেন তা নয়, 'টোপ হিসেবেও' ব্যবহার করেছেন, কারণ তাঁর রাসেলের অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। রাসেল ছিলেন এক যৌনক্ষুধার্ত পিতা, যাঁকে তৃপ্ত করতে আপত্তি ছিল না তাঁর।

তবু টম চলে যাওয়ার তিন বছর পরেও ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ স্নায়ুবিপর্যয়ের চরম মুহূর্তে ভিভিয়েন তাঁর দিনপঞ্জিতে লিখেছেন: 'This bleeding wound never heals, never eases. I just silently grope through limbs.' ১২ অক্টোবর লিখছেন: 'He (Tom) is a moon-child.' এই 'moon-child' একদিন আমেরিকার 'মরুভূমি-তে (এলিয়টের কথা) ফিরে না গিয়ে ইংল্যান্ডে থেকে গিয়েছিলেন শুধু তাঁরই জন্য।

অক্সফোর্ডের একটি গ্রন্থাগারে চুক্তিপত্রে সই করে ভিভিয়েনের নিষেধাজ্ঞালাঞ্ছিত দিনপঞ্জির পৃষ্ঠার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখি সেখানে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত জমেছে:

'Rose-pink, pink-rose, bring me a happy day.'

এই পাঁচিল-তোলা অন্তর্জগতের আগুনে পোড়া অক্ষরের মিনতির সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের মাথা নিচু হয়ে আসে। দেখি হিমঘরের দেয়াল ছাদ ভেদ করে ছাই উড়ছে। শুনতে পাই ভিভিয়েন ও টমের যৌথ আর্তি:

Burning burning burning burning
O Lord thou pluckest me out
O Lord thou pluckest
burning
(*The Waste Land*)

অথবা এক আকাশ রক্তমেঘের নীচে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে পড়ে 'বার্নট নর্টন'-এর সেইসব নিয়তিবিধুর পংক্তি:

Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did not take
Towards the door we never opened
Into the rose-garden

ভিভিয়েনের ডায়েরি

পেন্সিল হাতে আমি ঝুঁকে পড়ি অক্সফোর্ডের এক গ্রন্থাগারে আইনের বেড়াজালে বন্দি ভিভিয়েন এলিয়টের ডায়েরির ওপর, যেটিকে এক লহমা দেখার জন্য চুক্তিপত্রে সই করতে হয়েছে আমায়। এই অতি ব্যক্তিগত জগতে প্রবেশ করতে দ্বিধা হয়, মনে হয় এটা ঠিক হচ্ছে না। পরক্ষণেই ভাবি, এর পাতা ওলটাতে ওলটাতে আমি চকিতে পেয়েও যেতে পারি সেই গোলাপ-বাগানের দরজা, এলিয়ট যা সারা জীবন খুঁজেছিলেন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম দফায় অর্থাৎ ১৯১৯ সালের ডায়েরিতে অবশ্য তেমন কিছু পাইনি। সেখানে শুধু এলিয়টের জন্মদিনের কথা, শরীর খারাপের কথা, তাঁর জন্য দুশ্চিন্তা, তাঁর সঙ্গে পিকনিকের কথা। এলিয়ট ফ্রান্সে যাচ্ছেন, তাঁকে ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছে দিচ্ছেন ভিভিয়েন। তারপর ছবি বদলে গেছে, যখন দীর্ঘদিন বাদে ১৯৩৪ সালে আবার শুরু হয়েছে তাঁর দিনপঞ্জি।

আর্তনাদ ও আতঙ্কে ভরা ছেঁড়া ছেঁড়া কথা, অদ্ভুত কিছু চিঠির কপি, এলিয়টের বই ও জিনিসের তালিকা, কদাচিৎ তাঁর নিজের কয়েকটি কবিতা ও ছোটগল্পও। স্বামীর বইপত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখছেন। সংগ্রহ করছেন নাটকের বিজ্ঞাপন, এমনকী অপরিচিত খুড়শ্বশুরমশায় চার্লস উইলিয়াম এলিয়টকে নিয়ে হেনরি জেম্‌সের একটি বইয়ের সমালোচনাও রয়েছে ভিভিয়নের এই শীর্ণ সংগ্রহে।

১৯৩২ থেকে লন্ডনে এলিয়টের ৬৮, ক্ল্যারেন্স গেড গার্ডেনসের বিখ্যাত ফ্ল্যাটে স্বামীর আসবাব আগলে বসে আছেন এক অর্ধ-উন্মাদিনী। সীমাহীন একাকিত্বকে ভরাট করতে কখনও বা এলিয়টের বইয়ের তালিকা তৈরি করছেন তিনি। আমরা জানতে পারছি যে বাদামি বুকশেল্‌ফে রাখা ছিল দু'খণ্ড পতঞ্জলি, সংস্কৃত অভিধান, ল্যানম্যানের সংস্কৃত রীডার, সাত খণ্ড বোদল্যের, দু'খণ্ড মঁতেন, লা রোশফুকোর মাক্সিম, দ্যু বেলে, গোতিয়ে, মালার্মে ও ভের্লেনের কবিতাসংগ্রহ...। ভেতরে লাইব্রেরিতে পাসকালের চিঠিপত্র, ত্রিস্তাঁ করবিয়ের ও জ্যুল লাফর্গ, শার্ল মোরাস ও জাক মারিত্যাঁ অথবা সেন্ট টমাসের ধর্মচিন্তা। ১৯৩৬-এর ২৮ জানুয়ারি অজান্তে তাঁর ডায়েরিতে এইসব অমূল্য তথ্য টুকে রেখেছেন ভিভিয়েন।

এলিয়ট তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর অভিমানে, ক্ষোভে, অবিশ্বাসে উন্মাদ হয়ে ভিভিয়েন প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে, কিন্তু তা অসম্ভব ছিল। 'Then I telephoned Faber and Faber, and asked for Tom at 3.30. Mr. De La Mare's secretary answered, and said there was a committee and she could not ask him to come. I telephoned again at 5, & was told he had just gone. I telephoned at 6, spoke to Miss Swana. They were all very nice to me. So I shall go on.' (২৮ মার্চ ১৯৩৪)

মা'র দোহাই দিয়ে নিজের কথা বলছেন: 'If only my husband had had

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

the gentleness not to give her *this last blow*. So late in her poor life. It is *cruel* and *shameful—A black scar*. She *did* admire him & has been *so hurt*.' (২৬ এপ্রিল, ১৯৩৪)

২৮ মে এলিয়টের The Rock প্যাজেন্টের অভিনয় দেখে তাঁর মনে হয়েছে এটা বুঝি তাঁরই জন্মদিনের উপহার। T. S. Eliot's pageant, at Sadler's Nells Theatre, starts tonight. He did it for my birthday, I knew. I had got the cheap seats...' কিন্তু তাঁর স্বামীকে পাওয়া যায়নি কোথাও: 'There was no sign of Tom anywhere.' (১ জুন ১৯৩৪)

...'staggered up after a very bad night.' '(১৮ আগস্ট, ১৯৩৪)

এলিয়ট-সম্পাদিত *The Criterion*-এর পুরো সেট অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর ফয়েল্‌স্‌ থেকে সেটি কেনার কথা ভেবেছেন। আশা করেছিলেন ফেবার অ্যান্ড ফেবার তাঁকে সাহায্য করবে। 'This was not done.' (১৭, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫)

বুধবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ ২২, রাসেল স্কোয়্যারের ঠিকানায় এলিয়টকে লেখা চিঠিতে রয়েছে: 'Personal-PRIVATE. NOT to be forwarded (?). T. S. Eliot Esq. The Editor of the Criterion. Messrs Faber & Faber, 22 Russel Square, Bloomsbury, London W. C. II. Feb 27th 1935.

Tom,

I have been ill since last week & prisoner. Like yourself. But you must know, unless your correspondence is intercepted, that I work day and right on your behalf & that every thought that I have is for you & all my strength. I used that— but I am not able to— for weeks at a time and have no strength left. I take notes of everything, so that I will be perverse in time, if you receive my letters, IF YOU ARE FREE. Yr wife V. H. Eliot.

মার্চের ৭, ৮ তারিখ লিখেছেন: 'Tom never was erratic. He was the most regular of men, liking his meals at home, his Church, his club very seldom, & a most sweet & homely man. It is not right if Tom

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

refused to come home & it is *cruel*, anti-social, anti-religious, anti-economic, untidy, stupid, unmoral & in *No* way *excusable*.'

টমকে লেখা চিঠিপত্রের কোনও উত্তর না পেয়ে ফেবার অ্যান্ড ফেবার লিমিটেডের সেক্রেটারি মিস্ ডনোভ্যানের কাছে খবর নিয়ে ভিভিয়েন জানতে পারছেন সব চিঠিই ঠিকমতো তাঁর কাছে পৌঁছয়। '...all communication *do* reach Tom.' (৯ মার্চ ১৯৩৫)

আপিসে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বহুক্ষণ ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে হয়েছে ভিভিয়েনকে। তাঁকে বলা হয়েছে এলিয়ট বোর্ড-মিটিঙে ব্যস্ত, দেখা হবে না।

'I said loudly, "It is *too absurd*, I have been *frightened* away *too long*. I am his wife." '

২৮ মার্চ জিওফ্রি (ফেবার?)-কে লিখছেন হারিয়ে যাওয়া ক্রাইটেরিয়নগুলি তাঁর চাই-ই চাই, কারণ তাতে টমের সই রয়েছে। 'Do, please, do *all* you possibly can to get these back for me.'

সোমবার ২৫ মার্চ ১৯৩৫ লিখেছেন: 'And all the fascists are bright, healthy, good and kind people & *very* clever.' তিনি কি এলিয়টের কথা ভাবছিলেন?

'I was *very nearly insane*, the cruel pain of losing Tom...'

বাড়িতে আরশোলার উপদ্রবে ভীষণ ব্যতিব্যস্ত, আবার সেই সঙ্গে British Union of Fascists-এর সদস্য হতে চাইছেন। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের নাভানা লিমিটেডকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন: 'I should like the words: Mrs. Thomas Stearns Eliot, wife of the famous poet whose recent Pageant at Canterbury *Murder in the Cathedral* has created so much controversy.'

১৮ জুলাই আবার টমকে লিখছেন: 'I also begged you for the thousandth time to face up your enemies and blackmailers by coming only where is nothing but serenity and safety for you; It almost makes one doubt your sanity, the way you are hiding yourself up, as if you have committed a crime, and the shame and slight on your family name of Eliot, is more than one could believe an Eliot could

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

do. Have you lost all shame? and have forgotten Christianity and have become a Heathen. Or are you *still* terrorised and blackmailed to keep out of the way, if so, you know it is a criminal offence, blackmail is, and no one need to put up with it for one hour if they have the courage of a dog.'

কখনও নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন: 'Go to Paris.' পরক্ষণেই স্বগতোক্তি: 'No, very much too tired.' (১৭ জুলাই ১৯৩৫)

এখনও যেন কিছুই মানতে পারছেন না, লিখছেন নিশ্চয়ই এলিয়ট 'has a double.' (৩১ জুলাই, ওই) এই 'shameless tortures' তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

৭ আগস্ট ১৯৩৫ তাঁর স্বামী সম্পর্কে 'derogatory' মন্তব্য করার জন্য এক বান্ধবীকে হিংস্রভাবে সাবধান করে দিচ্ছেন: 'As always, I put him first, and I do not continue my acquaintance with anyone, however great a friend, who acts treacherously towards him.'

শেষ পর্যন্ত আর কোনও উপায় না দেখে জনৈক ডঃ মুরের শরণাপন্ন হতে হয়েছে ভিভিয়েনকে:

Dear Dr. Moore,

Will you have the great kindness to send the enclosed letters to my husband: I should not ask you such a thing if I had not tried *every other channel* for 2 years day and night without any sign of life *whatever*.

Tom,

Meet me in the waiting room at 66 Wimpole Street on Monday morning August 12 at 11.30 and will take you home and take care of you. If you can't *get* there, send me a postcard C/o Dr. Moore and tell me *where* to come and I will come *anywhere*.

Your wife

৯ আগস্ট ১৯৩৫ তারিখে ডঃ মুর চিঠিটি প্রত্যাখ্যান করেন।

এরপর ১৪ আগস্ট ভিভিয়েন তিন পাউন্ড দিয়ে এলিয়টকে রেজিস্ট্রি ডাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি চিঠি পাঠান। সেটি ওই একই চিঠি হতে পারে। তাঁর নিজের ভাই ও এলিয়টের বন্ধু মরিস হে-উডের ওপর রেগে গেছেন ভিভিয়েন (৫ সেপ্টেম্বর, ওই), এলিয়টের ক্রমবর্ধমান ধর্মাচ্ছন্নতা তাঁর ভাল লাগেনি। সুতরাং ভিভিয়েনের এই মন্তব্যটি গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ:

...during our conversation in Hyde Park, you intimated that the Church has got such an ascendency over Tom's mind that it will change his point of view. I see what you mean, but you cannot accuse the Church of having a sane man of genius, and of middle age, in its paper, to such an extent, that his point of view is changed, whether he likes it or not.

England is still a free country, and the Church has no power over the *individual, legally*.'

টমের সঙ্গে দেখা না করার জন্য মরিসকে প্রচণ্ড ভর্ৎসনা করছেন (৭ সেপ্টেম্বর, ওই): 'To me, it sounds like the behaviour of barbarians, and as though all civilisation is killed.'

২৬ সেপ্টেম্বর এলিয়টের জন্মদিনে:

Dearest Tom,

This is to wish you very *many* happy returns of your birthday tomorrow. I enclose cheque for one pound. Dear boy, I *wish you every good thing in this life and for all eternity*. Can't you let me have another address except 24, Russel Square (F & F)? With love,

Your wife.

Buy yourself some *socks* at *Marshall and Snelgrove's*.

V. H. E.

স্নায়বিক বিপর্যয়ের এক চরম মুহূর্তে জনৈক মক্সন ব্রডকে: 'As my husband has found me, he acts for me. In future all business correspondence will be sent on to him, and he has full powers. (When I say

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

found, I mean that he claimed me in public.) (২২ নভেম্বর ১৯৩৫)

অতঃপর হঠাৎ টমের নিজস্ব ও তাঁর দেওয়া জিনিসের তালিকা।

একাকিনী ভিভিয়েনের আগলে রাখা বাড়িখানার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ('damp and not healthy')। তবু এসবের মধ্যেও ১১ মে ১৯৩৬ টমের অসুস্থতার কথা ভেবে আতঙ্কিত। খবর রাখছেন The Radio Times-এ প্রকাশিত বিবিসির নাটক *Murder in the Cathedral*-এর বিজ্ঞপ্তি। করছেন প্রাত্যহিক খরচাপাতির হিসেব। আর্থিক কারণে পিয়ানোটি বিক্রি করতে হয়েছে তাঁকে; এই নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভয়াবহভাবে নাকাল হওয়ার কাহিনি। তারই মধ্যে এক বিরাট, বিষণ্ণ বাড়িতে এক যন্ত্রণাক্লিধুর দম্পতিকে (অ্যান্টনি ও এলায়া) নিয়ে একটি গল্প।

আর একটি গল্পে ভিভিয়েন ধরতে চাইছেন বার্নাড শ'র হাত। কোথাও পেন্সিলে লিখছেন:

> And you in your
> deathbed
> Don't speak of that
> please

অথবা

The non-egoist, however great a brain he has, is doomed to endless boredom.

এ কি এলিয়টের কথা? তিনিই কি নন-ইগোইস্ট? নাকি এখানে নিজের কথা বলছেন ভিভিয়েন?

উল্লেখ করছেন পল মোরাঁ, প্রুস্ত, স্ত্রাভিন্সকি ও মিড্‌লটন মারের নাম। ফেরন মরিস ছদ্মনামে লেখা ভিভিয়েনের একটি গল্প শেষ হচ্ছে এইভাবে:

The sky is clean and scrubbed, reflected in blue pools, then cloudy. As shower stings you, you shudder, all horrible. I hate it, vile, cold, beastly, get home. Then the sun comes to laugh at you, warms you, You smile and swing your stick, call to the dog, and push on towards the sea. (*Letters of the Moment*)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

The Paralysed Woman গল্পে ভিভিয়েনের শক্তিশালী গদ্য পড়ে আশ্চর্য হতে হয়:

Sybil had discovered the woman within an hour of their arrival. Andrew coming in with a hot water bottle, anxious to get her to bed and out of the way, after the fatigues of the journey, had found her at the window in her chemise, immovable.

শুধু একটি আর্তি দিনপঞ্জির পাতা পাতায়: 'Rose-pink, pink rose, bring me a happy day.'

১৯৪৭ সালে ৫৮ বছর বয়সে ভিভিয়েনের মৃত্যু হয়। তাঁকে সমাধিস্থ করার সময় এলিয়ট উপস্থিত ছিলেন। সেই মুহূর্তে কি তাঁর মনে পড়েছিল 'দ্য ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' নাটকের শেষ কয়েকটি পংক্তি:

This way the pilgrimage
Of expiation
Round and round the circle
Completing the charm
So the knot be unknotted
The crossed be uncrossed
The crooked be made straight
And the curse be ended
By intercession
By pilgrimage
By those who depart
In several directions
For their own redemption
And that of the departed
May they rest in peace.

১৯৯৭, ২০০২

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবর খোঁড়া কবিতা

We hibernate among the bricks
And live across the window panes
With marmalade and tea at six
Indifferent to sudden rains
Softening last year's garden plots

And apathetic, with cigars
Careless, while down the street the spring goes
Inspiring mouldy flowerpots,
And broken flutes at garret windows.
(*Interlude in London*)

Across the room the shifting smoke
Settles around the forms that pass
Pass through or clog the brain;
Across the floors that soak
The dregs from broken glass

The walls fling back the scattered screams
Of life that seems
Visionary, and yet hard;
Immediate, and far;
But hard...
Broken and scarred
Like dirty broken finger nails
Tapping the bar.
(*Interlude: in a Bar*)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলিয়টের কবিতা? হ্যাঁ, এলিয়টেরই তো!

ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। সেই চাপা শ্লেষ, সেই অননুকরণীয় তির-তীক্ষ্ণ হিমশীতল কথনভঙ্গি, সেই বিদ্যুচ্চমকের মতো নতুন তরতাজা চিত্রকল্প। সেই প্রবাদপ্রতিম অব্যর্থ শরসংযোগ, যা দিয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মুখচোরা মার্কিন ছোকরাটি প্রায় রাতারাতি ইংরেজি কবিতার খোলনলচে বদলে দিয়ে তার ধমনীতে নতুন রক্ত সঞ্চার করেছিলেন! ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে যা ইংরেজি কবিতাকে করে তুলেছিল অভ্রান্তভাবে সমকালীন।

The lady of the porcelain department
Smiles at the world through a set of false teeth.
She is business-like and keeps a pencil in her hair

But behind her sharpened eyes take flight
The summer evenings in the park
And heated nights in second story dance halls.

Man's life is powerful and brief and dark
It is not possible for me to make her happy.
(*In the Department Store*)

She lay very still in bed with stubborn eyes
Holding her breath lest she begin to think
I was a shadow upright in the corner
Dancing joyously in the firelight.

She stirred in her sleep and clutched the blanket with her fingers
She was very pale and breathed hard.
When morning shook the long nasturium creeper in the tawny bowl
I passed joyously out through the window.
(*Suppressed Complex*)

While you were absent in the lavatory
There came a negro with broad flat eyes
Bringing a dish with oranges and bananas
And brought coffee and cigars.
I was restless, my dear, and a little unhappy
Needing your wide mouth opposite me.
I hung suspended on the finger-bowl
Until a white rabbit hopped beneath the table
Twitching his nose towards the crumbs.
(নামহীন)

টি এস এলিয়টের (১৮৮৮-১৯৬৫) মৃত্যুর কয়েক দশক পরে তাঁর যুবাবয়সের হারিয়ে যাওয়া এই বিস্ফোরক কবিতার খাতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর আর একবার আমাদের কঙ্কাল পর্যন্ত চমকে ওঠে। যেন এই অপ্রকাশিত কবিতাগুলি নব্বই বছর আগে নয়, গতকাল লেখা হয়েছে! নতুন ব্লেডের মতো এদের ধার; যেগুলো ওলটাতে গিয়ে আমাদের কম্পমান আঙুলে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ফুটে ওঠে।

তাঁর একুশ থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত লেখা প্রায় ষাটটি মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা কবিতা পড়ে মনে হবে তিনি মৃত্যুর দেশ থেকে এসে গতানুগতিকতার ফাঁদে আটকে পড়া মধ্যমানের সতীর্থদের ভর্ৎসনা করেছেন। তবে এসব আশ্চর্য কবিতা ছাপেননি কেন এলিয়ট? পৃথিবীর যে কোনও ভাষার কবিই তো এগুলিকে নিজেদের কাব্যগ্রন্থে স্থান দিয়ে ধন্য হতেন! এদের অধিকাংশের আবেদন তাঁর প্রথম পর্বের দুটি কাব্যগ্রন্থ 'প্রুফ্রক অ্যান্ড আদার অবজারভেশনস' (১৯১৭) বা 'পোয়েমস ১৯২০'-র চেয়ে কম নয়।

আসলে, তিনি চর্বিতচর্বণ সহ্য করতে পারতেন না। জীবনানন্দের মতোই, অথবা তাঁর চেয়েও বেশি কঠোরভাবে নিজের কবিতা সম্পাদনা করেছেন এলিয়ট। সারা জীবনে মাত্র সাতটি কবিতার বই বেরিয়েছিল তাঁর, তার মধ্যে 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' (১৯২২), 'দ্য হলো মেন' (১৯২৪) ও 'অ্যাশ-ওয়েডনেসডে' (১৯৩০)-তে মাত্র একটি করে কবিতা। 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড'-কে এজরা পাউন্ডের পরামর্শ অনুযায়ী প্রায় হিংস্রভাবে কাটছাঁট করার পর তা এতই ছোট হয়ে যায় যে কতগুলি আজগুবি টীকা (এলিয়টের ভাষায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'bogus scholarship') জুড়ে দিয়ে বইয়ের আকার দিতে হয়েছিল। তবু তিনি একটিও বাড়তি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি ছিলেন না! প্রগলভতা ও পুনরুক্তিপ্রবণ বাঙালি কবিদের থেকে কি এর থেকে কিছু শেখার নেই?

কবি-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত রচনার প্রকাশ জীবনানন্দ দাশের মতো পথিকৃতের পক্ষে ভাল হয়েছে কি না সে বিষয়ে আমরা আজও সুনিশ্চিত নই। তাঁর অপ্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশিত কবিতার সমমানের কবিতা নেই বললেই চলে। অন্য দিকে, এলিয়টের জীবনের প্রথম পর্বের এই মারাত্মক খাতাটি প্রকাশিত না হলে বড় রকমের ক্ষতি হয়ে যেত বলে মনে হয়। এটি কবির ব্যক্তিগত কর্মশালার মতো।

বাদামি চামড়ায় বাঁধানো ৭২ পৃষ্ঠার রুলটানা ২০.৫ × ১৭ সেমি মাপের এই রহস্যমেদুর নোটবইটি গ্লস্টার, ম্যাসাচুসেটস-এর ওল্ড কর্নার বুক স্টোর থেকে ২৫ সেন্ট দিয়ে কিনেছিলেন এলিয়ট। বিশিষ্ট এলিয়ট-রচনাপঞ্জিকার ডোনাল্ড গ্যালপ জানিয়েছেন খাতাটির বারোটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। বাদবাকি নোটবইটির আঠাশ পৃষ্ঠা ফাঁকা। বাইশটি পৃষ্ঠার দু দিকেই কবিতা লিখেছেন এলিয়ট, অন্যগুলির এক দিকে। প্রথম কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল ১৯০৯ সালের নভেম্বরে হার্ভার্ডে।

প্রথম পৃষ্ঠায় কালো কালিতে লেখা 'কমপ্লিট পোয়েমস অফ'—অতঃপর নীল কালিতে এলিয়টের স্বাক্ষর : টি এস এলিয়ট। উৎসর্গপত্র ও এপিগ্রাফটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর, ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রুফ্রক অ্যান্ড আদার অবজারভেশনস'-এর মতো এই খাতাটিও ১৯১০-১১ সালের প্যারিস প্রবাসের বন্ধু (এলিয়টের স্ত্রী ভিভিয়েনের জীবনীকার ক্যারল সেমুর-জোনস-এর মতে, সমকামী প্রেমিক) জাঁ ভেরদ্যনালের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু দান্তের এপিগ্রাফটি (পুরগাতোরিও, ২১, ১৩২-৬) তাঁর তৃতীয় কবিতার বই 'আরা ভস প্রেক' (১৯২০)-এ ব্যবহৃত। পরে ১৯২৫ সালে 'পোয়েমস ১৯০৯-১৯২৫'-এ আদি নোটবইটির মতো করে উৎসর্গপত্র ও এপিগ্রাফটি ছাপা হয়। জাঁ ভেরদ্যনাল ১৯১৫ সালে মারা যান। সুতরাং উৎসর্গপত্রটি ১৯১৫ সালের আগে খাতায় সংযোজিত হয়নি।

১৯২২ সালের অক্টোবরে 'দ্য ক্রাইটেরিয়ন' পত্রিকায় 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' প্রকাশিত হওয়ার আগেই এলিয়ট নিউইয়র্কবাসী আইনজীবী ও পৃষ্ঠপোষক জন কুইনকে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেন। কুইন পাণ্ডুলিপির দাম দিতে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইলে এলিয়ট রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত রফা হয়, তিনি কুইনকে তাঁর প্রথম পর্বের খাতাটি ১৪০ ডলারে বিক্রি করবেন, এই শর্তে যে কুইন তা কোনওদিন ছাপতে পারবেন না। ১৯৬৩ সালে এলিয়ট কুইনের জীবনীকার বি এল রিডকে লেখেন কবিতাগুলি প্রকাশের অযোগ্য ('unpublishable'); ১৯৬৪ সালে ড্যানিয়েল উডওয়ার্ডকে লেখেন, কবিতাগুলি হারিয়ে যাওয়ায় তিনি দুঃখিত নন। কুইন মারা যান ১৯২৪ সালে। ১৯৬৫ সালে তাঁর মৃত্যুর বছরেও এলিয়ট পাণ্ডুলিপি দুটির সন্ধান জানতেন না। ওদিকে ১৯৫৮ সালে এলিয়টের ৭০তম জন্মদিনে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি কুইনের বংশধরদের কাছ থেকে খাতাটি কিনে নেয়। এলিয়টের মৃত্যুর তিন বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের আগে জানাই যায়নি খাতাটি তাঁদের সংগ্রহে আছে!

১৯৭১ সালে 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপিটি ছাপা হয়। আর প্রথম পর্বের এই খাতাটি ছাপা হতে লেগে যায় আরও আড়াই দশক। এত দিন পরে স্বয়ং এলিয়টের নিজের কবিতার বই, এটা এক রোমহর্ষক ঘটনা, অথচ প্রকাশিত হওয়ার পরে পুরো জিনিসটি কেন নিভৃতে রয়ে গেল সেটাও অবশ্য খুবই রহস্যময়। কিছুদিন আগে স্বয়ং ফ্র্যাঙ্ক কারমোড এলিয়ট গবেষণায় মূলগত পরিবর্তনের জন্য কোনও বাঙালির লেখা একটি বইয়ের নাম করেন; 'সানডে টাইমস' সেই বইটির সঙ্গে ভিভিয়েন এলিয়টের সদ্য প্রকাশিত জীবনীটিও জুড়ে দেন। কিন্তু আমি বলব আলোচ্য গ্রন্থটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জর্জীয় কবিতার রক্তাল্পতায় বিরক্ত এলিয়ট কীভাবে প্রায় ভাস্করের মতো সাধনায় এক সময়োপযোগী নতুন কাব্যভাষা (তাত্ত্বিক জার্গনে 'পোয়েটিক ডিসকোর্স') নির্মাণ করেন, তার নেপথ্য ইতিহাস জানতে এই বইটি ওলটাতে হবে। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম বইয়ের বহু বিখ্যাত কবিতার ('লাভ সং অফ জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক', 'প্রিলিউডস', 'র‍্যাপসডি অন এ উইনডি নাইট', 'মি. অ্যাপলিন্যাক্স,' 'গেরনটিয়ন,' 'সুইনি এরেক্ট', 'হুইসপারস্ অফ ইম্মরটালিটি') প্রথম খসড়ার পাশাপাশি রয়েছে কখনও পেনসিল, কখনও নীল বা কালো কালিতে লেখা বেশ কিছু অপ্রকাশিত কবিতা। যেরকম নিষ্ঠায় আর্টের ছাত্ররা মহৎ চিত্রকরদের ছবি নকল করে নিজস্ব ভাষা খোঁজে, টম সেইভাবে ফরাসি কবিতার নবতম আবিষ্কারকদের ভাষা হাতড়ে খুঁজছেন নতুন রাস্তা। তার সঙ্গে মেশাতে চাইছেন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ইংরেজি

কবিতার ঘনত্ব ও মেটাফিজিকাল কবিদের মস্তিষ্ক দিয়ে অনুভব করার বিশেষ ক্ষমতা (thought-feeling)। এভাবেই কেলাসিত হয়ে উঠেছে এক নতুন ভাষা।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হল এই খাতায় এমন কয়েকটি কবিতা আছে যা লুকিয়ে রেখে নিজের ও ইংরেজি কবিতার ওপর সুবিচার করেননি কবি। 'আন্ট হেলেন' নামের টানা গদ্যে লেখা কবিতাটি (যেটিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করেছিলেন) ছাড়াও তিনি যে কী রকম সাংঘাতিক গদ্যকবিতা লিখেছেন তার উদাহরণ:

The mind was six feet deep in a cistern and a brown snake with a triangular head having swallowed his tail was struggling like two fists interlocked. His head slipped along the brick wall, scraping at the cracks.

(*Introspection*)

After the engine stopped, I lay in bed listening while the wash subsided and the scuffle of feet died out. The music ceased, but a mouth organ from the steerage picked up the tune. I switched on the light, only to see on the wall a spider taut as drumhead, the life of endless geological periods concentrated into a small spot of intense apathy at my feet. "And if the ship goes down" I thought drowsily "he is prepared and will somehow persist, for he is very old. But the flat faces..." I tried to assemble these nebulae into one pattern. Failing, I roused myself to hear the machine recommence, and then the music, and the feet upon the deck.

(*The Engine II*)

বোদল্যের ও বোদল্যের-উত্তর যে ফরাসি কবিতা থেকে তিনি প্রাণ ভরে আহরণ করেছিলেন তার একটি বিশেষ ঐশ্বর্য হল টানা গদ্যের কবিতা। কিন্তু এলিয়টের টানা গদ্য আলোইয়াজিয়্যুস বেরত্রাঁ, বোদল্যের, র‍্যাঁবো বা

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমকালীনদের মতো নয়। সাহসিকতার দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকলেও, তীক্ষ্ণ ও নৈর্ব্যক্তিক, ঋজু ও ক্ষুরধার এই ছোবলমারা গদ্য একেবারেই তাঁর নিজস্ব। কে জানে কেন তিনি এই পথে হাঁটেননি, স্যাঁ-জন পের্স ও আঁরি মিশোর মতো। ফলে আধুনিক ফরাসি কবিতায় গদ্যের যে দুঃসাহসিক আপসহীন অভিযান, ইংরেজিতে তা একেবারেই সম্ভব হয়নি। আধুনিক ইংরেজি কবিতায় টানা গদ্যকবিতার ধারা স্বয়ং টি এস এলিয়টের হাতেই তৈরি হতে পারত ভাবলে আজ রোমাঞ্চ হয়!

তবে এই পার্শ্বরেখার বাইরে থাকা বইটির সবচেয়ে বিস্ফোরক হল সেই যৌনকবিতাগুলি যা জন কুইনকে খাতাটি বিক্রির সময় খাতা থেকে ছেঁটে (আগেই বারোটি ছেঁটে ফেলা পৃষ্ঠার কথা বলেছি) এজরা পাউন্ডকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন টম। ছেঁড়া পাতাগুলি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাউন্ডের কাগজপত্র থেকে উদ্ধার করে সংকলিত করেছেন ক্রিস্টোফার রিক্স্। নানা সময়ে বারবার পাউন্ড এই 'scatological' কবিতাগুলির প্রশংসা করেছেন। এগুলিতে দুটি চরিত্র : 'King Bolo and his Big Black Kween.' কলাম্বো বলেও একটি চরিত্র আছে।

The cabin boy appeared on deck
And scampered up the mast-o
Columbo grasped him by the balls
And buggered him in the ass-o.
বা
There was a jolly tinker came across the sea
With his four and twenty inches hanging to his knee.
অথবা
O mother dear mother I thought I was able
But ripped up my belly from my cunt to my navel.

With his whanger in his hand he walked through the hall
"By God" said the cook "he's a gona fuck us all."
অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

The bosuns wife came up on deck
With a bucket full of cowshit
Columbo grabbed her round the neck
And raped her on the bowsprit.

কবিতাগুলি দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের চশমা-আঁটা অধ্যাপকদের কষ্ট হবে! তবে সম্ভবত তাঁরা নৈঃশব্দ্যের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখবেন, যেমন রেখেছেন 'সানডে টাইমস্' কথিত অন্য দুটি বই প্রকাশিত হওয়ার পর! এলিয়টের যৌনলাজুকতা সম্পর্কে নানা কথা শুনেছি আমরা। অক্সফোর্ডের বিশিষ্ট অধ্যাপিকা লিনডাল গর্ডন তাঁর জীবনীর প্রথম খণ্ড 'এলিয়ট'স আর্লি ইয়ার্স'-এ প্রথম যৌবন থেকেই এলিয়টের ধর্মভীরুতার কথা ফলাও করে লিখেছেন। বর্তমান কবিতাগুচ্ছ (পৃ. ৩০৫-৩২১) হাটে হাঁড়ি ভাঙার পর বোঝা যাচ্ছে তিনি সম্পূর্ণ সত্যি কথা বলেননি।

১৯১৫-র ফেব্রুয়ারি মাসে ২৭ বছর বয়সি টম এজরা পাউন্ডকে লেখেন: 'I understand that... even so innocent a rhyme as pulled her stockings off/ with a frightful cry of 'Hauptbahnhof!! is considered decadent.' আর উইন্ডহ্যাম লুইস পাউন্ডকে লেখেন: 'Eliot has sent me Bullshit & the Ballad for Big Louise. They are excellent bits of scholarly ribaldry.'

পাঠকের পল ভের্লেন বা গীয়োম আপোলিনেরের তীব্র যৌনতাদীপ্ত কবিতাগুলির কথা ('পোয়েম আ লু') মনে পড়বে। অথবা আপোলিনেরের যৌন-উপন্যাস দুটির কথা : 'লে এক্সপ্লোয়া দ্যঁ জ্যন দঁ জ্যুয়া' এবং 'লে অঁজ মিল ভের্জ'। কিন্তু এসব যাঁদের অবাক করেনি, তাঁদেরও এলিয়টের উগ্র অবদমিত বচনের সামনে খানিকক্ষণ মাথা ঝিমঝিম করা বিচিত্র নয়!

২০০৪

এক অনাবিষ্কৃত আকাশ

ইংরেজি কবিতার রক্তহীনতা ঘোচাতে ও তাকে সমসাময়িক বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করাতে তরুণ টি. এস. এলিয়ট কয়েকজন প্রিয় কবি তথা গদ্য-লেখকের কাছে হাত পেতেছিলেন, প্রায় দুঃসাহসিক নির্লজ্জতায় তাঁদের আবিষ্কারকে তাঁর নিজের কাব্যে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি, একথা আজ কারওরই অজানা নয়। অন্যের শব্দ ও বাক্‌প্রতিমা, মেজাজ ও স্বরভঙ্গি আত্মস্থ করে নিয়ে (এলিয়ট নিজে অবশ্য 'চুরি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন: 'Immature poets imitate; mature poets steal') তাকে এক বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র রূপ দেওয়ার উদাহরণ সাহিত্যের ইতিহাসে বেশি নেই।

কবিতায় প্রায় হাতেখড়ির যুগ থেকে, লাফর্গ-মুগ্ধতার প্রথম পর্বে—তখনও তিনি হারভার্ডের ছাত্র—এলিয়ট নিজের এই দ্বৈধ ও বিমিশ্র কাব্যনির্মাণপদ্ধতির মজাটা টের পেয়ে গিয়েছিলেন, বুঝতে পারছিলেন এ পথেই আলো জ্বেলে আধুনিকতার ক্রমমুক্তি হতে পারে। পরে এজরা পাউন্ডের সায় ও উৎসাহে তাঁর আত্মবিশ্বাস চতুর্গুণ বেড়ে যায়। কবিতায় এই পথ হাতড়ানোর পাশে পাশে, নিজস্ব কাব্যভাবনাকে গদ্যরূপ দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলেন তিনি, যাতে তাঁর অতি-ব্যক্তিগত ও অভিনব প্রকরণের একটি কার্যকারণ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়; শুধু পাঠকের জন্য নয়, তাঁর নিজের জন্যও। এলিয়ট নিজেই বহুবার বলেছেন তিনি তাত্ত্বিক নন, তাঁর তত্ত্বায়ন হল 'a by-product of my private poetry-workshop', এবং 'a prolongation of the thinking that went into the formation of my own verse'। অর্থাৎ সমালোচক এলিয়ট অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলেন প্রধানত কবি এলিয়টের কাব্য-পদ্ধতিকে সাহিত্য-ইতিহাসে একটি স্থায়ী মর্যাদা দিতে। তাঁর কবিতার নিজস্ব গবেষণাগারটি অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে সুকৌশলে সকলের জন্য খুলে দেওয়া হল।

সবচেয়ে বড় কথা হল, তাঁর কবিতার মতো তাঁর সমালোচনাতেও কাব্যতত্ত্বের যে প্রাচীর তোলা হল ইটের পর ইট গেঁথে, তার অনেকগুলিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশ থেকে ধার করা। আগেই বলেছি, প্রধানত তাঁর নিজের কাব্যের সাফাই হিসেবে তিনি লিখেছিলেন, 'অপরিণত কবিরা নকল করে, পরিণতরা চুরি।' এলিয়ট অবশ্য কোথাও সমালোচকদের সম্পর্কে একথা বলেননি, কিন্তু তাঁর নিজের সমালোচনাও বহিঃপ্রভাবের এক জটিল চিন্তাজালকে তুলে ধরে। দুঃখের বিষয়, তাঁর কাব্যের উপর ফরাসি কবিতার প্রভাবের মতো এ দিকটিও শভিনিজ্‌ম ও সাহিত্যিক রাজনীতির কারণে ইংরেজিভাষী প্রাবন্ধিকেরা এড়িয়ে গেছেন।

সমালোচক এলিয়টের প্রথম পর্বে যাঁরা তাঁর ভাবনাকে আড়াল থেকে অদৃশ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের একজন হলেন জ্যুলিয়্যাঁ বেন্‌দা (১৮৬৭-১৯৫৬)। ১৯২২ সালে বিখ্যাত 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ'-এ একটি ফরাসি নিবন্ধে এলিয়ট তাঁর মানসচর্যায় বেন্‌দার অমোঘ ভূমিকার কথা স্বীকার করেন।[১] অথচ এ-কথা এলিয়ট-ভাষ্যকারেরা (ম্যাথিউসন, হেলেন গার্ডনার থেকে এই আমলের রোনাল্ড বুশ, এ. ডি. মুডি ও ক্রিস্টোফার রিক্‌স্) আমল দেননি।[২] দু'চারজন দিয়েছেন, যেমন রেনে ওয়েলেক একটি অর্ধবাক্যে দায়সারাভাবে। এঁরা ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করেন নি।

অথচ আমরা লক্ষ করি, তাঁর প্রথম সমালোচনা-গ্রন্থ *The Sacred Wood* (১৯২০)-এ রেমি দ্য গুরমঁ-র সাথে অনেকবার সমধিক শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হচ্ছে তাঁর নাম। গুরমঁ-র 'বৈজ্ঞানিক' শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে এলিয়টের বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই, তিনিও (এলিয়ট-শিক্ষক আরভিং ব্যাবিটের মতো) সমালোচককে ঐতিহ্যের রক্ষক মনে করছেন, অনুভব ও মননের যৌথ চর্যার সম্ভাবনার কথা তাঁর কাছেই শিখেছেন এলিয়ট, 'সেন্‌সিবিলিটি' শব্দটি নতুনভাবে প্রয়োগ করতে শিখেছেন (উৎস: গুরমঁ-র শব্দবন্ধ 'লা সাঁসিবিলিতে দ্য জ্যুল লাফর্গ', *Promenades littéraires*, 1, ১৯০৪) শিখেছেন নৈর্ব্যক্তিকতার প্রয়োজনীয়তা। তবুও এগুলি যোগ করলে সমালোচক এলিয়টকে আমরা পাচ্ছি না, কোথাও একটা অস্বচ্ছতা থেকে যাচ্ছে। এতে তাঁর স্বকীয়তাই প্রমাণ হচ্ছে হয়তো, যেমন অধিকাংশ এলিয়ট-সমালোচক মনে করেন। কিন্তু এলিয়ট বলেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না, হয়তো তাঁর গতিপথকে অনুধাবন করতে বেন্‌দা নামক ওই উগ্রমেজাজী আদর্শবান ইহুদি আমাদের কিছুটা সাহায্য করতে পারেন।[৩]

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯১০-১১ সালে প্যারিসে থাকাকালীন তরুণ এলিয়ট শার্ল পেগি-সম্পাদিত 'কাইয়ে দ্য লা ক্যাজেন'-এ তাঁর লেখা পড়েন।[৪] এলিয়ট যে নিয়মিত ওই কাগজ পড়তেন সেকথা তাঁর বন্ধু রবার্ট সেনকোর্টের স্মৃতিকথা থেকে আমরা জেনেছি। কিন্তু সেইসময় এলিয়টকে আবিষ্ট করে রেখেছিল ফরাসি প্রতীকী কবিতার বহুকৌণিকতা যাকে 'হাড়ের ভেতর'[৫] অনুভব করতে চাইছিলেন তিনি। বেন্দার গদ্যময় তার্কিকতাকে তেমন ব্যবহার্য মনে হয়নি তাঁর। এর বেশ কয়েক বছর পরে অনিবার্যভাবে এজরা পাউন্ড—ইংরেজি আধুনিকতাবাদের সেই অবিসংবাদিত ধাত্রীদেবতা—বেন্দার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।[৬] ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত এলিয়টের চিঠিপত্রের একটি সংগ্রহ থেকে আমরা জানতে পারছি পাউন্ড তাঁকে বেন্দার সাড়া-জাগানো প্রবন্ধ-গ্রন্থ *Belphégor* (১৯১৮)-এর একটি কপি পাঠিয়েছেন। ১৩ জুলাই পাউন্ডকে লেখা চিঠিতে এলিয়ট বইটির প্রাপ্তিস্বীকার করে জানিয়েছেন, '*Belphégor* received and much pleased with it. If you can procure any other of Julien Benda's works I will purchase them from you.'[৭] ভালেরি এলিয়টের টীকা থেকে আমরা জানতে পারি কিছুদিনের মধ্যে পাউন্ড এলিয়টকে বেন্দার বের্গসন হত্যাকারী *le Bergsonisme ou une philosophie de la Mobilité* (১৯১২) গ্রন্থটিও পাঠিয়েছেন।[৮] তিনি বুঝেছিলেন এলিয়টের ধমনীতে এক নতুন রক্তস্রোত সঞ্চালিত হচ্ছে। এক মাসের মধ্যে ১০ আগস্ট এলিয়ট জনৈক বন্ধুকে লিখছেন, 'Benda's book is ripping'[৯] এবং ২ মে ১৯২১ রবার্ট ম্যাকঅ্যালমনকে, 'I am sure Julien Benda is worth knowing.'[১০] দশ বছর পরে বেন্দার সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আমরা কেউ কেউ *Belphégor*-কে শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে বর্তমান সমাজের ধ্যানধারণার প্রায় শেষ কথা বলে স্বীকার করে নিয়েছিলাম।'[১১] ১৯২২ সালে *The Criterion* প্রকাশ করার সময় তিনি বেন্দার কাছে লেখা চান, তাঁর তেমন মনঃপূত না হলেও সে লেখা সসম্মানে ছাপা হয়।

মনে হয়, এলিয়ট বেন্দার লেখাতে সেই গুণগুলি খুঁজে পেয়েছিলেন—যা তাঁকে গুরমঁ-র ভক্ত করে তুলেছিল: যথা তাঁর 'keen sense of actuality' এবং 'conscientious sense of fact.'[১২] তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে বেন্দা ঠিক গুরমঁ-র মতো জায়মান বেদ্যমানতার রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে পারবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, তাঁর বিশেষ ভাল লেগেছিল, অবক্ষয়ী, অনুভূতিহীন ফরাসি সমাজ সম্পর্কে বেন্দার শল্যচিকিৎসক-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ ও নির্মম বিশ্লেষণ। এলিয়ট-বিশারদেরা যাই মনে করুন না কেন, বিশ ও তিরিশের দশকে বেন্দা ফরাসি চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সম্প্রতি লারুস সাহিত্য-অভিধানে তাঁকে 'agitateur d'idées'[১৩] বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং রেমি দ্য গুরমঁ বা শার্ল মোরাসের চেয়ে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কঠোর যুক্তিনিষ্ঠতার জন্য ও যাবতীয় 'সাহিত্যিকতা'-র সঙ্গে আপস না করার জন্য তাঁর প্রসঙ্গে স্বয়ং সার্ত্রের নামও এসেছে। ইতিহাস ও গণিত বিশেষজ্ঞ এই চিন্তাবিদ কিছুদিন পেগির আনুকূল্যে 'কাইয়ে দ্য লা ক্যাঁজেন'-এ লেখার পর নিজেকে 'মুক্ত মানুষ' বলে ঘোষণা করে মননশীলতার পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মতে, সাহিত্যে অতিরিক্ত ভাবালুতা, নীতিধর্মিতা ও রোম্যান্টিকতার কারণে এই মননশীলতাকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হচ্ছিল না। বের্গসন এবং তাঁর ইনটুইশনিজ্‌মকে যুক্তিনিষ্ঠ সত্যান্বেষণের পথে বাধা বিবেচনা করে তিনি ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকেন। সম্ভবত তাঁরই প্রভাবে একদা-মুগ্ধ এলিয়টের বের্গসন-ভক্তি নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

Belphégor-এর (পৃ. ১৭, ১৮) প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সমসাময়িক ফ্রান্সের 'haine de l'intelligence' (বুদ্ধি সম্পর্কে ঘৃণা), 'la détestation violente consciente et organisée de l'intelligence' (মননশীলতা সম্পর্কে এক হিংস্র, সচেতন ও সংঘটিত ঘৃণা)। তাঁর মনে হয়েছিল বর্তমান সমাজ কোনও শিল্পকর্মের কাছে কেবল ভাবাবেগ ও শিহরন প্রত্যাশা করে এবং সমাজমনে প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির কোনও স্থান নেই। লাফর্গ-কাব্যের অনুসারক টি. এস. এলিয়ট নিজেও এই একই মত পোষণ করতেন, তাঁর মতে বুদ্ধিবৃত্তিই শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগের বিশ্লেষণকে নিয়ন্ত্রণ করে তার মূলনীতি ও সংজ্ঞা নির্ধারণ করবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে দুই সাহিত্যসংস্কারকই অনুধাবন করেছিলেন চিন্তাহীনতাই সমসাময়িক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সত্যি বলতে কী, বেন্দার বই শুরুই হচ্ছে বস্যুয়ের *Henriette d'Angleterre* থেকে একটি শ্লেষাক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে: 'Le charme de sentir est-il donc si fort?' (অনুভূতির মুগ্ধতা কি তবে এতই অপ্রতিরোধ্য?) রোমাঞ্চ-প্রেমীদের তুলোধুনো করতে গিয়ে তিনি শিল্পী ও শিল্পবিষয়ের আত্মিক সংযোগের তত্ত্বকে সরোষে প্রত্যাখ্যান করেছেন (Belphégor, পৃ. ৩)। তাঁর মনে হয়েছে

এই সংযোগ অসম্ভব এবং এর থেকে শুধুই বিশৃঙ্খলা (confusion), অস্বচ্ছতা (imprécision) ও অবিন্যস্ততার (l'art sans forme) জন্ম হয়। এলিয়টের একনিষ্ঠ পাঠকদের মনে পড়বে যে তিনিও সমান ক্ষিপ্রতায় ও হিংস্রতায় 'confusion of thought, emotion and vision'-কে আক্রমণ করেছেন।

এই অস্বাস্থ্যকর আবর্ত থেকে বেরোনোর উপায় হিসেবে বেন্দা যে সহজ রাস্তাটি দেখিয়েছেন সেটি আশ্চর্যজনকভাবে এলিয়ট-সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে: সে পথ নৈর্ব্যক্তিকতার। তিনি লিখেছেন অধিকাংশ লোকই গ্রিয়র মতো ভালবাসতে, ইয়াগোর মতো হিংসে করতে, ডেসডিমোনার মতো কাঁপতে, ফেদ্র্-এর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলতে এবং ভের্তারের মতো মরতে চায়। Est-ce besoin d'ajouter que l'émotion de sympathie n'a rien à voir avec l'émotion esthétique?' (এ কথা কি আদৌ যোগ করার প্রয়োজন আছে যে সহানুভূতির আবেগের সঙ্গে নান্দনিক আবেগের কোনও সম্পর্ক নেই? (*Belphégor*, পৃ. ৫৪-৫৫)। বেলফেগর হল আত্মপূজা (culte de moi, পৃ. ১০৫)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। এলিয়ট নিজে যখন বহুযত্নে 'শিল্পানুভূতি' (art emotion) ও লেখকের 'বিশেষ ধরনের অনুভূতি'-র (particular emotion) ভিতর পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন ('the difference between art and the event is always absolute', *Selected Essays*, পৃ. ১৯), তখন তিনি সচেতনভাবে রেমি দ্য গুরমঁ-র মতো জ্যুলিয়্যাঁ বেন্দারও একটি প্রধান অনুচিন্তার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। এই প্রসঙ্গে বেলফেগর গ্রন্থে ওত্ন্যাঁ দোস্যাঁভিল-এর একটি উদ্ধৃতি স্মরণ করা যেতে পারে (পৃ. ১১০):

Il y a une beauté littéraire, impersonelle en quelque sorte, parfaitement distincte de l'auteur lui-même et son organisation, beauté qui a sa raison d'être et ses lois....

(একরকম সাহিত্যিক সৌন্দর্য আছে যাকে কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক বলা যায়, যা লেখকের ও তাঁর পরিমণ্ডল থেকে আলাদা, যার একটি নিজস্ব যুক্তি ও নিয়ম আছে...)

সুতরাং, মনস্তাত্ত্বিক তথা জীবনীভিত্তিক সমালোচনার ঐতিহ্য সম্পর্কে এলিয়টের গভীর অনাস্থাও (তিনি তাঁর নিজের জীবনী লেখার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন) বেন্দার উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য হতে পারে।

আরভিং ব্যাবিটের মতো বেন্দাও এলিয়টকে মৌলিকতাকে ঘৃণা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিখিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মৌলিকতা এক 'religion romantique' (রোম্যান্টিক ধর্ম, পৃ. ৭৬)। তিনি বিদ্রূপ করেন তাঁদের যাঁরা 'অভিনবত্বের তৃষ্ণা'-র ('soif de la nouveauté') কথা বলেন। এলিয়ট যখন ঐতিহ্যচিন্তার সপক্ষে কূটতর্ক করতে গিয়ে 'search for novelty'-কে বিদ্রূপ করেন তখন তাকে বেন্‌দার ফরাসি কণ্ঠস্বরের ইংরেজি প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়।

বেন্‌দা ও এলিয়ট দু'জনেই বিশ্বাস করতে ও করাতে চেয়েছেন যে শিল্পের সত্যিকার মহত্ত্ব নির্ভর করে তার বিন্যাসের ওপর। বেন্‌দার মতে, কোনও জিনিসকে উদ্‌ভাবন করার চেয়ে সেটাকে সাজাতে অনেক বেশি প্রকাশ-প্রতিভার দরকার হয় (*Belphégor*, পৃ. ৭৩)। এলিয়টেরও মতে 'ordered presentation' ও 'arrangement'-টাই আসল রহস্য। বেন্‌দা তাঁর ধ্রুপদী যুক্তির সমর্থনে বোয়ালো, পাসকাল, লা ফঁতেন, লা ব্রুইয়ের ও কর্নেই থেকে যুৎসই উদাহরণ দিয়েছেন। পাসকাল ('Le choix des pensées est invention': চিন্তার নির্বাচনই হল উদ্ভাবন) ও লা ব্রুইয়েরের ('La matière n'est pas nouvelle, mais la disposition l'est': বিষয় নতুন নয়, কিন্তু তার সংস্থাপন নতুন) ক্লাসিক উদ্ধৃতি যে এলিয়ট অস্থিমজ্জা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। একথা বলতে তিনি কখনও ক্লান্ত হননি যে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ কবিতা সব সময়ই প্রকার ও বিন্যাস-বৈচিত্র্য ছাড়া কিছু নয়। তাঁর নিজের কবিতায় এর প্রমাণ মিলবে।

The Sacred Wood-এ এলিয়ট বেন্‌দাকে সমসাময়িক আবর্জনা সাহিত্যের আদর্শ সংস্কারক বলে অভিহিত করেছেন। অশিক্ষিত লেখকদের সম্পর্কে বেন্‌দার তীব্র ভর্ৎসনা (*Belphégor*, পৃ. ১১) স্মরণ করলে মনে হয় এলিয়ট এক ঘুমন্ত সাহিত্য পরিবেশকে জাগিয়ে তুলতে তাঁর তর্কশাস্ত্রের ধারালো অস্ত্রগুলিকে সোনার কাঠি রূপার কাঠির মতো ব্যবহার করতে শিখেছিলেন। এলিয়টের মতো বেন্‌দাও বিশ্বাস করতেন সত্যিকারের শিল্প সর্বসাধারণের জন্য নয়। অবশ্য তিনি সেইসঙ্গে এই আশাও পোষণ করতেন যে মানুষের মধ্যে সংযোগ ও বইয়ের প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবী এবং উৎসুক সাহিত্যপ্রেমীরা তাঁর অভীষ্ট ক্লাসিসিজমের দিকে কোনও না কোনওদিন আকৃষ্ট হবেন (*Belphégor*, পৃ. ১৭৯)। অন্তত এলিয়টের নিজের ক্ষেত্রে এই স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল।

হার্বার্ট হাওয়ার্থ তাঁর অসাধারণ গ্রন্থে জানিয়েছেন যে এলিয়ট বেন্‌দার দুটি

ধারণাকে খারিজ করেছেন: একটি তাঁর স্থূল নারীবিদ্বেষ, অন্যটি সাহিত্যের সংগীতায়ন সম্পর্কে অনাস্থা। এটা ঠিক যে বেন্দা সমকালীন চিন্তাহীনতাকে 'মেয়েলি' বলে পরিহাস করেছিলেন (*Belphégor*, পৃ. ২১০) এবং এলিয়ট তা করেননি, কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক জীবনীকারেরা অনেকেই মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর অবচেতন বিতৃষ্ণার কথা উল্লেখ করেছেন। হয়তো এই কারণেই তিনি কোনও দিন ইয়েট্সের মতো প্রেমের কবিতা লিখতে পারেননি। অন্যদিকে, কবিতার বৈষয়িক ও ধ্বনিগত স্বরসংগতির দিকটি এলিয়টকে সর্বদা মুগ্ধ করেছে। বেন্দা সংগীতের অক্ষম অনুকরণ অনুমোদন করেননি, সাংগীতিক মানসকে তাঁর মনে হয়েছে 'une sensation sans contour', 'diffuse et épandue' (অবয়বহীন, বিকীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত, *Belphégor*, পৃ. ৪১); এবং মূলত নিরাকার (*Belphégor*, পৃ. ৪৩)। হাওয়ার্থ খেয়াল করেননি, পাশাপাশি তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে মহৎ সংগীতস্রষ্টাদের ক্ষেত্রে এই ধারণা প্রযোজ্য নয়, কারণ ভাগনার ও দ্যবুসির মতো শিল্পীরা সাংগীতিক আবেগকে সংযত করে তাকে মূর্তরূপ দিতে সক্ষম। দোষত্রুটি সত্ত্বেও বোদল্যেরের কবিতার মৃন্ময় সংগীত বেন্দার ভাল লেগেছিল (পৃ. ৪৫, পাদটীকা)। আসলে, তিনি সংগীত ও শিল্পকর্মে এক শরীরী সৌষ্ঠব চাইছিলেন। এদিক থেকে এলিয়টের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর কোনও বিরোধ নেই।

শুধু বহিরঙ্গের ওপর ঝোঁক নয়, অবচেতনের প্রতি এলিয়টের পক্ষপাতিত্বও সমর্থিত হয়েছে বেন্দার চিন্তায়। তিনি কোনও একমাত্রিক সাহিত্যের স্বপ্ন দেখছিলেন না, অবচেতনের গুরুত্ব বোঝাতে তিনি অ্যারিস্টটল থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

তবে কি দু'জনের যাত্রাপথ এক? তাঁর স্বভাব-অস্থিরতা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত এক ভিন্‌দেশী কূটতার্কিকের বিমোহিত অনুসারক রয়ে গেলেন? না। আমরা কিছুটা কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করব, দক্ষিণপন্থী ও ক্যাথলিক শার্ল মোরাসের যে বইটি এলিয়টের শেষ পর্বে সুদূরপ্রসারী ছায়া ফেলেছিল[১৪], সেই *L'Avenir de l'Intelligence* (১৯০৫)-কে বেন্দা তাঁর নিজস্ব কায়দায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন। দেকার্তের ভক্ত ও স্বচ্ছতার উপাসক বেন্দা মোরাসের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন ক্লাসিক মানস ও রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাসের এক অনভিপ্রেত মিশ্রণ, যা তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি অথচ এলিয়টকে মুগ্ধ করেছিল। বেন্দা যে এখানে অজ্ঞাতে এলিয়টেরই এক মারাত্মক দুর্বল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় আঘাত করেছেন সেটা এলিয়ট নিজে অন্তত বুঝেছিলেন বলে আমার ধারণা। বেন্দা লিখেছেন, 'ধর্মযাজকদের পক্ষে ক্লাসিসিস্ট হওয়া সম্ভব নয়।' (*Belphégor*, পৃ. ২০৬)। অথচ এলিয়ট তো সেই পথেই হাঁটছিলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত বেন্দা ও এলিয়টের দুটি পথ দুটি দিকে বেঁকে যায়। বেন্দা ক্ষান্ত হননি, তিনি অন্য একটি গ্রন্থে—*La Trahison des clercs* (১৯২৭)—ধর্মের কাছে কিছু কিছু আধুনিক বুদ্ধিজীবীর (যেমন মোরাস, কবি পেগি ও পল ক্লোদেল) 'আত্মসমর্পণ-কে তুলোধুনো করেছেন। সে আঁচ এলিয়টের গায়েও লেগে থাকবে।

বেন্দার একটা বড় অভিযোগ ছিল মোরাস তাঁর সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে রাজনৈতিক মতবাদকে মিশিয়ে ফেলতে দ্বিধা করছেন না। কিন্তু বেন্দার এই খুঁতখুঁতে সাহিত্যিক 'আদর্শবাদ' আর বিশের দশকের শেষ পর্যায়ের এলিয়টকে খুশি করছিল না, আমরা জানি যে ওই সময় থেকেই তিনি ধর্ম, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে ক্রমশ মোরাসীয় পদ্ধতিতে মিলিয়ে দিতে চাইছিলেন। মোরাসের মতোই, এলিয়টের কাছেও চার্চই হয়ে ওঠে ঐতিহ্য ও প্রবহমানতার একটি প্রধান প্রতীক। ১৯২৮ সালে এলিয়ট নিজেকে ক্লাসিসিস্ট, ক্যাথলিক ও রাজপন্থী[১৫] হিসেবে বর্ণনা করার সময় মোরাসের কথাই মনে রেখেছিলেন।[১৬] এই কারণেই হয়তো ১৯২৮ সালে বেন্দার *La Trahison des clercs* গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর সম্পর্কে মত বদলান ও তাঁর 'রোম্যান্টিকতা'-কে প্রকাশ্যে নিন্দে করেন। তিনি লেখেন, 'বুদ্ধিজীবী লেখক কী লিখবেন না লিখবেন আপনি তার ফতোয়া দিতে পারেন না। যেখানে কোনও জৈব সংযোগ নেই সেখানে একজন সাহিত্যিক এক চমকদার লিখিয়ে হতে পারেন, তার বেশি কিছু নয়।'[১৭]

এলিয়ট অকৃতজ্ঞ নন, ১৯২৯ সালেও—যখন তাঁর কবিতা ও কাব্যভাবনায় বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে—তিনি ফেবার অ্যান্ড ফেবার থেকে বেন্দার *Belphégor*-এর একটি ইংরিজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এলিয়টের অনুরোধে বইটির ভূমিকা লিখে দেন তাঁর হারভার্ডের গুরু অধ্যাপক আরভিং ব্যাবিট।[১৮]

এলিয়ট ও বেন্দা অনেকটা একরকম মননজাত নান্দনিকতার চর্চা করেছিলেন। ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে দু'জনেই শিল্প ও শিল্পীর মিস্টিক একাত্মতার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, মৌলিকতাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেননি, অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতাকে পরিহার করার কথা বলেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, এলিয়ট তাঁর কাছে শিখেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত আক্রমণাত্মক ও প্ররোচক দৃঢ়প্রত্যয়ী বাগ্‌ভঙ্গি, সেই নিপুণ জ্যা-সংযোগ ও তির-নিক্ষেপ, যা ইংরেজি সমালোচনাসাহিত্যে তাঁকে আজও অনন্য ব্যতিক্রম করে রেখেছে।

উল্লেখপঞ্জি:

এই নিবন্ধটি লেখার কয়েক মাস পরে আমি অক্সফোর্ডে এলিয়টের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইপত্রের তালিকায় 'বেলফেগর'-এর নাম খুঁজে পাই! সুতরাং আমাদের ভুল হয়নি।

বর্তমান লেখাটিতে ওই বইয়ের (প্রথম প্রকাশ ১৯১৮) তৃতীয় সংস্করণ (Paris: Emil-Paul) ব্যবহার করেছি।

১. 'Lettre d'Angleterre', La NRF, ১ নভেম্বর ১৯২৩, পৃ. ৬২০।

২. ব্যতিক্রম হার্বার্ট হাওয়ার্থের *Notes on Some Figures Behind T. S. Eliot*, London, ১৯৬৫।

৩. এলিয়টের ইহুদি-বিদ্বেষ নিয়ে ক্রিস্টোফার রিক্‌স্ তাঁর *T. S. Eliot and Prejudices*, London, ১৯৮৮ গ্রন্থে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন কিন্তু ভিন্ন প্রসঙ্গে একটি মামুলি উল্লেখ ছাড়া একবারও বেন্‌দার নাম করেননি।

৪. 'Every fortnight Eliot bought one of the *Cahiers de la Quinzaine*, in its grey cover...' *T. S. Eliot: A Memoir*, Robert Sencourt, London, ১৯৭১, পৃ. ৩৬।

৫. এলিয়টের নিজের কথা, *The Criterion*, জানুয়ারি ১৯৩০, পৃ. ৩৫৭। প্রসঙ্গত জীবনানন্দ দাশও বিদেশি সাহিত্যের প্রভাবের আলোচনায় একই শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৬. ১৯২৮ সালে প্রকাশিত এজরা পাউন্ডের নির্বাচিত কবিতার ভূমিকাতেও এলিয়ট স্বীকার করেন যে পাউন্ডের উৎসাহে তিনি বেন্‌দার প্রতি আকৃষ্ট হন।

৭. পাউন্ডকে এলিয়ট, ৩ জুলাই ১৯২০, *Letters of T. S. Eliot*, London, ১৯৮৮, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৮।

৮. ভালেরি এলিয়টের টীকা, ওই, পৃ. ৩৯২

৯. স্কোফিল্ড থেয়ারকে লেখা চিঠি, ১০ আগস্ট ১৯২০, ওই, পৃ. ৪০১।

১০. ২ মে ১৯২১, ওই, পৃ. ৪৪৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১. উদ্ধৃতি হাওয়ার্থ, পৃ. ১৮৩।

১২. 'Observations', *Egoist*, মে ১৯১৮, পৃ. ৭০।

১৩. *Dictionnaire de littérature française et francophone*, Paris: Larousse, ১৯৮৭, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩-৪।

১৪. এলিয়টের স্বীকারোক্তি, "Lettre d'Angleterre", La NRF, ১ নভেম্বর, ১৯২৩, পৃ. ৬২০।

১৫. ভূমিকা, *For Lancelot Andrews*, London, ১৯২৮।

১৬. ১৯১৩ সালের জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় মোরাস-সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে আলবের তিবোদে এই বিশেষণগুলিই ব্যবহার করেছিলেন।

১৭. 'The Idealism of Julien Benda,' *New Republic*, ১২ ডিসেম্বর ১৯২৮, পৃ. ১০৭।

১৮. অনুবাদক ছিলেন S.J.I. Lawson।

১৯৯৭

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলিয়টের ফরাসি ঋণ ও কিছু প্রশ্ন

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হারভার্ডের এক মুখচোরা দর্শনের ছাত্র প্রায় রাতারাতি ইংরেজি কবিতার খোলনলচে বদলে দিয়ে তাকে সমকালীন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। কবিতার বচনকে ভেঙেচুরে প্রায় হিংস্র নিপুণতায় তাকে পুনর্নির্মাণ করার এমন চোখ-ধাঁধানো উদাহরণ আর নেই। প্রচলিত প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার, এক তির্যক আত্মশ্লেষ, ইংরেজি কবিতায় প্রায় অপরিচিত এক নতুন ঠান্ডা বাক্‌ভঙ্গি, ভঙ্গুর বস্তুজগৎকে অভিনব সব চিত্রকল্পে ধরার চেষ্টা... সবে মিলে তাঁর হাতে ইংরেজি কবিতা হয়ে উঠেছিল অভ্রান্তভাবে সমকালীন। পরবর্তীকালের কবিদের ওপর—বাঙালি কবিরাও এর ব্যতিক্রম নন—তাঁর একক প্রভাব প্রায় কিংবদন্তীর মতো।

তাঁর বিস্ফোরক কাব্যভাষার আড়ালে যে একটি অতি-নিজস্ব, চমকপ্রদ ও বিতর্কিত কাব্যনির্মাণপদ্ধতি কাজ করছিল তা জানাতে এলিয়ট কখনও দ্বিধা করেননি। শুধু এপিগ্রাফের গুরুগম্ভীর উদ্ধৃতি নয়, কবিতার সর্বাঙ্গে নামাবলির মতো অপরের বাক্য দেখে বিদগ্ধ পাঠকের মনে জেগে ওঠা কূট সন্দেহকে আরও উসকে দেওয়াই সঠিক পথ বলে মনে হয়েছিল তাঁর। তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে মৌলিকতাকে তিনি গুরুত্ব দেন না, 'search for novelty' একটি নিন্দনীয় জিনিস, 'ordered presentation' ও 'arrangement'-ই আসল রহস্য। বলেছেন, 'No poet, no artist of any art has his complete meaning alone', শেষ পর্যন্ত ১৯২২ সালে প্রকাশিত 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর শেষে এক দীর্ঘ ও জটিল উল্লেখপঞ্জি জুড়ে দিয়ে (পরে অবশ্য বলেছিলেন পুরো ব্যাপারটা একটা বুজরুকি, পৃষ্ঠা বাড়ানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল) উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন তাঁর কবিতার জন্ম-রহস্য, বোঝাতে চেয়েছেন বহু কাঠখড় পুড়িয়ে ইটের পর ইট দিয়ে গড়া এই কোলাজধর্মী নির্মাণ একটা সচেতন নির্মাণ। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এলিয়ট তথা টি. ই. হিউম, এফ. এস. ফ্লিন্ট, রিচার্ড অ্যালডিংটন ও তাঁর নিজের দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এজরা পাউন্ড 'রাসায়নিক গবেষণাগার' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। এলিয়ট নিজেও তাঁর বিখ্যাত একটি প্রবন্ধে ('ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইনডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট') কাব্যনির্মাণকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করে জানিয়েছিলেন যে কবি একজন অনুঘটক মাত্র, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনভাবনা সেখানে অনুপস্থিত। গবেষণাগারে যে বিচিত্র উপাদানের মিশ্রণ ঘটবে সে তো বলাই বাহুল্য।

এলিয়টের রচনায় 'অন্যে'র উপস্থিতি নিয়ে ইতস্তত গবেষণা হলেও (এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে গ্রোভার স্মিথের নাম করতেই হয়) তাঁর প্রবল খ্যাতির সামনে শেষ পর্যন্ত তা ধামাচাপা পড়ে গেছে। মোটের ওপর, মেনে নেওয়া হয়েছে যে দান্তে, এলিজাবেথীয় ও মেটাফিজিকাল কবিদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করলেও এঁদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে তাঁর সময় লাগেনি, এবং অচিরেই তিনি তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছেন। আমেরিকা থেকে আগত লাজুক ছোকরাটি হয়ে উঠেছেন ইঙ্গ-আমেরিকান কবিতার এক মহৎ প্রতিষ্ঠান।

তবু আলমারির কঙ্কাল পাল্লা নাড়া দেয়। ১৯৪০ সালে ইয়েট্স-বিষয়ক বক্তৃতায় এলিয়ট বলে ফেলেন, 'The kind of poetry that I needed to teach me the use of my own voice did not exist in English at all, *it was only to be found in French*.' (বক্রলেখ আমার) ১৯৪৮-এ, অর্থাৎ তাঁর অর্ডার অব্ মেরিট ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির বছর, এলিয়ট লেখেন, 'Without the tradition which starts with Baudelaire and culminates in Valéry, my own work would be inconceivable.' এগুলো কি স্বীকারোক্তি? এর উদ্দেশ্য কী? ভাষ্যকারদের ঠিক পথে চালিত করা? তাঁকে নিয়ে ভুল প্রশস্তির পাহাড় ক্রমশ স্ফীত হচ্ছিল বলে? নাকি কোনও গভীর অপরাধবোধ কয়েক দশক ধরে আধুনিক ইংরেজি কবিতার সবচেয়ে প্রভাবশালী পুরোধাটিকে কুরে কুরে খাচ্ছিল? ১৯৪৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ফরাসি বেতারে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারেও এলিয়ট নিজেকে বোদল্যের-পরবর্তী ফরাসি কবিতার এক 'ক্ষুদ্র উত্তরসূরি' (petit héritier) বলে দাবি করেন।

তাঁর ফরাসি প্রভাবের এই স্বীকৃতির পরও ইঙ্গ-আমেরিকান সমালোচনা-সাহিত্যের স্থিতাবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এর কারণ সম্ভবত তিনটি: (এক) সাহিত্যিক রাজনীতি (দুই) অন্য দেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঔদাসীন্য, যা যতটা অবচেতন হয়তো ততটাই সচেতন (তিন) ফরাসি

ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির অভাব, ফরাসি সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। এলিয়টের বিকাশ-প্রক্রিয়ার ওপর যবনিকা না তোলার সাহিত্য-বহির্ভূত কারণগুলি সহজেই অনুমান করা যায়।

এলিয়ট-ভক্তেরা জানেন, ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হারভার্ড ইউনিয়ন লাইব্রেরিতে আর্থার সাইমন্স্-এর 'দ্য সিম্বলিস্ট মুভমেন্ট ইন লিটারেচার' (১৮৯৯, ২য় সং ১৯০৮) বইটি এলিয়টের জীবনের গতিপথ বদলে দেয় ('It changed the course of my life,' *Criterion,* জানুয়ারি ১৯৩০)। এরপর এলিয়ট প্যারিস থেকে তিন খণ্ড লাফর্গ (১৮৬০-১৮৮৭) রচনাবলী আনিয়ে নেন ও সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কবিতায় হাত মকশ করতে শুরু করেন। আমেরিকাকে তাঁর মনে হয়েছিল 'মরুভূমি'র মতো, রক্তহীনতার অসুখে ভোগা তৎকালীন ইংরেজি কবিতা ছিল তাঁর কাছে অসহ্য। ফ্রান্সের অদম্য আকর্ষণে ১৯১০ সালে প্যারিসে উপস্থিত হলেন বাইশ বছরের যুবক, যাঁর জনৈক পূর্বপুরুষ ছিলেন ফরাসি (বার্ট্রান্ড রাসেলকে লেখা এলিয়টের মা'র চিঠি, ২৩ মে ১৯১৬)। ঘর নিলেন লাতিন কোয়ার্টারের এক বোর্ডিং-এ, যেখানে তাঁর সঙ্গে থাকতেন জাঁ ভেরদ্যনাল (১৮৮৯-১৯১৫) নামে এক ফরাসি ডাক্তারির ছাত্র, যাঁকে পরে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'প্রুফ্রক অ্যান্ড আদার অব্জারভেশন্স্' (১৯১৭) উৎসর্গ করবেন এলিয়ট। এলিয়টের প্রথম স্ত্রী ভিভিয়েনের জীবনীকার ক্যারল সেমুর জোন্সের মতে, তিনি ছিলেন এলিয়টের প্রথম পুরুষ-প্রেমিক। ভেরদ্যনালও লাফর্গের ভক্ত, এলিয়টেরই মতো, তিনিও সবসময় সঙ্গে রাখতেন লাফর্গের কবিতা ও গদ্যগ্রন্থ 'মরালিতে লেজাঁদের'। লাফর্গের আরেক অন্ধ ভক্ত আল্যাঁ ফুর্ণিয়ে (কিছুদিনের মধ্যেই 'ল্য গ্রাঁ মোল্ন' নামে এক উপন্যাস লিখে যিনি ফ্রান্সকে শিহরিত করবেন)-র কাছে ফরাসি শিখতেন এলিয়ট, ফুর্ণিয়ের শ্যালক তরুণ সাহিত্যরসিক ও লাফর্গ-প্রেমিক জাক রিভিয়েরের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়। সেন নদীর ধারে দেখতেন হেঁটে চলেছেন আনাতোল ফ্রাঁস, কিনতেন আঁদ্রে জিদ ও পল ক্লোদেলের নতুন বই, আলোড়ন-সৃষ্টিকারী সাহিত্যের কাগজ 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ' ও 'কাইয়ে দ্য লা ক্যাঁজেন'। কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ আঁরি বের্গসনের বক্তৃতা শোনার জন্য কখনও কখনও পাঁচ ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হয়েছে এলিয়টকে। আধুনিকতার অন্বেষণের এক বিশেষ মুহূর্তে কবিতা আর ফ্রান্স সমার্থক হয়ে গিয়েছিল ওই মার্কিন যুবকের কাছে। ১৯৪৪ সালে 'লা ফ্রাঁস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিব্‌র্‌ পত্রিকায় এলিয়ট ফরাসিতে যা লিখেছিলেন তার ইংরেজি করলে দাঁড়ায়: 'It was not an accident which took me to Paris. For several years, France, represented for me poetry.' একসময় ইংরেজি ছেড়ে শুধুমাত্র ফরাসিতে কবিতা লেখার কথাও ভেবেছিলেন তিনি। সেকথা স্বীকার করেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে: 'I had at that time the idea of giving up English, and trying to settle down and scrape along in paris, and gradually write in French.' (*Paris Review*, ১৯৫৯)

তবু আট দশক ধরে সায়েব সমালোচকেরা ভেবেচিন্তে এলিয়টের গোড়ার দিকের লেখায় লাফর্গের আত্মশ্লেষ ছাড়া বিশেষ কিছু পাননি। অথচ আজ এতদিন পরেও লাফর্গের কবিতা সংগ্রহ ওলটাতে ওলটাতে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়! ১৮৮৮ সালে এলিয়টের জন্মের এক বছর আগে মৃত এক সাতাশ বছরের প্লুরিসি-আক্রান্ত ফরাসি তরুণ কি পুনর্জন্ম পেয়ে ফিরে এলেন এক ইয়োরোপ-প্রেমিক মার্কিনের মধ্যে? আর্টের ছাত্রেরা যেভাবে মহৎ শিল্পীদের নকল করে মুন্সিয়ানা অর্জন করেন, এলিয়ট তাঁর তরুণ গুরুটিকে সেভাবেই অনুকরণ করতে করতে মোহজাল ছিঁড়ে আর বেরোতে পারেননি। এ যেন এক আমেরিকানের শরীরে এক প্রিয় ফরাসি কবির পুনর্জন্ম! এলিয়ট অনেক পরে লিখেছিলেন: 'It is a cause of development, like personal relations in life. Like personal intimacies in life, it may and probably will pass, but it will be ineffaceable... We do not imitate, we are changed; and our work is the work of the changed man; we have not borrowed, we have been quickened, and we become, bearers of a tradition.' পরে মৃত্যুর চার বছর আগে তিনি লাফর্গ ও করবিয়েরকে 'admired elder brothers' বলে অভিহিত করেন।

জ্যুল লাফর্গ আর টি. এস. এলিয়টের জীবন-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির এত মিল যে বিশ্বাস হতে চায় না। স্নায়বিক ভীরুতা ও আত্মরসিকতার দিকটিতে তাঁদের অদ্ভুত ভ্রাতৃত্ব। এলিয়ট যখন বলেন, 'In short, I was afraid', লাফর্গও তাই বলেন। রোম্যান্টিকতা ও রোম্যান্টিকতা-বিরোধিতার দোলাচলে দোদুল্যমান দুই কবির ভাষাভঙ্গিও অস্বস্তিকর ভাবে একই ধরনের। এলিয়টের ছন্দ ও গদ্যকবিতার মূল ধাঁচ লাফর্গের থেকে নেওয়া। এলিয়ট তাঁর কাছেই শিখেছিলেন প্রশ্নবোধক বাক্য ও পুনরুক্তির জাদুকরি ক্ষমতা, যা দিয়ে তিনি

ইংরেজি কবিতার পাঠককে সম্মোহিত করতে পেরেছিলেন: 'Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach?' (প্রুফ্রক), 'Has it begun to sprout? Will it bloom this year?' (ওয়েস্ট ল্যান্ড) বা 'What are you thinking of? What thinking? What?' তাঁর বিখ্যাত উদ্ধৃতিপ্রিয়তাও—বিশেষ করে বিদেশি সাহিত্য থেকে—লাফর্গের কাছ থেকে শেখা। লাফর্গের কবিতায় এপিগ্রাফের চমকপ্রদ প্রয়োগ নক্ষত্রখচিত ফরাসি কবিতার জগতেও গভীরভাবে বৈপ্লবিক। একইভাবে এলিয়টের ব্যবহৃত এপিগ্রাফগুলি ইংরেজি কবিতাকে এক নতুন রূপ দিয়েছিল। অথচ এই নতুন রূপের পেছনে লাফর্গের ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়নি।

এলিয়টের যেসব ধাক্কা দেওয়া পংক্তি পড়ে একসময় ইংরেজি কবিতার পাঠকের হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে যেত, আজও যায়, সেসব অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজিতে লাফর্গের সচেতন ও চেষ্টাকৃত অনুলিখন। যেমন ধরা যাক, সেই অসাধারণ দুটি লাইন 'Women come and go/Talking of Michelangelo' লাফর্গের 'On les voit passer, repasser sérieux... deux femmes causent', (One watches their coming and going, seriously... two women talk) থেকে উঠে এসে থাকতে পারে। আর সম্ভবত মিকেলাঞ্জেলো এসেছে লাফর্গের লিওনার্দো দা ভিঞ্চি থেকে। 'লাভ সং অফ জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক'-এ সন্ধে নেমে আসার সঙ্গে অপারেশন টেবিলের তুলনা লাফর্গের কবিতায় সূর্যাস্ত ও কশাই-এর tablier (এলিয়ট 'টেবিল' বুঝে থাকবেন, যদিও ফরাসিতে 'তাবলিয়ে' শব্দের অর্থ পোশাক, 'এপ্রন')-র বর্ণনার সংহত ইংরেজি সংস্করণ। এলিয়টের 'tobacco trance' যাঁদের মুগ্ধ করেছে তাঁরা ক'জন জানেন যে এগুলো লাফর্গের শব্দ ('transe de tabac')!

প্রুফ্রকের প্রেমগীতির স্যুররেয়ালিস্ত পরিসমাপ্তি—মৎস্যকন্যাদের উল্লেখশুদ্ধ—লাফর্গের 'Préludes autobiographiques'-এর পরিসমাপ্তির প্রায় মূলানুগ অনুবাদ বলা চলে। 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এ যেসব পংক্তি পড়ে ('Goonight Bill, Goonight Lou. Goonight May. Goonight./Tata. Goonight. Goonight./Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, good night.') গুণীরা এলিয়টের ক্ষমতার তারিফ করেছেন তা নিঃসন্দেহে—শেক্সপীয়র থেকে নয়, শেক্সপীয়রের দূরত্ব ('remote and quaint') এবং লাফর্গের অগ্রজপ্রতিম ঘনিষ্ঠতার কথা এলিয়ট স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—লাফর্গের গদ্যরচনা 'হ্যামলেট' থেকে সংগৃহীত। এলিয়টে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাগলের জেরানিয়াম নাড়ানোও লাফর্গের জেরানিয়ামকে মনে করিয়ে দেয়। এলিয়টের 'Remark the cat that flattens itself in the gutter' লাফর্গের রাস্তা-পেরোনো বেড়ালের ('un chat traverse la place') ইংরেজি সংস্করণ। 'পোট্রেট অফ এ লেডি'তে 'correct our watches by the public clocks' ও হয়তো লাফর্গের লুকসাঁবুর পার্কের ঘড়ি থেকে ধার করা। ঘড়ি ও সময়ের প্রসঙ্গ লাফর্গে বারবার এসেছে। আমি এখানে দু'-চারটি উদাহরণ দিলাম মাত্র।

শুরু থেকেই পরিভাষা ও তৈরি-করা শব্দ ব্যবহারের একটা ঝোঁক ছিল এলিয়টের। তাঁর কবিতায় phtistic, protozoic, anfractuous, arboreal, polyphilo-progenitive, origen, piaculative, wistaria, mocha প্রভৃতি খটমট শব্দ পড়ে যাঁরা থতমত খেয়েছেন, তাঁরা লাফর্গের plénipotentaire, zaimph, solfatare, argutial, spleenuosité পড়ে আরও অস্বস্তিবোধ করতে পারেন।

ঠিক তেমনিই 'ওয়েস্ট ল্যান্ডে'র 'যুগান্তকারী' পংক্তি 'Drip drop drip drop drop drop drop' লাফর্গের 'Klip klop klip klop'-এর প্রতিধ্বনি মাত্র। এলিয়ট-পাঠকের মনে পড়বে 'Co co rico co co rico' (ওয়েস্ট ল্যান্ড), 'Twit twit twit/Jug jug jug jug jug jug' (ওয়েস্ট ল্যান্ড) অথবা 'Hoo ha ha/Hoo ha ha/Hoo/Hoo/KNOCK KNOCK KNOCK (ফ্র্যাগমেন্ট অফ অ্যান অ্যাগন) যার উৎস নিশ্চয়ই লাফর্গের 'বিন ব্যাম বিন ব্যাম' (Complainte des cloches) বা 'Hoyotoho! heiaha! Hahei! Haiaho! Hoyohai!' (Moralités)। অবশ্য এসবের চেয়েও যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল তরুণ লাফর্গের হ্রস্ব কবিজীবনে যে বিবর্তন (গত সাত দশকে এলিয়টের একজন ভাষ্যকারও যা লক্ষ করেননি) আসছিল: আত্মশ্লেষ ও আত্মকরুণা থেকে যন্ত্রণার গহ্বর পার হয়ে অধ্যাত্মচেতনার দিকে, এলিয়টের দীর্ঘতর কাব্যপরিক্রমার বিবর্তনের সঙ্গে ('প্রুফ্রক' পর্যায়, 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' এবং 'হলো মেন' পর্যায় ও উত্তর-'হলো মেন' পর্যায়) তা প্রায় নিখুঁতভাবে মিলে যায়। এমনকী 'অ্যাশ-ওয়েডনেজডে'-তে ধর্মের কাছে আত্মনিবেদনও লাফর্গের শেষ পর্যায়ের কাব্যের কথা না মনে করিয়ে দিয়ে পারে না।

এলিয়টের লাফর্গ-মুগ্ধতা এমন ব্যাপক ও গভীরভাবে তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে বিশের দশকের গোড়ায় লাফর্গের বহির্প্রভাব কাটিয়ে উঠলেও ভূতগ্রস্তের মতো সারাজীবন ধরে তিনি তাঁরই প্রদর্শিত পথে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেঁটে গেছেন। অথচ গত সাত দশকে একজন এলিয়ট বিশারদও তা দেখতে পেলেন না!

প্রথম থেকেই অব্যর্থ শরসন্ধানে অন্যের আবিষ্কারকে নিজের কাজে লাগিয়ে চূড়ান্ত সাফল্য পেয়ে গিয়েছিলেন টি. এস. এলিয়ট। ফলে শেষ জীবন পর্যন্ত এ-প্রবণতা তাঁকে ছাড়েনি। পরিণত বয়সেও 'দ্য ট্রায়াম্ফাল মার্চ'-এর শেষ ফরাসি পংক্তিগুলি তাঁর প্রিয় লেখক শার্ল মোরাসের *L'Avenir de l'Intelligence* (১৯০৫) থেকে কমা, ফুলস্টপ, প্রশ্নচিহ্ন শুদ্ধ ব্যবহৃত। এলিয়টের গভীর দার্শনিক উচ্চারণ 'In my beginning is my end' ও 'In my end is my beginning' খোদাই করা আছে সমারসেটে তাঁর আদি গ্রাম ইস্ট কোকারের সেন্ট মাইকেলস গির্জার স্মৃতিফলকে। সেগুলি পড়তে পড়তে কোনও এলিয়ট-তীর্থযাত্রীর কি ভুলেও মনে পড়বে যক্ষ্মারোগে মৃত এক বিদঘুটে তরুণের কথা, যাঁর নাম ত্রিস্তাঁ করবিয়ের, যাঁর 'এপিতাফ' কবিতা থেকে ওই লাইন দুটির জন্ম? যদি কোনও পাঠক মনে করেন এটা সমাপতন মাত্র, এখানে জানিয়ে রাখি করবিয়েরের কাব্যগ্রন্থ 'লে জামুর জোন' শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সংগ্রহে ছিল। জ্যুল লাফর্গের গুরু ত্রিস্তাঁ করবিয়েরের (১৮৪৫-১৮৭৫) প্রতি অবশ্য এলিয়ট মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ গদ্যগ্রন্থ *To Criticize the Critic*-এ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, কিন্তু জানাননি ঠিক কী ঋণ ছিল তাঁর কাছে। ওই বিশ্ববিশ্রুত পংক্তি দুটি ছাড়াও এলিয়ট করবিয়রের কাছে শিখেছিলেন তাঁর সেই ছুরির ফলার মতো ধারালো আইরনি, তাঁর পেটেন্ট হিসেবে পরিচিত সেই বিখ্যাত টাইপোগ্রাফিক স্টাইল।

করবিয়েরের Ay panneau 0 0 0 0 থেকে এলিয়টের 0 0 0 0 that Shakespeherian Rag-এর জন্ম হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, ঠিক যেমন সম্ভব তাঁর

Lord Byron, gentleman-vampire
Hystérique du ténébreux
Anglais sec, cassé par son rire
Son noble rire de lépreux
(Lord Byron, gentleman-ghoul

Hysteric of the sombre
A Briton, dry and shaken
By his noble leprous laughter)

থেকে এলিয়টের

I shall not want Honour in Heaven
For I shall meet Sir Philip Sydney
And have talk with Coriolanus
And other heroes of that kidney

-র মতো স্তবক উঠে আসার। করবিয়েরের কোয়াট্রেনগুলির হিংস্র আইরনি এবং সাহিত্যিক আইকনদের নামের এইরকম শ্লেষাক্ত প্রয়োগ এলিয়টের কবিতায় কীভাবে ফিরে এসেছে, তা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে না! এলিয়ট ফরাসিতে যে-কটি কবিতা লিখেছেন তার একটির শিরোনামে ('Mélange adultère de tout') নির্দ্বিধায় করবিয়েরের পংক্তি ব্যবহার করেছেন। এলিয়টের ব্যক্তিগত সংগ্রহের তালিকায় যে করবিয়েরের কবিতার বইটি (*Les Amours jaunes*) ছিল তা আমি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বড্‌লেয়ান লাইব্রেরিতে রক্ষিত ভিভিয়েন এলিয়টের ডায়েরিতে দেখে এসেছি।

বোদল্যেরের ব্যাপক প্রভাবের আলোচনায় না গিয়ে (কারণ এলিয়ট নিজেই অন্তত চারবার এ বিষয়ে লিখেছেন) শুধু এইটুকু বলা যায় যে কেবল শহরের মালিন্য নয়, উপমার আকস্মিক আধিভৌতিক মাত্রা নয়, যন্ত্রণার অবস্থা ও অশুভ থেকে শুভের মধ্যে উত্তরণের আর্তি এলিয়ট শিখেছিলেন দান্তে ও বোদল্যেরের কাছে। এলিয়টের মনে হয়েছিল, বোদল্যের এক 'খণ্ডিত দান্তে' ('a fragmentary Dante') যিনি খুঁজছিলেন 'a form of life.' তাছাড়া লাফর্গ ও করবিয়ের তো বোদল্যের-প্রবর্তিত ঐতিহ্যের একটি বিশেষ ধারার অঙ্গ।

কিন্তু 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' পড়তে পড়তে বোদল্যের ছাড়াও অন্য এক বিশিষ্ট কণ্ঠস্বরের কথা মনে পড়েছিল। ওই কথ্য ও কেতাদুরস্ত স্টাইল, ওই কসমোপলিটান চরিত্র, ওই গতি, ওই বহুভাষিক বচন, জটিলতার মধ্যেও ওই

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বচ্ছতা ঠিক যেন বিশ শতকের প্রথম পর্বের কবি ভালেরি লারবোর (১৮৮১-১৯৫৭) মতো! লারবোর কবিতার প্রধান চরিত্র আ. ও. বারনাবু (যার সঙ্গে জে. অ্যালফ্রেড প্রুফ্রকের নামের মিল আমাদের চমকে দেয়) নামক এক মার্কিন যুবক, যে ইয়োরোপে এসে ধাঁধায় পড়ে যায়, অনেকটা এলিয়টেরই মতো। অনাত্মীয়তা ও শেকড়বিহীন শূন্যতার ভেতর, রুক্ষ পাথরের ভেতর অবশেষে তার কানে আসে জলের শব্দ! ফ্রান্সের ভিশী শহরে ভালেরি লারবোর ব্যক্তিগত সংগ্রহে এলিয়টের স্বহস্তে স্বাক্ষর করা তাঁর দুটি বই দেখে (এলিয়ট ফরাসিতে লিখেছেন: 'To Valery Larbaud, as a token of my admiration and esteem') আমি এলিয়টের ঋণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হই। পরে টি. এস. এলিয়টের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বইয়ের তালিকাতেও আমি লারবোর কাব্যগ্রন্থটি দেখেছি। ১৯২২ সালেই (যে বছর 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' প্রকাশিত হয়) 'ক্রাইটেরিয়ন'-এর প্রথম সংখ্যার জন্য লেখা চাওয়ার সময় একটি চিঠিতে এলিয়ট তাঁকে 'ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধা' বলে স্বীকার করলেও 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর দীর্ঘ উল্লেখপঞ্জিতে লারবোর কথা বলেননি!

এটা কি নিছক সমাপতন যে এলিয়টের প্রিয় ফরাসি কবিরা (বোদল্যের, করবিয়ের, লাফর্গ, লারবো) সকলেই এলিয়টেরই মতো যন্ত্রণা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে আধ্যাত্মিকতার পথে আলোর সন্ধান করেছিলেন? হয়তো সকলে সন্ধান পাননি, তবু। শুধু কাব্যিক প্রকরণের নানা চমকপ্রদ অভিনবত্বের দিক নয়, তাঁর জীবনদর্শনের বড় একটা দিকও কি তাঁদের কাছ থেকে ধার করা? জীবনদর্শন তো অভিজ্ঞতার জঠর থেকে উঠে আসে, তা তো কেউ শেখাতে পারে না! তবে ওই অসম্ভবকে কী করে সম্ভব করলেন এলিয়ট?

সব কৃত্রিমতা তাঁর কাব্যে মিলে গিয়েছিল অকৃত্রিমতার সঙ্গে। অন্যকে আত্মস্থ করতে করতে নিজেকে ক্রমাগত শিক্ষিত ও পরিবর্তিত করে তুলেছিলেন তিনি। কোনও একসময় ফাঁকিগুলি আর ফাঁকি থাকেনি। পল ক্লোদেলের (১৬৬৮-১৯৫৫) মহাকাব্যিক ধর্মোচ্চারণ অল্পবয়সী লাফর্গ-পন্থী এলিয়টের কাজে না লাগলেও বিশের দশকের শেষের দিকে ক্লোদেলীয় দীর্ঘ ও আলুলায়িত সাংগীতিক গদ্যই—যা ফরাসিতে verset বলে খ্যাত—হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান উপজীব্য। তাঁদের কবিতার দৃশ্যগত (visual) মিল দেখলে চমকে উঠতে হয়। এলিয়টবিশারদেরা যখন 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফোর কোয়ার্টেটস' এর নিজস্ব কণ্ঠস্বর সম্পর্কে নিঃসন্দেহ, সেইসময় অনিবার্যভাবে অন্য এক স্মৃতিজালে জড়িয়ে পড়েছেন কবি। ১৯৫৫ সালে ক্লোদেলের মৃত্যুর পর তিনি ফ্রান্সের 'ফিগারো' কাগজে লেখেন: 'The impression that (Claudel) made upon my mind at that time is still very dear in my memory.' ক্লোদেলের 'cherche le centre' ('look for the centre') ও এলিয়টের 'the still point'-এর ভেতর প্রায় কোনও পার্থক্য নেই, যদিও এই প্রাথমিক পর্যায়ের মিলটি ইংরেজি সাহিত্যের পণ্ডিতেরা ধরতে পারেননি। পরম উপলব্ধির মুহূর্তে এই দুই ক্যাথলিক কবির (এলিয়ট ১৯২৭ সালে অ্যাংলিকান চার্চের সদস্য হন) মিল এ-শতাব্দীর কবিতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ক্লোদেলের ভাষার প্রসিদ্ধ অনুসারক স্যাঁ-জন পের্সের প্রতি এলিয়টের আকর্ষণের কথাও আমরা জানি। এলিয়ট সারা জীবন একজন কবির কবিতাই অনুবাদ করেন: তিনি স্যাঁ-জন পের্স।

১৯৩৩ সালে জন্‌স্ হপকিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় টার্নবুল বক্তৃতায় এলিয়ট যখন বলেন যে তাঁর কাব্যে 'ফরাসি প্রভাব তো কমেই নি, বরঞ্চ বেড়েছে' তখন সে-কথার অর্থ বুঝতে পারেননি বা বোঝার চেষ্টাও করেননি কেউ। ফরাসি সাহিত্যে মূর্খ দু-একজন সমালোচক মালার্মের প্রভাব খুঁজেছেন! তাঁরা জানেন না যে স্তেফান মালার্মে ও এলিয়টের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে: মালার্মের কবিতার 'তাৎপর্যহীনতা' ও এলিয়টের তাৎপর্যমুখিতার মধ্যে কোনও মিল থাকার কথা নয়।

এলিয়টের প্রিয় সমালোচক রেমি দ্য গুরমঁ (তাঁর তাত্ত্বিকতার সিংহভাগ যাঁর থেকে আহৃত) লিখেছিলেন: 'এক ধরনের নির্দোষ প্লেজিয়ারিজ্‌ম্ আছে।... স্মৃতি এক গ্রন্থাগার, যেখানে কিছু জিনিস সুন্দর, কিছু হতশ্রী, কিছু মুছে যায়।... স্মৃতি যা অনুপ্রেরণা হয়ে ফিরে আসে'। (*Le problème du style*, ১৯০২, পৃ. ১৪২) অন্যত্র লিখেছেন: 'স্মৃতি এক গোপন স্নানপুকুর, যেখানে নিজেদের অজান্তে আমাদের অবচেতন এসে জাল ফেলে।' (*La culture des idées*, ১৯০০, পৃ. ৫১)।

এলিয়টের মতো স্থিরমস্তিষ্ক, সজাগ ব্যক্তির পক্ষে পুরোটাই যে অবচেতনের ব্যাপার তা অবশ্য কিছুতেই বিশ্বাস্য নয়। গুরমঁ-র লেখাতেই এলিয়ট শিখেছিলেন তাঁর শিল্পের গোপন কথাটি: '(লেখকের) অনুকরণ করার অধিকার আছে, বিষয় ও ভাবনাচিন্তা আত্মীকরণের অধিকার আছে।...

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ণেই, মলিয়ের, রাসিন, ভিক্তর য়্যুগো কেউ ধার জিনিসটাকে ঘৃণা করেননি। সঠিক পথ খুঁজে পাওয়ার আগে বালজাক ইংরেজি উপন্যাসের নকল করেছেন। আলেকসাঁদ্র দ্যুমা আবার এক কাঠি বাড়া: তাঁর প্রথম নাটকগুলি এখান ওখান থেকে জুড়ে জুড়ে অসাধারণ দক্ষতায় নির্মাণ করা হয়েছিল।' (*Le problème du style*, পৃ. ৩০৬) তাঁর প্রবন্ধে ক্রিস্টোফার মার্লো থেকে শেক্সপীয়ারের পংক্তি চুরি কিংবা মঁতেঞ থেকে পাসকালের আইডিয়া 'lift' (এলিয়টের শব্দ, *Essays Ancient and Modern*, ১৯৩৬, ১৯৪৭ সং, পৃ. ১৫০) করাকে প্রায় উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করেছেন।

এসব কি সান্ত্বনা এলিয়টের? নাকি এটা তাঁর স্বঘোষিত কর্মসূচি? তিনিই তো বলেছেন, 'অপরিণত কবিরা নকল করে, পরিণতরা চুরি।' তবে তাঁর সৃষ্টির কী মূল্যায়ন করব আমরা? বচনের অন্তর্বয়নের এক অনবদ্য উদাহরণ হিসেবে তাঁর টেক্সটকে পড়ব? নাকি তাঁকে অভিহিত করব এক নিপুণ সাহিত্যিক ক্লেপটোমেনিয়াক হিসেবে, যাঁর 'virtues were imposed upon him by his impudent crimes'? এককালের বন্ধু রিচার্ড অ্যালডিংটনের অনুসরণ করে বলব 'এলিয়টের লেখায় যা কিছু ভাল তা তাঁর নিজস্ব নয়!'

অথবা এক অমোঘ 'pattern in the carpet'-এর সামনে দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে যাব?

আসলে, তাঁর রচনাপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতা সম্পর্কে কিছু মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন এলিয়ট। সেগুলিকে অগ্রাহ্য করলে তাঁর সৃষ্টিকর্মের মূল ভিত্তিটাই ধসে যায়। আর ফরাসি কবিতার প্রতি তাঁর ঋণকে অস্বীকার করলে, যেমন ইংরেজির পণ্ডিতেরা করে থাকেন, ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতিও সুবিচার করা হয় না।

১৯৯৮

লা রোশফুকোর মাক্সিম

১৬৬০ সাল। ইংলন্ডে রিস্টোরেশন অর্থাৎ রাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। চুয়াল্লিশ বছর আগে মারা গেছেন উইলিয়াম শেক্সপীয়ার। দু' বছর আগে ক্রমওয়েল। এক ইংরেজ ছোকরা আঠেরোয় পা দিলেন, যাঁর নাম আইজ্যাক নিউটন। জন মিলটন নামে এক ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে 'দ্য রেডি অ্যান্ড ইজি ওয়ে টু এসট্যাবলিশ এ ফ্রি কমনওয়েলথ' নামে এক পুস্তিকা লিখে জেলে যান; সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি শেষ করছেন নতুন যুগের মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট'। সদ্য নতুন করে খোলা থিয়েটারের জন্য জন ড্রাইডেন লিখছেন একটির পর একটি নতুন নাটক। এদিকে অনতিদূরে হল্যান্ডে বসে বেনেডিক্ট স্পিনোজা নামে পোর্তুগিজ উৎসের এক ইহুদি লিখছেন চিন্তার স্বাধীনতার পক্ষে এক মহাগ্রন্থ: 'ট্র্যাকটেটাস থিওলজিকো-পলিটিকাস'।

আর প্যারিসে? সেখানে স্যেন নদীর ধারে তৈরি হচ্ছে প্যারিসের প্রথম কাফেগুলি। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি মঞ্চস্থ করছেন সে দেশের সর্বকালের সেরা তিন জীবনদ্রষ্টা: মলিয়ের, রাসিন ও কর্ণেই। মানবাবস্থার দুর্দশা ও একাকিত্বকে অনুধাবন করতে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন এক গণিতজ্ঞ, যাঁর নাম ব্লেজ পাসকাল। করলেন না একজন, সাহিত্যজগতে এক বহিরাগত: লা রোশফুকো। মানুষের দিকে তাকিয়ে, শুধু মানুষকে নিয়েই রচিত হল অভূতপূর্ব এক বই।

লা রোশফুকোর 'মাক্সিম'গুলি পড়তে গিয়ে একুশ শতকের মানুষকে যা স্তম্ভিত করে দেয় তা হল এগুলির অমোঘ আধুনিকতা। সময়ের ঢেউকে অতিক্রম করে আবহমান মানুষের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য এ এক যন্ত্রণাক্ত, নির্জন তপশ্চর্যা, যার মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা আজ প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরেও এতটুকু কমেনি। এত তীব্র মনঃসংযোগ দিয়ে, অথচ এরকম নিরাবেগ স্বচ্ছতায়, এই কাজ বিশ্বসাহিত্য ইতিহাসে আর খুব বেশি কেউ করে যেতে পেরেছেন কি না সন্দেহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভলতের চিরদিনই বিশ্বাস করতেন 'ছোট ছোট কুড়ি পয়সার বই' দিয়ে বিপ্লব ঘটানো যায়। 'মাক্সিম' ছিল সেই বৈপ্লবিক বই। তিনি লিখেছিলেন, 'এক নিশ্বাসে বইটি পড়ে ফেললাম। তিনি অভ্যাস করালেন চিন্তা করতে, এবং ভাবনাচিন্তাগুলিতে এক সজীব, সুষম ও সংক্ষিপ্ত বাগ্‌বন্ধে ধরে রাখতে। এই গুণ ইয়োরোপের রেনেসাঁসের পর তাঁর আগে আর কারওর ছিল না।' এই চটি বইটির মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সেই শিল্পগুণ যা ফ্রান্সের রুচি তৈরিতে সাহায্য করেছে, ফরাসি মনকে শিখিয়েছে পরিমিতি ও যাথার্থ্য।

১৬৬৫ সালে 'মাক্সিম'-এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লা রোশফুকো লিখেছিলেন, 'এ হল মনুষ্যহৃদয়ের এক আলেখ্য। এগুলি সবাইকে খুশি করবে না জানি, কারণ এগুলি বড় বেশি বাস্তব, এগুলি তত তোষামুদে নয়।' আমরা অনুমান করতে পারি গ্রন্থটি তৎকালীন পাঠককে কতখানি হতচকিত করে দিয়েছিল। লা রোশফুকোর বান্ধবী ও ফরাসিতে প্রথম ঔপন্যাসিক চিন্তা করা মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ স্পতঃস্ফূর্তভাবে মাদাম দ্য সাব্‌লেকে লিখেছিলেন, 'কতখানি নীচ হলে এ-সমস্ত জিনিস মাথায় আসতে পারে!' ত্রয়োদশ লুই-এর ভূতপূর্ব প্রেমিকা মাদমোয়াজেল দ্য ওতফর নাকি বলে ওঠেন, 'বই পড়ে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে পাপপুণ্য বলে কিছু নেই!' তাঁর বিখ্যাত সমসাময়িক লা ফঁতেনের মতে, এই মাক্সিমগুলি যেন 'মনুষ্যচরিত্রের এক অস্বস্তিকর আয়না, যার থেকে দূরে থাকা যায় না।' লা রোশফুকোকে উৎসর্গীকৃত একটি কবিতায় ('খরগোশ', *Fables X*, ১৬৭৯) লা ফঁতেন স্বীকার করেন যে তিনি তাঁকে নীতিগুলো লেখার মালমশলা সরবরাহ করেছেন। সতীর্থ লা ব্রুইয়ের—যাঁর ১৬৮৮ সালে প্রকাশিত *Les Caractères* মাক্সিমের কথা মনে পড়ায়—লা রোশফুকোর গ্রন্থের ধার ও ঝাঁঝের কথা আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। এক শতাব্দী পরে, রুসো তাঁর *La Nouvelle Héloise*-এ জ্যুলিকে লেখা একটি চিঠিতে ২০৬ নং মাক্সিম ('বাড়াবাড়ি রকমের ভালবাসার চেয়ে লোকে ঘৃণাও বেশি পছন্দ করে') উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'এই দুঃখের বইটির আস্বাদ ভাল মানুষেরা পেল না।' আর ফ্রান্সের বাইরে? অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ কবি আলেকজান্ডার পোপ এগুলিকে 'witty lies' বলে গালাগালি দিলেও তাঁর *Essay on Man*-এ লা রোশফুকোর উক্তি ব্যবহার না করে পারেননি। শোনা যায়, তাঁর ছাত্রদের কাছে লা রোশফুকোর বই থেকে উদ্ধৃতি দিতেন এমানুয়েল কান্ট, গ্যোয়েটের সংগ্রহে মাক্সিম ছিল (মাক্স হোরের ধারণা, সেই কারণেই

'মাক্সিম' শব্দটি তাঁর অন্যতম প্রিয় শব্দে পরিণত হয়), শোপেনহাওয়ার লা রোশফুকোর মন্তব্যগুলিকে—তাঁর ভাষায় 'Bemerkungen'—'আধুনিকতম' বলে অভিহিত করেন। আর নীৎসে মনে করেছেন লা রোশফুকো হলেন মনোবিশ্লেষণের সেই গুরু যিনি অন্ধকারেও লক্ষ্যভেদ করতে পারেন। গোড়ায় আঁদ্রে জিদের আত্মাভিমান-সম্পর্কিত উক্তিগুলি ভাল লাগেনি। পরে অবশ্য তিনি মত বদলান। কিন্তু তাঁরও মনে হয়েছিল, 'মন্তব্যগুলি আমাদের একটুও শান্তি দেয় না।' তাঁর *Les Faux-Monnayeurs* উপন্যাসের এদুয়ারের মতো জিদও বেড়াতে গেলে এক কপি মাক্সিম সঙ্গে রাখতেন। লা রোশফুকো ফ্রান্সের আধুনিক সমালোচক ও তাত্ত্বিকদের মধ্যেও রলাঁ বার্ত থেকে শুরু করে জাঁ স্ত্রারোবিনস্কি পর্যন্ত কাউকে সুস্থির থাকতে দেননি।

বোঝা যায়, সমকালীনদের যা প্রবল অস্বস্তিতে ফেলেছিল তা হল মানুষ ও তার সমাজ সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টি। কর্ণেই-এর ট্র্যাজেডি সতেরো শতকে মানুষের যে আদর্শ মূর্তি তৈরি করতে পেরেছিল, তরুণ রাজার উজ্জ্বল গরিমা যাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল, মুহূর্তের মধ্যে তা বেদি থেকে ভেঙে পড়ল। একজন রাজপুরুষের পক্ষে এটা এক অভাবনীয় বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করা হয়েছিল।

আর রাজপুরুষটি? পনেরো বছর বয়স থেকে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যভিচার আর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা মানুষটি তখন হতাশ, ক্লান্ত, বিষণ্ণ, কম কথা বলেন, হঠাৎ হঠাৎ দার্শনিক বাক্য ছুঁড়ে মারেন। ক্রমশ বার্ধক্য, পঙ্গুতা, দৃষ্টিহীনতা ও পুত্রশোক তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রেমে ও জীবনযুদ্ধে বারবার পরাজিত মানুষটি তখন ভীষণ তিক্ত। অথচ সেই তিক্ততার ঝাঁঝ তাঁর মন্তব্যগুলিকে দিয়েছে এমন এক গভীর সত্যমূল্য, যা সেগুলির সাফল্যের এক প্রধান কারণ। এ প্রসঙ্গে মতেঞের সঙ্গে তাঁর মিলের কথা উল্লেখ করা দরকার। দু'জনেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, সমান নির্ভীকভাবে মানবাবস্থার ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাসে লা রোশফুকোর খ্যাতি দার্শনিক হিসেবে নয়, 'মরালিস্ত' (moraliste) হিসেবে। 'মরালিস্ত' শব্দটির ফরাসি ব্যুৎপত্তি মানবাবস্থা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলির তাৎপর্যকে স্বভাবতই কিছুটা সীমাবদ্ধ করে দেয়। মরালিস্ত অর্থে নীতিবাগীশ, moralisateur নয়, নীতিগ্রন্থ হলে সম্ভবত আজ আর এ বই কেউ খুলে দেখত না। কিন্তু এ তো একেবারেই তা

নয়। এগুলিকে বরঞ্চ উপলব্ধি বা প্রস্তাব বললে ঠিক হয়। সতেরো শতকের মরালিস্তরা কেউই বর্তমান অর্থে নীতিবিশারদ পণ্ডিতমশায় ছিলেন না, বরং তাঁদের সমাজতাত্ত্বিক মনস্তত্ত্ববিদ বলা চলতে পারে। আকাদেমির অভিধানের *(Dictionnaire de l'Académie)* প্রথম সংস্করণে morale শব্দটির ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছিল: 'স্বাভাবিক অথবা অর্জিত অভ্যাস, প্রবৃত্তি, রীতি, প্রথা, ধাত, ঝোঁক, জীবনযাত্রার ধরন', যা অবশ্যই 'বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের।' অর্থাৎ একজন মরালিস্ত কোনও নৈতিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান না, তিনি শুধু মানুষকে, মানুষের প্রকৃতিকে 'অধ্যয়ন' করতে চান (লা রোশফুকোর একটি মাক্সিমে পরিষ্কার বলা আছে 'বই-এর চেয়ে মানুষকে পাঠ করা অনেক বেশি জরুরি')। অবশ্য, প্রসঙ্গক্রমে নৈতিকতার কথা এসেই পড়তে পারে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ মূলত অ-ধার্মিক, নন্‌মেটাফিজিকাল। ফলে, শেষপর্যন্ত, দার্শনিকতার প্রচলিত ধারণা থেকে স্বতন্ত্র এক অভিক্ষেপ তৈরি হয়। এটি ফরাসি ক্লাসিসিজমের একটি বিশেষ দিক। আমরা লক্ষ করি যে, ফ্রান্সে তখন দুটি ধারাই পাশাপাশি বহমান: একদিকে পাসকাল বা বস্যুয়ের মতো ধর্মবিশেষজ্ঞ দার্শনিক, অন্যদিকে মলিয়ের বা রাসিনের নাটক, মাদাম দ্য লাফাইয়েতের উপন্যাস *La Princesse de Clèves* বা লা ফঁতেনের *Fables*, যা শুধুমাত্র মানুষ ও তার সমাজের কথাই বলে, কোনও অধ্যাত্মবাদের চিহ্নও সেখানে নেই। হয়তো এই কারণেই কোনও কোনও ভাষ্যকার লা রোশফুকোকে 'প্রথম ক্লাসিক মনস্তাত্ত্বিক' (Premier psychologue classique) বলে অভিহিত করেছেন।

কারও কারও মতে, ম্যাকিয়াভেলি-কথিত virtu ও লা রোশফুকো-প্রশংসিত সদ্‌গুণের মধ্যে মিল আছে। মানব-প্রকৃতির ক্ষমতালিপ্সা ও অর্থলোলুপতার পাশাপাশি মিথ্যা ও প্রতারণাকে তার মজ্জাগত চারিত্র্য হিসেবে মেনে নিয়ে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রের স্বার্থ অনুযায়ী নৈতিক বচনকে পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এক বিপজ্জনক পৃথিবীতে সফল হওয়ার রাস্তা বাতলানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও লা রোশফুকোকে চাণক্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন ('মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত')। কিন্তু বঙ্কিমের এই ভ্রান্ত পাঠকে গ্রহণ করলে মাক্সিমের মূল ভিত্তিকেই অস্বীকার করা হয়। মানবজাতিকে বিশ্বাস করে ঠকেছিলেন বলে লা রোশফুকো চেয়েছিলেন মানুষের মুখোশ খুলে দিতে, যা কিছু আপাতদৃশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলতে, যুক্তি ও নীতির আড়ালে গূঢ় কারণগুলির ওপর আলোকপাত করতে। তিনি যেন এক সদা-অবিশ্বাসী demystificateur, মানুষের প্রকৃত সত্তা ও কৃত্রিম মুখচ্ছবির স্ববিরোধকে উদ্ঘাটন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শুধু কর্ণেই-কর্তিত নায়ক নয়, সপ্তদশ শতকের সভা-চাটুকার থেকে শুরু করে সামাজিকভাবে কব্জে পাওয়া মহৎ ব্যক্তিটির পর্যন্ত চিন্তাপদ্ধতিকে বিনির্মাণ করে লা রোশফুকো এক আপসহীন জীবনবাদিতার উদাহরণ রেখে গেছেন।

কেউ কেউ অবশ্য এমনও মনে করেন যে, পাসকাল ও অন্যান্য খ্রিস্টীয় চিন্তানায়কদের সঙ্গে তাঁর মিল এখানেই যে তিনিও মানুষের দুর্বলতা ও নিদারুণ দুর্দশার (পাসকালের ভাষায়, 'কী হেঁয়ালিময় অসারত্বের সমবায় মানুষ!') কথা বলেছেন, যা নাকি মানুষের ঈশ্বর-নির্ভরতাকে অনিবার্য করে তোলে। ফলে ফরাসি 'মরালিস্ত' শব্দটি তার আধুনিক ইংরেজি প্রতিশব্দের কাছাকাছি চলে আসতে পারে। সমালোচক এমঁ-র মতে, 'পাসকাল আমাদের বিষণ্ণ করেন, বিদ্রোহী করে তোলেন, কিন্তু নিরাশ করেন না... কারণ ওষুধ তো তাঁর হাতের কাছেই আছে, তিনি তা দেবেন। লা রোশফুকোর ক্রোধ তাঁর চেয়ে কিছুটা কম, কিন্তু বিদ্বেষ আরও বেশি। তিনি অভিযোগ করেন, ধিক্কার দেন; নাছোড়বান্দার মতো নিষ্ঠুরভাবে আমাদের সার্বজনীন দুর্দশাকে নগ্ন করে তোলেন।' রবের কাঁতেরসের মতো বিশেষজ্ঞেরা তাঁদের দুটি ভিন্ন প্রজাতির লোক বলে মনে করলেও অন্তত একজন সমালোচক এলিফাস ল্যভি তো পাসকাল ও লা রোশফুকোকে একই অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। আবার অনেকের মতে, তাঁর ওপর এপিকিউরিয়ানিজ্‌ম, অগাস্টিয়ানিজ্‌ম ও জানসেনিজ্‌মের প্রভাব থাকতে পারে। ১৬৬৫ সালে *Journal des Savants*-এ লা রোশফুকোর বান্ধবী জানসেনাইট মাদাম দ্য সাব্‌লে লিখেছিলেন, এই অত্যন্ত 'কাজের' (fort utile) বইটি নাকি প্রমাণ করে খ্রিস্টধর্ম ছাড়া জগতের ভাল হওয়া সম্ভব নয়।

মোট কথা, লা রোশফুকোর চিন্তাধারার ওপর ধার্মিকতা আরোপ করার একটা চেষ্টা প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু এই ধার্মিকতার কোনও বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা লক্ষ করছি, ১৬৭৮ সালে প্রকাশিত তাঁর জীবিতাবস্থার শেষ সংস্করণে একবারও কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ লা রোশফুকো ঈশ্বরকে অস্বীকার করেননি, তিনি তাঁকে বেমালুম বাদ

দিয়েছেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে পাঁচ-ছ জায়গায় আদিম পাপ ও ঈশ্বরের ভূমিকার উল্লেখ থাকলেও তিনি সেগুলিকে শেষ পর্যন্ত বর্জন করেন। তাঁর প্রতিটি সংস্করণে এক সচেতন laïcisation (ভাষ্যকার পল বেনিশু-র উক্তি) বা ধর্মনিরপেক্ষীকরণের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। যেন তিনি জোর করে ধর্মের সমস্ত সম্ভাব্য অনুষঙ্গ মুছে ফেলতে চান। সম্ভবত তিনি দার্শনিক বা ধার্মিক জটিলতা এনে ফেলে মানবচরিত্রের বিশ্লেষণকে ঘোলাটে করে তুলতে চাননি। হয়তো এই বিধ্বস্ত ও তিক্ত মানুষটি তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস হারিয়েছিলেন। অন্তত এই একটি বৈশিষ্ট্যই তাঁকে অনায়াসে আমাদের সমকালীন করে তোলে।

১৬১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসে এক সুপ্রাচীন পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রথমে তাঁর উপাধি ছিল 'মারসিয়াকের রাজকুমার' (le prince de Marcillac)। ১৬৫০ সালে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর তিনি লা রোশফুকোর ডিউকের উপাধি পান। পনেরো বছর বয়সে আঁদ্রে দ্য ভিভনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আটটি সন্তানের জন্ম দিলেও এই নারী লা রোশফুকোর জীবনে তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। তিরিশের দশকে রাজসভার কুটিল পরিবেশে অনুপ্রবেশ। একদিকে লাজুক, চিন্তামগ্ন, হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়; অন্যদিকে ষড়যন্ত্রপ্রিয়, উচ্চাভিলাষী। কার্দিনাল রিশলিউর মতো প্রভাবশালী ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই ছিলেন দুর্বলদের দলে। তা সত্ত্বেও রাজার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাকে ইতালি ও হল্যান্ডে যেতে হয় (১৬৩৫-৩৬)। ত্রয়োদশ লুই-এর রাজসভার ঘূর্ণাবর্তে তিনি স্বভাবতই লাঞ্ছিত রানি আন্ দোত্রিশের অনুগত ছিলেন। ১৬৩৭ সালে নাকি তিনি তাঁকে নিয়ে ব্রাসেল্‌সে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। রাজসভায় বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের জন্য তিনি প্রথমে বাস্তিইতে কারারুদ্ধ ও পরে ভের্তই-তে নিজের দুর্গে নির্বাসিত হন। ১৬৪২ সালে কার্দিনাল ও ৪৩-এ রাজার মৃত্যুর পর অবস্থার আরও অবনতি হয়। নতুন মন্ত্রী মাজার‍্যাঁ ছিলেন নীচ ও চতুর। তাঁর আমলে যে গৃহযুদ্ধ বাধে (১৬৪৮-৫৩) তা লা ফ্রঁদ (la Fronde) নামে পরিচিত। লা রোশফুকো তাতেও জড়িয়ে পড়েন। পাশাপাশি চলতে থাকে দ্যুশেস দ্য লঁগভিলের সঙ্গে দুরন্ত প্রেম ও মাজার‍্যাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। শেষ পর্যন্ত, পশ্চিম ফ্রান্সের ভের্তই-এ তাঁর প্রাসাদে লুঠতরাজ করা

হয়, রাজার সৈন্যরা তাঁর বাড়িটি প্রায় ধ্বংস করে ফেলে। ১৬৫২ সালে যুদ্ধ করতে করতে লা রোশফুকো আহত হন এবং তাঁকে লুকসাঁবুরে পালিয়ে যেতে হয়। পরের বছর ভের্তই-তে ফিরে গেলেও আহত, পর্যুদস্ত, কারারুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় ত্রস্ত লা রোশফুকো ১৬৫৬ সালের আগে প্যারিসে ফিরে আসতে পারেননি।

কয়েক বছরের মধ্যে আশাহত, অবসন্ন ও শারীরিকভাবে খর্ব মানুষটি বুঝতে পেরেছিলেন সামরিক গরিমা এক বিভ্রান্তি, রাজনীতি ফন্দিবাজদের খোঁয়াড়, ধর্ম কাপট্য বা পলায়ন, প্রেম মানে প্রতারণা এবং মানুষের ব্যবহারের আড়ালে তার আত্মাভিমান। এই তিক্ত সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন গুরভিল নামে এক বন্ধু। সম্ভবত এই কারণেই তিনি বন্ধুত্বের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা হারাননি। এইসময় প্রকাশিত (১৬৫৯) একটি আত্মপ্রতিকৃতি তাঁর মনকে বুঝতে অনেকটা সাহায্য করে। তিনি লিখেছেন: 'আমার ধীশক্তি আছে, সেকথা বলতে দ্বিধাবোধ করি না, খামোকা বিনয় করে কী হবে!... সুতরাং আবার বলি, আমার ধীশক্তি আছে, কিন্তু মনে ছেয়ে থাকে বিষণ্ণতা। কারণ যদিও আমি ভাষাটা ভালই আয়ত্ত করেছি, স্মৃতিশক্তিও মোটামুটি প্রখর, চিন্তাও খুব অগোছালো নয়, আমার গভীর বিষণ্ণতার জন্য প্রায়ই যা বলতে চাই বলা হয়ে ওঠে না।' তিনি জানিয়েছেন তাঁর প্রিয় জিনিস ছিল বই পড়া ও বিশেষ করে বুদ্ধিমান লোকেদের তা পড়ে শোনানো, কারণ 'তা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করে।' বুদ্ধিমান লোকেদের সঙ্গে কথোপকথন তাঁকে গভীর আনন্দ দিত। লা রোশফুকো দুঃখ করেছেন যে তিনি যে কোনও ব্যাপারে খোলাখুলি মতামত দিতে ভালবাসতেন। নিজের অভিমতকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে, প্রতিপক্ষের অবিচারের বিরুদ্ধে যুক্তির সপক্ষে প্রচণ্ডভাবে লড়াই করতে গিয়ে মাঝে মাঝে তিনি নিজেই যুক্তিহীন হয়ে পড়েছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে। তিনি লিখেছেন, তাঁর উচ্চাশা ছিল না, রাগ বা ঘৃণা পোষণ করতেন না, যদিও কেউ অপমান করলে প্রতিশোধ নিতেও মোটেই অরাজী ছিলেন না। কোনও কিছুকেই ভয় পেতেন না, মৃত্যুকেও নয়। সহানুভূতি পছন্দ করতেন না। নিজের ক্ষতি করেও বন্ধুদের ভালবাসতেন। তাদের 'নিকৃষ্ট রসিকতা' ধৈর্য ধরে সহ্য করতেন ও সহজে ক্ষমা করতেন, কিন্তু কিছুতেই আদিখ্যেতা করতেন না বা তাদের অনুপস্থিতিতে দুঃখ পেতেন না। মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা এইরকম:

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি মেয়েদের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করি, এমন কিছু বলি না যাতে তারা কষ্ট পায়। বুদ্ধিমতী মেয়েদের কথাবার্তা আমি পুরুষদের চেয়ে বেশি পছন্দ করি, তাদের মধ্যে এমন একটা নম্রতা রয়েছে যা পুরুষদের থাকে না। আর এ ছাড়াও আমার মনে হয়েছে মেয়েরা আরও পরিষ্কার করে বিষয়টা বোঝাতে পারে, আরও চমৎকারভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে।... প্রেমিক? তা এককালে একটু ছিলাম বটে, কিন্তু এখন আর তা নই, যতই কম আমার বয়স হোক (ওইসময় তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায়)। পুষ্প-নিবেদন আমি ছেড়ে দিয়েছি। দেখে অবাক লাগে যে এত বেশি সংখ্যক লোক আজও এই কাজে লিপ্ত! তবে আমি তাদের এই সুন্দর আবেগকে প্রবলভাবে সমর্থন করি, ওটা বড় মনের পরিচয়, আর যত উদ্বেগই এর থেকে আসুক না কেন, এতে এমন কিছু আছে যা সহজেই সদ্‌গুণের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, যাকে নিন্দে করা আমার মতে উচিত হবে না। প্রেমের মহৎ ভাবাবেগের মধ্যে যা কিছু সূক্ষ্ম আর শক্তিশালী তাকে চিনেছি আমি, কিন্তু আমি যে ধরনের মানুষ, মনে হয় না এই জ্ঞান কখনও আমায় যুক্তি থেকে সরে যেতে দেবে।'

তাঁর সমসাময়িক কার্দিনাল দ্য রেৎসের মতে, লা রোশফুকোর মধ্যে 'কী যেন একটা ব্যাপার ছিল।' 'তিনি কোনও কিছুই করে উঠতে পারতেন না... সৈনিক হয়েও সৈনিক ছিলেন না, সভাসদ হয়েও সভাসদ নন।' কার্দিনাল দ্য রেৎস তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত স্বভাবের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার কারণ বুঝতে পারেননি। সম্ভবত তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও গভীরতাকে উপলব্ধি করা রেৎসের ক্ষমতার অতীত ছিল।

চরম নৈরাশ্যের মুহূর্তে কর্মহীনতা, উদ্বেগ আর অসুস্থতাকে ভুলতে লা রোশফুকো প্রথমে তাঁর স্মৃতিকথা (*Mémoires*, ১৬৬২ সালে ব্রাসেল্‌সে গুপ্তভাবে প্রকাশিত) ও পরে মাক্সিমগুলি লিখতে শুরু করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'মাক্সিম' বলতে বোঝাত মানবচরিত্র সম্পর্কে একধরনের অতি সংক্ষিপ্ত, স্বচ্ছ, সুসংবদ্ধ প্রবাদপ্রতিম বাক্য—যার বৈশিষ্ট্য ছিল তার আকর্ষণীয় ও স্মরণীয় শব্দবিন্যাস। এটি ছিল তৎকালীন শিক্ষিত অভিজাত সমাজের এক প্রিয় অবসর-বিনোদন; ফরাসি সালোঁগুলিতে তা যৌথভাবে নির্মিত ও পরিমার্জিত হত। মনে হয়, প্রথমদিকে মাক্সিম রচনার ব্যাপারটি ছিল শুধুই এক খেলা, যাতে লা রোশফুকোর সঙ্গী ছিলেন মার্কিজ দ্য সাব্‌লে ও জাক এস্‌প্রি। এঁরা মাদাম দ্য সাব্‌লের বাড়ির বৈঠকে মিলিত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-বিষয়ে আলোচনা করতেন। অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের মতামতও নেওয়া হত। নির্মীয়মাণ মাক্সিমগুলির কথা বলতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময় 'আমাদের বই' (notre volume) বলে উল্লেখ করতেন। সুতরাং, ধরে নিতে হবে লা রোশফুকোর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থের উপর এঁদের দু'জনের প্রভাব কম নয়। কিছুদিনের মধ্যে পাণ্ডুলিপিটির বেশ কয়েকটি নকল বেরিয়ে যায়। ১৬৬৪ সালের গোড়ায় হল্যান্ডে অসংখ্য ছাপার ভুলসহ একটি বেআইনি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। অবশ্য মারত্যাঁ-শোফিয়ে ও জাঁ মাশাঁর মতো পণ্ডিতেরা মনে করেছেন যে এতে লেখকের হাত থাকা অসম্ভব নয় : তিনি হয়তো পাঠকদের প্রতিক্রিয়া যাচাই করে দেখতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, লা রোশফুকো শেষ পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে বইটি প্রকাশ করার কথা ভাবেন। ওই বছরই ২৭ অক্টোবর বইটি ছাপা শেষ হয়, কিন্তু বইতে তারিখ দেওয়া হয় ১৬৬৫।

প্রথম সংস্করণে ৩৭১টি মাক্সিম সংকলিত হয়। পরে প্রতিটি সংস্করণে নতুন উক্তি যোগ করা হয়। বইটির আরও চারটি সংস্করণ হয় ১৬৬৬, ১৬৭১, ১৬৭৫ ও ১৬৭৮ সালে। ৫০৪টি মাক্সিম সংবলিত পঞ্চম সংস্করণটিই তাঁর জীবিতাবস্থায় শেষ সংস্করণ, কাজেই এটিকেই প্রামাণ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রায় প্রত্যেকবারই কিছু কিছু উক্তি বর্জিত হয় (দ্বিতীয় সংস্করণে ষাটটি, তৃতীয় সংস্করণে একটি, চতুর্থ সংস্করণে বারোটি, মোট তিয়াত্তরটি)। তাঁর মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকে আরও কিছু উক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

আকাদেমি ফ্রাঁসেজের সদস্য (১৬৬২) ও মাদাম দ্য লাফাইয়েতের বন্ধু জাঁ-রেন্যো সেগ্রের মতে লা রোশফুকো নাকি কিছু কিছু মাক্সিম তিরিশবারের বেশি ঘষামাজা করেন। সম্ভবত মাদাম দ্য লাফাইয়েতের প্রভাবে তাঁর তিক্ত চড়া সুর কিছুটা নরম হয়। বহু জায়গায় presque, le plus souvent, la plupart, d'ordinaire (প্রায়, প্রায়শ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, সাধারণত) প্রভৃতি যোগ করা হয়। বর্জিত উক্তিগুলি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় কিছু কিছু অভিমত তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, নাকচ করেছেন প্রধানত সেইসব মাক্সিম যা অস্পষ্ট বা প্রগল্‌ভ। আসলে, যে-কথা আমরা শুরুতেই বলেছি, সর্বদাই তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বচ্ছতা, গভীরতা ও সংক্ষিপ্ততা। তাঁর অনবদ্য ভাষা ফরাসি গদ্যের একটি প্রধান ধারাকে সূচিত করে। উক্তিগুলির শরীরী অস্তিত্বকে অনেক সময়ই তার ধ্বনি ও তাৎপর্য থেকে আলাদা করা যায় না। তাঁর নিপুণ

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দযোজনা দেখে কখনও বা এমনও মনে হতে পারে যে শব্দের সহাবস্থানই তাদের বিচ্ছুরিত দ্যোতনাকে সম্ভব করে তুলেছে।

এই গ্রন্থের কোনও সামগ্রিক বিন্যাসক্রম নেই। লা রোশফুকোর মুখবন্ধ (Avis au lecteur) থেকে মনে হয় তিনি ধারাবাহিকতার অভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, অথচ চারটি নতুন সংস্করণেও এগুলিকে বিষয় অনুসারে সাজাননি। ফলে উক্তিগুলিকে মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খল ঠেকতে পারে। যেমন এক জায়গায় দেখা যাবে 'আশা' সম্পর্কিত দুটি মাক্সিমের মধ্যে সাঁইত্রিশটি মাক্সিমের ফারাক। তবু এই ধ্রুপদী বিন্যাসকে অনুসরণ করাই সাধারণ রীতি। স্বয়ং শোপেনহাওয়ারের মতে, এলোমেলোভাবে সাজানো বলেই বইটিতে এতখানি সংযম ও তন্নিষ্ঠতা এসেছে। হয়তো এভাবে সাজিয়ে লেখক একঘেয়েমি দূর করতে চেয়েছেন।

মন্তব্যগুলির গভীরতা সর্বত্র সমান নয়। মহিলা-সম্পর্কিত কিছু উক্তিতে এক ধরনের তির্যক চটুলতা রয়েছে বলে মনে হতে পারে। সম্ভবত তৎকালীন ফরাসি অভিজাত সমাজে মেয়েদের জীবনধারা সম্পর্কে বিরক্তই এর কারণ। কখনও কোনও জিনিসকে (যেমন সততা, l'honnêteté) ব্যবহারিক দিক থেকে দেখা হয়েছে, কখনও বা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ফলে শেষ পর্যন্ত সেখানে যুক্ত হয়েছে এক জটিল বহুমাত্রিকতা।

ন্যাকামি, কাপট্য, নীচতা, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা ও চাতুরিকে অক্লান্তভাবে আক্রমণ করেছেন। আত্মাভিমান ও আত্মম্ভরিতাকে মনোবিজ্ঞানীর মতো ধৈর্য ও যত্নে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রেম ও বন্ধুত্বকে প্রবল আঘাত হেনেছেন ('সত্যিকারের প্রেমের সঙ্গে ভূতের খুব মিল আছে; সকলেই ও-দুটোর কথা বলে, কিন্তু প্রায় কেউ দেখেনি' বা 'যার প্রেম আগে সেরেছে সেই বেশি সুস্থ' কিংবা 'বন্ধুত্ব জিনিসটা এক ধরনের ব্যবসা', বা 'বেশিরভাগ বন্ধুই বন্ধুত্বে ক্লান্ত') কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ দুটির মাহাত্ম্য অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করতেও তাঁর বাধেনি। 'সত্যিকারের প্রেম এক রকমেরই হয়, যদিও তার হাজার রকমের নকল রয়েছে।' আর বন্ধুত্ব? 'সত্যিকারের প্রেম দুর্লভ, কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুত্বের চেয়ে নয়।' আন্তরিকতাসম্পন্ন 'ভদ্রলোক' (un honnête homme)-দের সম্পর্কে তাঁর আস্থা কখনও টলেনি।

লা রোশফুকোর দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে কখনও কখনও যে তাঁর সিনিসিজ্‌ম্ আমাদের ত্রস্ত করে একথা ঠিক। ('আমাদের সবচেয়ে ভাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজগুলির জন্য আমরা কম লজ্জা পেতাম না যদি লোকে জানতে পারত আসলে কী উদ্দেশ্যে আমরা সেগুলি করেছি' অথবা 'কারুর চরিত্রে হাস্যকর কিছু না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে যথেষ্ট ভাল করে খোঁজা হয়নি।') কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের মনে পড়ে যায় পাঠকের কাছে লা রোশফুকো কেবল একটি জিনিসই প্রার্থনা করেছিলেন: বিশ্বাস, কারণ তিনি জানতেন মানুষ 'আবিষ্কৃত হতে ভয় পায়'।

মাক্সিমের প্রথম সংস্করণের মলাটে ছিল এক ডানাওয়ালা মূর্তির ছবি, যার বীজমন্ত্র ছিল 'সত্যানুরাগ' (Amour de la vérité') যা এই অসাধারণ গ্রন্থের সারাৎসার। একাধারে অতিমাত্রায় সামাজিক অথচ নিঃসঙ্গ এই জীবনদ্রষ্টার স্পষ্টভাষিতা নির্মম হলেও স্বাস্থ্যকর। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, সমস্ত নৈরাশ্য ও সিনিসিজ্‌ম্‌কে ছাপিয়ে ওঠে এক অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ত সংবেদনশীল সহৃদয় মানুষ।

স্যাঁৎ-বভের কথা উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'যতই আমরা জীবনের পথে এগোই, সমাজ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়ে, ততই আমরা বুঝতে পারি তিনি কতখানি নির্ভুল।'

পাঠকের জন্য আমরা কয়েকটি মাক্সিম অনুবাদ করে দিচ্ছি:

১। আবেগ যেমন বুদ্ধিমানদের পাগল করে দিতে পারে তেমনি পাগলদের বুদ্ধিমান।

২। আমাদের ভাবাবেগগুলিকে যতই আমরা ধার্মিকতা আর আত্মমর্যাদার মোড়ক দিয়ে ঢেকে রাখি না কেন, ঠিক তারা আবরণ ভেদ করে দৃষ্টিগোচর হয়।

৩। সত্যিই যদি আমরা নির্দোষ হতাম অন্যের দোষ দেখিয়ে অতটা উল্লসিত হতাম না।

৪। স্বার্থান্বেষীরা সব ধরনের ভাষায় কথা বলতে পারে, সব ধরনের লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, এমনকী উদাসীন লোকের ভূমিকায়ও।

৫। মানুষ নিজেকে যতটা সুখী কিংবা অসুখী ভাবে ততটা সে কখনও নয়।

৬। লোকে তাদের মহৎ কাজগুলির জন্য যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করুক না কেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলির পেছনে কোনও মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না, দৈবক্রমে ঘটে গেছে।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭। আন্তরিকতা মানে হৃদয়ের উন্মেষ, যা অত্যন্ত দুর্লভ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তা হল অন্যের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য এক ধরনের সূক্ষ্ম চালাকি।

৮। সত্য জগৎ-সংসারের যতটা না উপকার করে সত্যের ভনিতা তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে।

৯। এমন কোনও ছদ্মবেশ নেই যা দিয়ে সত্যিকারের প্রেমকে, কিংবা প্রেমের অভিনয়কে বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখা যায়।

১০। এমন মেয়েকে খুঁজে পাওয়া শক্ত নয় যার একজনও প্রেমিক নেই; কিন্তু যার কেবল একটিই প্রেমিক তেমন মেয়েকে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

১১। প্রেমের সঙ্গে ভূতের খুব মিল আছে। সকলেই ও দুটোর কথা বলে, কিন্তু প্রায় কেউই দেখেনি।

১২। পরস্পরকে ঠকাতে না পারলে লোকে সমাজে টিঁকতে পারত না।

১৩। বোকা বনে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হল নিজেকে অন্যদের চেয়ে চালাক ভাবা।

১৪। আমরা যখন প্রশংসাবাক্যকে অস্বীকার করি তখন আমরা দ্বিতীয়বার প্রশংসিত হতে চাইছি বলে ধরে নিতে হবে।

১৫। প্রেমের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠা আসলে এক অন্তহীন বিশ্বাসঘাতকতা, যার ফলে আমাদের হৃদয় প্রেমাস্পদের বিভিন্ন গুণগুলির প্রতি একের পর এক আকৃষ্ট হতে থাকে, কখনও একটিকে বেশি পছন্দ করে, কখনও অন্য আরেকটিকে। সুতরাং, এই একনিষ্ঠা একই বিষয়ে স্থিরীকৃত ও আবদ্ধ ব্যভিচার ছাড়া কিছু নয়।

১৬। গাম্ভীর্য জিনিসটা শরীরের এক কৃত্রিম রহস্য, যা দিয়ে মনের খুঁতগুলোকে চমৎকার ঢেকে রাখা যায়।

১৭। যাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই তাদের ভালবাসা শক্ত। যাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা খুব বেশি তাদের ভালবাসাও কম শক্ত নয়।

১৮। কারুর চরিত্রে হাস্যকর কিছু না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে যে যথেষ্ট ভাল করে খোঁজা হয়নি।

১৯। ঘটনাচক্র যেমন অন্যদের কাছে আমাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে, তেমনি নিজেদের কাছেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০। যাদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল আছে শুধু তাদেরই আমরা বিচক্ষণ মনে করি।

২১। আমরা ভালই জানি যে, নিজের স্ত্রীর কথা বেশি বলতে নেই; কিন্তু আমরা যেটা জানি না সেটা হল নিজের কথা আরও কম বলতে হয়।

২২। আমরা যে আজও আশ্চর্য হতে পারি এটা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

২৩। যার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ আর যার হৃদয়ে প্রেম নেই তাদের দু'জনকে খুশি করাই সমান শক্ত।

২৪। যতক্ষণ না দ্বিতীয় প্রেমিকের সাক্ষাৎ মিলছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথমজনকে আগলে রাখাই রীতি।

২৫। সাধারণত আমাদের একথা বলার সাহস হয় না যে আমাদের কোনও দোষত্রুটি নেই, এবং আমাদের শত্রুদের কোনও সদ্‌গুণ নেই। তবে খুঁটিয়ে দেখলে আমরা অনেকটা সেইরকমই মনে করি।

২৬। আমরা যখন বিভিন্ন বয়সে পৌঁছাই তখন আমরা সেখানে আনকোরা নতুন, ফলে বয়স যাই হোক আমরা অনভিজ্ঞই থেকে যাই।

২৭। আমাদের সবচেয়ে ভাল কাজগুলির জন্য আমরা কম লজ্জা পেতাম না যদি লোকে জানতে পারত আসলে কী উদ্দেশ্যে আমরা সেগুলি করেছি।

২৮। আমরা সহজেই বন্ধুদের দোষত্রুটিগুলিকে ক্ষমা করি, যদি না তাতে আমাদের কিছু এসে যায়।

২৯। কোনও এক বিশেষ ব্যক্তিকে চেনা সমগ্র মানবজাতিকে চেনার চেয়ে শক্ত।

৩০। লজ্জা ও হিংসার যন্ত্রণা এত তীব্র মনে হয়, কারণ আমাদের আত্মম্ভরিতা সেগুলিকে সহ্য করতে সাহায্য করে না।

৩১। মননশীল নির্বোধদের মতো অস্বস্তিকর আর কেউ নেই।

৩২। আমরা যা নই তা দেখানোর চেষ্টা না করে আমরা যা তা দেখালে নিজেরাই অনেক বেশি উপকৃত হতাম।

৩৩। প্রেমরোগ সারানোর বেশ কয়েকটি ওষুধ আছে, তবে কোনওটিই অব্যর্থ নয়।

৩৪। আমাদের আত্মবিশ্বাসের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সহানুভূতি বা প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছে।

৩৫। শারীরিক আলস্যের চেয়ে আমাদের মানসিক আলস্য অনেক বেশি।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬। মানুষে মানুষে ঝগড়াঝাঁটি মোটেই এত দীর্ঘস্থায়ী হত না, যদি দোষটা সত্যিই এক পক্ষের হত।

৩৭। ঈর্ষাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ইতরামি এবং ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিরাই সবচেয়ে কম সহানুভূতি দাবী করে।

৩৮। অন্যরা সত্য গোপন করলে বিক্ষুব্ধ হওয়ার কোনও কারণ নেই, কারণ আমরা নিজেরাও প্রায়শ সেটা করে থাকি।

৩৯। বইয়ের চেয়ে মানুষকে পড়া অনেক বেশি জরুরি।

১৯৯০

প্রতিহিংসার অভিধান

গুস্তাভ ফ্লবের (১৮২১-১৮৮৮)-এর এই অত্যাশ্চর্য অভিধানটি সাহিত্য-পাঠকদের কাছে এক মস্ত বড় ধাঁধা। যাঁকে আমরা আধুনিক বাস্তবধর্মী মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের অন্যতম উদ্ভাবক ও শ্রেষ্ঠ কারিগর বলে জানি, তিনি গোপনে এক তিক্ত-মধুর খেলায় মেতেছিলেন। মাদাম বোভারি বা 'আবেগমথিত শিক্ষা'-র (*L'Education sentimentale*) পাশাপাশি মানুষের মুখোশ খুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেখা এক চূড়ান্ত ব্রহ্মাস্ত্র-উপন্যাস ('বুভার ও পেকুশে') রচনার খেলা, অভিধানটি হবে যার অংশ। নাম দিলেন 'প্রচলিত ধ্যানধারণার অভিধান' (*Le Dictionnaire des idées reçues*)।

নির্বুদ্ধিতা, স্থূল রুচি, কাপট্য, ঈর্ষা ও অজ্ঞতা মানুষের মনকে কীভাবে সীমাবদ্ধ করে দেয় তার ছবি আঁকতে গিয়ে ফ্লবের বানিয়ে তুললেন এমন এক উদ্ধৃতির তালিকা, যা পড়ার পর লোকে কথা বলতে ভয় পাবে পাছে 'এই অভিধানের কোনও বাক্যের সঙ্গে তার বক্তব্য হুবহু মিলে যায়!'

১৮৫০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রাচ্য-ভ্রমণের সময় লুই বুইলেকে লেখা এক চিঠিতে ফ্লবের প্রথম এই অভিধানের উল্লেখ করেন। এই 'অদ্ভুত বই'টি (une oeuvre étrange) এমনভাবে সাজানো যে পাঠক ধরতেই পারবে না তাকে নিয়ে রসিকতা করা হচ্ছে, না হচ্ছে না। বন্ধু মাক্সিম দ্যু কাঁ-র স্মৃতিকথা (১৮৮২-৮৩) থেকে জানা যাচ্ছে ফ্লবের অন্তত কুড়ি বছর ধরে ওই প্রকল্পটিকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। ১৮৪৪ সালে স্নায়ুর অসুখে আক্রান্ত যে-মানুষটি মনে করেছিলেন 'নিজেকে শিল্পের মধ্যে বন্দি করে ফেলে অন্য সব কিছুকে ভুলে যাওয়া ছাড়া যন্ত্রণা এড়ানোর কোনও রাস্তা নেই,' তিনিই সব প্রতিরোধ ভেঙে ফেলে লিখছিলেন সমাজজীবনের এক সহজ পাঠ, 'প্রতিহিংসা চরিতার্থতার বই' (livre des vengeances)।

কার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা? মধ্যচিত্ততার, মূর্খতার বিরুদ্ধে। ১৮৫২ সালে বইটির এইরকম মুখবন্ধের কথা ভাবছিলেন ফ্লবের: 'কোনও আইনই আমায় কামড়াতে পারবে না, যদিও সমস্ত কিছুকেই আমি আক্রমণ করব। লোকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাষ্টামির প্রত্যেকটি দিকই আমি উদ্‌ঘাটিত করব, ব্যবহার করব অনেক উদ্ধৃতি ও কিছু ভয়াবহ কথা, যাতে যাবতীয় পাগলামিকে শেষবারের মতো ধ্বংস করে ফেলা যায়।' ১৮৫৩ সালে লুইজ কোলেকে লেখেন: 'তুমি কি লক্ষ করেছ যে আমি মরালিস্ট হয়ে যাচ্ছি? এটা কি বার্ধক্যের লক্ষণ?... মাঝে মাঝে লোককে বেদম গাল দেবার জন্য ভেতরটা চিড়বিড় করে ওঠে...।'

এই অভিধানে সংকলিত হবে বর্ণানুক্রমে নানা সম্ভাব্য বিষয়ের ওপর এক সফল, জনপ্রিয়, সামাজিক মানুষের মজ্জাগত গতানুগতিক ধ্যানধারণা। অর্থাৎ সমাজই এই পাঠটির প্রধান শত্রু। জনসাধারণ এখানে প্রায় আবশ্যিকভাবে নির্বোধ। সংগৃহীত চলতি ধ্যানধারণাকে তো নির্বোধ হতেই হবে, কারণ তা 'সংগৃহীত'। অন্যদিকে, এই পাঠ সার্ত্র-এর মন্তব্যও স্মরণ করিয়ে দেয়, ফ্লবের নির্বুদ্ধিতাকে এমনভাবে প্রতিরোধ করছেন যেন তিনি এক নগ্ন আক্রমণের সামনে; সুস্পষ্টতই তাঁর কাছে 'মূঢ়তা এক অত্যাচার।' তাঁর মতে, 'নির্বোধ' ও 'হত্যাকারী' প্রায় সমার্থক—মূর্খতা, নিষ্ঠুরতা ও অবিচার অভিন্ন, যেমন তিনি দেখিয়েছেন 'বুভার ও পেকুশে' উপন্যাসে। এই অভিধানের যে দ্বিতীয় নামটি তিনি দেন সেটি হল মানুষের মূঢ়তার বিশ্বকোষ (Encyclopédie de la bêtise humaine)।

ফ্লবেরের কাছে যা নিন্দনীয় মনে হয়েছে তা এক প্রশ্নহীন বিশ্বাস, আলোচনার অনুপস্থিতি (l'absence de discussion) —যার উৎস 'আমাদের পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা' ('notre gigantesque ignorance') (জর্জ সাঁদকে লেখা চিঠি)। এই বচনের মূল উদ্দেশ্য একটাই: সমাজে গ্রহণযোগ্য ও আদরণীয় হয়ে ওঠা এবং অন্যের সামনে নিজের একটা বিশেষ চেহারা প্রতিপন্ন করা। চিঠিপত্রে গণভাবনার এই গোঁড়ামির দিকটির উল্লেখ করেছেন।

ফ্লবের যাকে বলছেন 'সংগৃহীত ধারণা', idées reçues, তিনিই কি তার আবিষ্কর্তা? শব্দবন্ধটি বিংশ-একবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করে ফ্রান্সে সাধারণত ফ্লবেরের অভিধান প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তিনি যদি কথাটি তৈরি নাও করে থাকেন, তিনিই প্রথম সাধারণ্যের ধ্যানধারণাকে এক নির্মোহ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রাখেন। এই 'সংগৃহীত ধ্যানধারণা'-র বীজ খুঁজে পাওয়া যাবে আঠারো শতকে, যখন তা ঐতিহ্য-গ্রাহ্য ও সাধারণভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ-সমালোচিত। সম্ভবত ভলতেরই প্রথম তাঁর দার্শনিক পত্রে এটিকে একটি নিন্দার্হ নির্মাণ হিসেবে ব্যবহার করেন। শাঁফরের ('মাক্সিম এ পাঁসে') যে-বিখ্যাত মাক্সিমটিকে ফ্লবের এপিগ্রাফ হিসেবে ব্যবহার করেছেন তা সংগৃহীত ধারণা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে: 'সমস্ত প্রচলিত ধারণা, জনসমর্থিত ভাবনাচিন্তাই আহাম্মকি ছাড়া কিছু নয়, কারণ তাতে অধিকাংশ লোকেরই সুবিধে হয়েছে।' অন্য উদ্ধৃতিটি একটি লাতিন প্রবচন: 'Vox populi, vox Dei' (জনতার কণ্ঠ মানে ঈশ্বরের কণ্ঠ)।

১৮৫৩ সালে মাদাম বোভারি লিখতে লিখতে জাক-বার্তেলমি সাল্‌গ্‌-রচিত 'ভুল-ভ্রান্তি ও পূর্ব-নির্ধারিত চিন্তা' (১৮১১-১৩) বইটি ফ্লবেরের হাতে আসে, যেটি তাকে উৎসাহিত করে থাকবে। তবু ঐ বই তাঁর দুর্বল ও হালকা মনে হয়েছিল: 'উদ্ভটপনা দিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেই চলবে না, তাকে উদ্‌ঘাটিত করতে হবে এবং সেটির উলটো ধারণার বিরুদ্ধেও লড়তে হবে, কারণ তা একই রকম কিংবা আরও বেশি নির্বোধ। (৩১ মার্চ ১৮৫৩)

লুইজ কোলেকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন: 'হাসনদারদের বিপক্ষে থাকলে হাস্যকর হতে হয়...। হাসনদারেরা সর্বদাই শক্তের দলে, কায়দাবাজদের দলে, ধার করা ধারণার দলে।—শান্তিতে বাঁচতে হলে হাস্যকর বা হাসনদার কোনও দলেই থাকলে চলবে না, বাইরে দূরে থাকতে হবে।' (১৫ জানুয়ারি ১৮৫৪) দেখনদারিকে তিনি অভিহিত করেছেন আধুনিক ধর্ম হিসেবে, যার বিরুদ্ধে উদ্গার না করতে পারলে তাঁর মনে হয়েছিল তিনি বাঁচবেন না।

ফ্লবেরের অভিধানের শ্লেষ (জুলাই রাজতন্ত্রের আমল থেকে ফ্রান্সে যার ঝাঁঝ বেড়ে গিয়েছিল) হয়তো দোমিয়ের ছবি ও ভাস্কর্য তথা ক্যারিকেচারিস্ট শার্ল ত্রাভিয়েসের মাইয়ো-নামক ঝাঁঝালো চরিত্রটির রেশ বয়ে আনে। ১৮৭০-এর দশকের শেষ দিকে এক একটি সম্পূর্ণ বাক্য-সংবলিত ক্লিশে-সংকলনের চল শুরু হয়। এদ্‌মঁ লাপর্ত এরকম দুটি গ্রন্থের প্রতি ফ্লবেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান: 'আমি কাত্‌রেলের *Le Causeur parisien* পড়েছি। ভয়ের কিছু নেই, অতি বাজে। আমার অভিধানটি তার থেকে ঢের বেশি শক্তিশালী।... ভিভিয়ের বইটি দেখলে কিনে রেখো। তবে ও নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই, ওটা কাত্‌রেলের

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাঁচেরই হবে।' ফ্লবেরের ভাল না লাগা ওই বইগুলি ছিল আসলে কতগুলো প্রসঙ্গ-বহির্ভূত কথোপকথনের প্যারডি, যেমন 'আমার পিছু নিলে কিন্তু পুলিশ ডাকব' ইত্যাদি। বস্তুত, ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত ফরাসি অর্বাচীন বাক্যালাপের এ এক ঠাট্টা সংস্করণ। ফ্লবেরের আইরনি ও রহস্যময়তা সেখানে খুঁজে পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

তাঁর প্রকল্পটিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনও মন্তব্য নয়, শুধু পরস্পরবিরোধী কতগুলো কথার টুকরো আজগুবি ও উদ্ভটকে প্রকাশ করে: যেমন, 'ডিগ্রি: জ্ঞানের লক্ষণ। কিছুই প্রমাণ করে না।' যখন তিনি লেখেন: 'সোনালি-চুল মেয়ে: কালো-চুলদের চেয়ে উষ্ণ,' এবং 'কালো-চুল মেয়ে: সোনালি-চুলদের চেয়ে উষ্ণ,' তখন বিশ্বসংসারের কাপড় খুলে ফেলা হয়। সার্ত্র অবশ্য অভিযোগ করেছেন যে স্পষ্ট কোনও দর্শন না থাকায় এই অসাধারণ পত্রিকায় শেষ পর্যন্ত কিছুই দাঁড়াচ্ছে না: সকলেই তাঁর আক্রমণের শিকার, অর্থাৎ কেউই নয়, কিংবা লেখক নিজে। তাঁর মতে, বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানোটাই তাঁর ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি। অন্যদিকে, ফ্লবেরের সপক্ষে বলা যায় যে এই বর্ণানুক্রমিকতা সমস্ত জিনিসটাকে তুচ্ছ করে তোলার এক সুপরিকল্পিত, সুচতুর উপায়।

অমুক নির্বোধ উক্তিটি 'করতে হবে' বা 'করা উচিত' বলে পাঠককেও তিনি 'আহাম্মকের অভিধান'-এর অন্তর্ভুক্ত করে তোলেন, তাকে স্থাপন করেন বক্তব্যের কেন্দ্রে। কখনও কখনও বিরোধিতাও সংগৃহীত মূর্খতাকেই প্রকাশ করে। যেমন, 'অভিনেত্রী:—মোটেই নয়, এমন কেউ কেউ আছে যারা ভদদরলোকের বৌ!' এখানে ড্যাশ্‌টি কণ্ঠস্বরের অনির্দিষ্টতাকে তুলে ধরে ও অন্যদিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় ওই কণ্ঠস্বর এক বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত, 'শিক্ষিত' ফ্রান্স আর বর্তমানের মননশীলতার মিথ্যে মুখোশ-আঁটা ছাপোষা, অসৎ, পরশ্রীকাতর, কর্মবিমুখ, সবজান্তা, কূপমণ্ডূক, ভাষণবীর বাঙালির মিল আমাদের আশ্চর্য করবে। এই মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক মিল মানুষের প্রকৃতিগত আন্তর্জাতিকতাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়! যেমন 'এখন বড়লোক হলে কী হবে, প্যারিসে প্রথম যখন এসেছিল খড়ম পায়ে দিয়ে এসেছিল!' 'গ্রামের লোকেরা শহরের লোকেদের চেয়ে ভাল', 'ম্যুসে ভিক্‌তর য়্যুগোর চেয়ে বড়' অথবা 'বেশি স্বাস্থ্য কিন্তু ভাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়!' সমাজজীবনের নানা স্তরকে—অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত তরল ধারণার ('মেয়ে শিল্পী মানেই বেশ্যা। পণ্ডিতির ঝোঁক।') সঙ্গে নাক-উঁচুদের বারফট্টাইকে ('মেটেরিয়ালিজম শব্দটি আর্তনাদ করে চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করতে হবে') একত্রিত করে ফেলায় 'জ্ঞান' ও অজ্ঞানতা, 'বুদ্ধি' ও নির্বুদ্ধিতার ভেদরেখা মুছে দেওয়া হয়েছে। এতই হাস্যকরভাবে ক্ষুদ্র এই সামাজিক গণ্ডি যে সার্ত্র-এর ভাষায়, 'la pire bêtise, c'est l'intelligence,' বুদ্ধিও সেখানে নিকৃষ্ট নির্বুদ্ধিতার সামিল। মানবাবস্থার তুচ্ছতা সম্পর্কে এ এক চরম নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞান। প্রগতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল, বুর্জোয়া ও সমাজবাদী, বস্তুবাদী ও অধ্যাত্মবাদী সকলকেই তাঁর সমান অসহ্য ও অপদার্থ মনে হয়েছে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বকোষ-আন্দোলনকারীদের মতো তিনি মনে করেননি সংগৃহীত ভাবনার ঠিকেদারদের প্রগতিশীল ভাষণ দিয়ে ঠেকানো যাবে। পূর্বনির্ধারিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর অস্ত্র প্রতি-তর্ক নয়—এক বর্ণানুক্রমিক সূচি, সীমাহীন বিভ্রান্তির এক অশেষ তালিকা যা আপাতদৃষ্টিতে নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক। 'একটি শব্দও থাকবে না যা আমার নিজের।' ফ্লবেরের সায় নেই কোথাও, তবু এই অভিধান একই সঙ্গে একজন ব্যক্তি, একটি প্রজন্ম, একটি যুগের আত্মজীবনী, এক স্মৃতিগ্রন্থ।

ফ্লবের যেন একটি খোঁড়া, পিচ্ছিল ধারণাকে নিয়ে পৃথক ও প্রয়োজনমতো সংকুচিত করে নিলেন, সেটিকে রাখলেন উদ্ধৃতিচিহ্নের মাঝখানে; তারপর একটিও শব্দ না খরচ করে, তাঁর মূল্যবান সময় অপচয় না করে নেপথ্য থেকে যোগ করলেন: 'আহাম্মকেরা বলে।' আমাদের মনে পড়তে পারে আধুনিক ফরাসি ঔপন্যাসিক নাতালি সারোৎ-এর 'আহাম্মকেরা বলে' (*Disent les imbéciles*) :

> সাবধান, কাছে এসো না! ওটা একটা সময়-বোমা! ওটাকে সরিয়ে নেওয়া যাবে না, ওটাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে নিষেধাজ্ঞা,—'বিপদ! বিপদ!' যারা শুনতে চাইবে না তারা জানে না তাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে: তারা একদম বোকা বনে যাবে।

ফ্লবেরের এই অভিধান যেন ভাষার ভুল ব্যবহারের হাত-বই, কথার ফাঁদ।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরাসিতে মূঢ়তা বা 'bêtise' শব্দটির শিকড়ের দিকে তাকালে দেখা যাবে, 'bête'-এর অর্থ নির্বোধ, কিন্তু বিশেষ্য হিসেবে 'bête'-এর অর্থ পশু। ফলে 'bêtise'-এর মধ্যে এক পশু-সুলভ নির্বুদ্ধিতা আছে যা তার ইংরেজি প্রতিশব্দে নেই। সার্ত্র-এর মতে, বাক্যগুলিই নির্বোধ ('bête'), কারণ অনমনীয় যান্ত্রিকতার কারণে সেগুলি বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়েছে। রলাঁ বার্ত মনে করেছেন, যা নির্বোধ তা হল এগুলির স্থবিরতা ও অবিভাজ্যতা।

ফ্রাঁসোয়াজ গাইয়ার 'লোহার হাত' (bras de fer) কথাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এন্ট্রির নির্বাচন দেখলেই হাসি পায়; চূড়ান্ত পুনরাবৃত্তি এগুলিকে ফাঁপা ও শূন্যগর্ভ করে তুলেছে। ফ্লবের সেই সাহিত্যিক চরমপন্থী যিনি লুইজ কোলেকে লিখেছিলেন: 'আমি এমন বই লিখতে চাই যাতে শুধু বাক্যগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে দিলেই চলবে!' একদিক থেকে, এ-বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হল 'শূন্য', যাকে ধরে রেখেছে কাঠামো ও শৈলীর শক্তি।

সাম্প্রতিক কালের সমালোচকেরা অনেকেই ফ্লবেরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। যেমন, মরিস ব্লাঁশো (সাহিত্যের অকর্মক প্রকৃতি), পিয়ের বেরগুইনিউ (অর্থের কেন্দ্রীয় পিচ্ছিলতা), ক্লোদ ব্যুরজল্যাঁ (টেক্সটের আত্ম-উল্লেখমুখী প্রকৃতি) ও জোনাথন কালার (সংযোগশিল্প নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন)। এমনকী সার্ত্রও, যিনি শেষ দিন পর্যন্ত কথার উদ্দেশ্য ও অর্থে বিশ্বাস করতেন, ফ্লবেরকে অভিহিত করেন 'শূন্যতার ঘোড়সওয়ার' বলে। মিশেল ফুকোর মতে, এ যেন সমাজ থেকে উৎক্ষিপ্ত, নানা পর্ব থেকে নিঃসৃত, নানা বই নিয়ে একটি বই—যা বই জিনিসটার অপর্যাপ্ততাকেই প্রমাণ করে। আর রলাঁ বার্ত মনে করেছেন যে ফ্লবের সাহিত্যিক প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন এবং তৈরি করেছেন এমন এক রচনা যা আঙুল দিয়ে 'নিজের মুখোশটি দেখিয়ে দেয়।'

কেউ কেউ (যেমন, জেরম্যান ব্রে) প্রশ্ন তুলেছেন, 'তবে কি ফ্লবের পোস্টমডার্নিস্টদের সমসাময়িক?' অর্থের উৎপাদন সম্পর্কে চিন্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার উত্তরাধুনিক প্রশ্নে ফ্লবের এমন অনিবার্যভাবে জড়িয়ে যান যতটা উনিশ শতকের আর কোনও ঔপন্যাসিকই যাননি। ফ্লবেরের টেক্সটটি যেন শব্দের শ্বাসরোধকারী চোরাবালি, যার উৎস ও স্থায়ী অর্থ অদৃশ্য হয়েছে, যাকে ঢেকে ফেলেছে পরিবর্তনশীল, অপস্রিয়মাণ বালিরাশি।

যে অন্তঃসারশূন্যতার দিকে—যা তাঁর গল্প ও উপন্যাসেরও উপজীব্য—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্লবের আমাদের টেনে নিয়ে যান কারওর কারওর মতে তা স্যামুয়েল বেকেটের দমবন্ধ করা শূন্যতার কথা মনে করিয়ে দেয়। এজরা পাউন্ড জয়েসের 'ইউলিসিস'-এর ওপর ফ্লবেরের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। ফরাসি 'নুভো রোমাঁ' বা নতুন উপন্যাসের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব অবিসংবাদিত। কিন্তু একথা স্মরণে রাখতে হবে যে ফ্লবেরের রচনার আড়ালে ফরাসি দর্শন ও সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা কাজ করেছে। মঁতেঞের ঠাট্টা, ভলতেরের 'ভয়ংকর মুখব্যাদান' (তাঁর দার্শনিক অভিধান এবং কাঁদিদ, জাদিগ, মেমন, মিক্রমেগাস-এর মতো কাহিনিগুলি) বা লা রোশকুকোর বিখ্যাত মাক্সিম-এর ঐতিহ্য তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে বলে মনে হয়।

১৮৭৯ সালের ৭ এপ্রিল ফ্লবের মাদাম রজে দে জনেৎকে লেখেন তাঁর অভিধানটি শেষ হয়েছে, যদিও বাস্তবে তার সাক্ষ্য মেলে না। মৃত্যুর সময় তিনটি পাণ্ডুলিপি, একটি স্বহস্তে রচিত খাতা এবং দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। শেষের দুটিতে ফ্লবেরের বন্ধু (১৮৬৫ সালে যাঁর সঙ্গে আলাপ) এদ্‌মঁ লাপর্ত (১৮৩২-১৯০৬)-এর হস্তাক্ষর দেখে বোঝা যায় তিনি ক্রমশ হয়ে উঠেছিলেন লেখকের মুখ্য সহযোগী, আগে যা ছিলেন যথাক্রমে লুই বুইলে ও জ্যুল দ্যুপ্লাঁ (মৃত্যু যথাক্রমে ১৯৬৯ ও ১৮৭০)। ১৮৭৭ থেকে ১৮৭৯ পর্যন্ত কিছুদিন ফ্লবেরের নোটবই ও খেরোর খাতা ('carton de curiosités') থেকে উদ্ধৃতি সংকলন করে ঝাড়াইবাছাই করার দায়িত্ব ছিল এই লাপর্তের ওপর। ১৮৭৭ সালের ১২ জুনের এক চিঠিতে ফ্লবের এই নির্বাচন নিয়ে খোঁজখবর করেছেন। ১৮৭৯ সালে কোনও কারণে লাপর্তের সঙ্গে ফ্লবেরের ঝগড়া হয়ে যায়।

ফ্লবের এই অভিধানের প্রথম ও শেষ লেখক হলেও পাণ্ডুলিপিতে লাপর্তের হস্তক্ষেপের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কখনও লাপর্ত মার্জিনে কোনও একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত করেছেন, যোগ করেছেন নতুন বিষয়। পাণ্ডুলিপিতে (পেনসিলে) কাটাকুটি, বর্জন ও সংযোজনের ধরন দেখে মনে হয় তারা পরস্পরে মিলে কোনও একটি পরিমার্জনার কথা ভেবেছেন।

ফ্লবেরের মৃত্যুর (১৮৮০) পর পাণ্ডুলিপিগুলি প্রায় তিরিশ বছর তাঁর ভাগ্নী কারোলিন ফ্রাঁকল্যাঁ-গ্রৎ-এর কাছে গচ্ছিত ছিল। ১৯১০ সালের মার্চ

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসে সেগুলিকে প্রথম আবিষ্কার করেন জনৈক গবেষক য়. এল. ফেরের। অবশেষে ওই বছরই তা প্রকাশিত হয় 'বুভার ও পেকুশে' উপন্যাসের পরিশিষ্ট রূপে। সংস্করণটি 'এদিসিয়ঁ কনার' নামে পরিচিত। ১৯১৩ সালে অভিধানটি পৃথকভাবে ছাপা হয়।

বুভার ও পেকুশে

যেহেতু এই অভিধান 'বুভার ও পেকুশে' নামক অসমাপ্ত উপন্যাসের অঙ্গ, সেটির সম্পর্কে দু'-চার কথা বলা প্রয়োজন।

ফ্লবের ও তাঁর বন্ধু বুইলে রুয়াঁর এক বৃদ্ধাশ্রমের বাইরে বসেছিলেন; এমন সময় সেখানকার দুজন বাসিন্দাকে বেরিয়ে আসতে দেখে ফ্লবের বলে ওঠেন তিনি ওইধরনের লোকেদের নিয়ে লিখতে চান। ইতিপূর্বেই তিনি *L'Audience* পত্রিকায় মরিস রচিত ওইরকম একটি গল্প পড়ে থাকবেন। গল্পটি ছিল এইরকম: দুই অর্বাচীন কেরানি-বন্ধু ঠিক করে তারা পরিবারসহ গ্রামে ফিরে গিয়ে সহজ সরল জীবনযাপন করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও অতীত জীবনে ফিরে গিয়ে পরস্পরকে শ্রুতিলিখন দিতে শুরু করে।

'বুভার ও পেকুশে'-র কাহিনি খানিকটা অন্যরকম। মাছিমারা কেরানি বুভার তার প্রাপ্য সম্পত্তি পেয়ে বন্ধু পেকুশের সঙ্গে স্বস্তির সন্ধানে গ্রামে ফিরে যায়। অতঃপর নানা পেশায় হাত লাগিয়ে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। যাবতীয় অর্থ খুইয়ে ও নিজেদের অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে অবশেষে তারা পূর্বতন নকল করার পেশায় ফিরে যায়।

১৮৭৯ সালে যখন উপন্যাসটি শেষ হয়ে এসেছে, তখন তিনি বান্ধবী রজে দে জেনেৎকে লেখেন এটির নাম হবে দুই নকলনবিশ। এই 'নারকীয় উপন্যাস'টি হবে খুবই অদ্ভুত, এতে প্রেম-ভালবাসার লেশমাত্র থাকবে না। এক বছর আগে ফ্লবের মাদাম ব্রেনকে লেখেন: 'তাছাড়া আমার (গোপন) উদ্দেশ্য হল পাঠককে এতটাই চমকে দেওয়া যাতে সে পাগল হয়ে যায়!'

১৮৮০ সালে মৃত্যুর আগে ফ্লবের প্রথম খণ্ডের নটি অধ্যায় শেষ করে যান, দশম অধ্যায়টি অসমাপ্ত থেকে যায়। 'বুভার ও পেকুশে'-কে তিনি যেভাবে ভেবেছিলেন তাতে গোড়ায় তারা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও দার্শনিক বইপত্রের কিছুই বুঝতে পারবে না। সেসব বইয়ের নির্বোধ অংশগুলিও

তাদের বিচারবুদ্ধির নাগালের বাইরে; তাদের কোনও বিশ্লেষণ ক্ষমতাই নেই। ক্রমশ তারা ধান-চাল আলাদা করতে শিখবে, সংকলন করবে এই 'আহাম্মকের অভিধান'।

প্রাথমিক পরিকল্পনাতেও উপন্যাসটিকে তিন ভাগে লেখার কথা ভেবেছিলেন তিনি; যার তৃতীয় ভাগটি হবে দুই অর্বাচীনের কপি করা এক নির্বোধ উদ্ধৃতির সংকলন। 'আহাম্মকের অভিধান' সেটিরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত, এই তৃতীয় ভাগটি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যে তার জন্য গোটা একটি খণ্ড প্রয়োজন হয়। শেষ তিন বছরে 'আহাম্মকের অভিধান'-ই ছিল তাঁর অনুধ্যানের মুখ্য বিষয়।

একটি পরিকল্পনার খসড়ায় দেখা যাচ্ছে ফ্লবের লিখছেন তাঁর চরিত্র দুটি সব কিছু খাতায় টুকে রাখে: পাণ্ডুলিপি, খবরের কাগজ, হারানো চিঠি, পোস্টার...। ফলে রাশি রাশি কাগজ থেকে চয়ন করার প্রশ্ন এসে পড়ে এবং প্রবল অসুবিধে সত্ত্বেও তারা সেই কাজে ব্রতী হয়। এইভাবে তারা সারণি বানায়: প্যারিসের অপরাধ, জনতার অপরাধ...ইত্যাদি।

এই বিধ্বংসী অভিধান থেকে কয়েকটি উদাহরণ:

আকাদেমি ফ্রাঁসেজ : গালাগাল দেবে, কিন্তু সেইসঙ্গে চেষ্টা করবে এর সদস্য হওয়ার।

দুর্ঘটনা: সর্বদাই 'শোচনীয়' অথবা 'বিরক্তিকর', যেন একটি দুর্ঘটনাকেও আনন্দদায়ক হতে হবে।

প্রসব: কথাটি এড়িয়ে চলতে হবে। 'ব্যাপার' বললে জুতসই হয়। 'কবে নাগাদ ব্যাপারটা ঘটবে বলে মনে হয়?'

অভিনেত্রী: 'মাপ করবেন! এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ভাল বাড়ির বউ!'

আমেরিকা: আমেরিকা আবিষ্কার না হলে আমাদের সিফিলিস হত না।

খুনে: যারা লোকের বাড়িতে আগুন ধরায় তাদের চেয়ে কম বজ্জাত!

হাই: হাই তুলেই বলতে হবে : 'মাপ করবেন, এটা বিরক্তি থেকে নয়, হজমের অসুবিধে থেকে।'

ঝি: ঝি মাত্রেই বজ্জাত! আজকাল কিন্তু আর সেরকম কাজের লোক পাওয়া যায় না।

দুঃস্বপ্ন: পেট থেকে উৎপত্তি।

বিখ্যাত ব্যক্তি: এদের সম্পর্কে ঠেস দিয়ে কথা বলতে হবে, এদের ব্যক্তিগত ছিদ্রান্বেষণ করতে হবে। বালজাকের গলা পর্যন্ত ধার। ভিকতর য়্যুগো কিপটের হদ্দ।

শুয়োরের মাংস-বিক্রেতা: শুয়োরের মাংস-বিক্রেতা মেয়েরা সবসময়ই ডাকসাইটে সুন্দরী হয়।

এরপর মানুষের মাংস নিয়ে গপ্পো ফাঁদতে হবে।

চুল:ধুর, পরচুলা।

কুকুর: প্রভুর জীবনরক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি। 'মানুষের বন্ধু' হিসেবে আদর্শ।

উপনিবেশ (আমাদের): এ-বিষয়ে কথা বলার সময় মুখটা কালো করে রাখার কথা।

সংগীতানুষ্ঠান: সময় কাটানোর সেরা উপায়।

পুরস্কার : বাইরে নিন্দে করবে ও মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করবে। একবার পেয়ে গেলে বলবে, 'আমি তো চাইনি।'

কাজের মেয়ে : মনিবানির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদের গোপন খবর জানে। প্রায়শই মনিবানির চেয়ে দেখতে ভাল। বাড়ির ছেলেটি সর্বদা এর শ্লীলতাহানি করে।

বিশ্বস্ত: বন্ধু ও কুকুরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মেয়ে: সমস্ত কমবয়সি মেয়েই 'রক্তশূন্য' ও 'ভঙ্গুর'। সর্বদাই 'নিষ্পাপ'। এদের বই পড়া কারণ, মিউজিয়াম বা থিয়েটারে যাওয়া বারণ, বিশেষ করে বটানিকাল গার্ডেনসে যাওয়া বারণ, সেখানে বাঁদরেরা আছে। 'অল্পবয়সি মেয়ে'—কথাটা সলজ্জভাবে উচ্চারণ করতে হবে।

জঘন্য অপরাধ: কথাটা শুধুমাত্র ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

আলস্য: আলস্যেরও দরকার আছে। বনেদি জিনিস, আলস্যের মধ্যে একটা সাহেবিয়ানার গন্ধ পাওয়া যায়।

আলস্য শব্দটির আগে 'প্রশান্ত' বিশেষণটি প্রয়োগ করতে হবে।

গুলি চালানো: গুলি করে মারা কিন্তু ফাঁসিতে ঝোলানোর চেয়ে মহৎ। আহা! গুলিতে মরা লোকটির কী আনন্দ!

ছোকরা: সবসময়ই বলতে হবে 'প্যারিসের ছোকরাটি!' 'প্যারিসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোকরাটির অসম্ভব মাথা!'

বউ যেন কখনও না বলে: 'আমার মেজাজ ভাল থাকলে ছোকরার মতো ব্যাভার করতে ইচ্ছে করে!'

প্রতিভা: চেঁচিয়ে বলে উঠতে হবে: 'প্রতিভা ব্যাপারটা এক ধরনের নিউরোসিস!'

হার্নিয়া: হক্কলের আছে। Zানতি পারো না!

সম্মান: সর্বদা নিজের সম্মান নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে, কিন্তু অন্যের সম্মান নিয়ে একেবারেই নয়।

দিগন্ত: বলতে হবে: প্রাকৃতিক দিগন্ত অপূর্ব, আর রাজনীতির দিগন্ত... অন্ধকারাচ্ছন্ন!

ভয়াবহ: অশ্লীল কথা শুনলেই বলে উঠতে হবে, 'কী ভয়াবহ!' অশ্লীল কাজ করা যেতে পারে, কিন্তু অশ্লীল কথা বলা যাবে না! 'এক গভীর রাতের ভয়াবহ ব্যাপার!'

সাম্রাজ্যবাদী: সমস্ত সৎ, শান্তিপ্রিয়, ভদ্র ও বিশিষ্ট লোকেদের সাম্রাজ্যবাদী বলে অভিহিত করতে হবে।

জঘন্য: 'জঘন্য!' যেসব শিল্প অথবা সাহিত্যকর্ম 'ফিগারো' নামক সংবাদপত্র কর্তৃক প্রশংসিত হয়নি, তাদের সম্পর্কে কথাটি প্রয়োগ করতে হবে।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র: বস্তুটি কী কেউ জানে না, তবে হোমিওপ্যাথির সঙ্গে একটা সম্পর্ক থাকতেই হবে।

আবিষ্কারক: এদের মৃত্যু হয় হাসপাতালে এবং আবিষ্কারটি অন্য কেউ মেরে দেয়। কাজটি মোটেই ঠিক নয়।

মিষ্টি: যা কিছু 'সুন্দর' তার সম্পর্কে এই বিশেষণটি ব্যবহার করতে হবে। 'কী মিষ্টি! কী মিষ্টি!' বললে ধরে নিতে হবে সেটা প্রশংসার পরাকাষ্ঠা।

খবরের কাগজ: আধুনিক সমাজে খবরের কাগজের গুরুত্ব। যেমন 'ল্য ফিগারো।' সব সময় নিন্দে করবে এবং একই সঙ্গে বিশ্বাস করবে। অমুক অমুক কাগজগুলি খুব 'সিরিয়াস'। ড্রইংরুমের টেবিলে ছড়িয়ে রাখতে হবে। কিছু খবর আগেই সযত্নে কেটে রাখা বাঞ্ছনীয়। লাল কালি দিয়ে দাগ দিলে দারুণ ফল হয়। সকালে একটি গুরুভার লেখা পড়ে সন্ধেবেলা সেটি নিয়ে সর্বসমক্ষে চাল মারতে হবে।

সাহিত্য: অলস লোকেদের পেশা।

আইন: আইন আমাদের মেরে ফেলবে। ও দিয়ে সরকার চালানো যায়!

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝরাত্তির: শ্রম ও সৎ আমোদপ্রমোদের শেষ সীমা।—ওই সীমার ওপারে সবই অনৈতিক।

ভলতের: 'ভয়ংকর দাঁত বের করা হাসি'-র জন্য বিখ্যাত। গভীরতার অভাব।

ভাগনার: নাম শুনলেই বিদ্রূপের হাসি হাসতে হবে এবং সংগীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে রসিকতা করতে হবে।

১৯৯৩

অন্য এক বিপ্লব

ফ্রান্সে বিপ্লব আসতে আর মাত্র কয়েক বছর বাকি। এদিকে ইংরেজ রাজত্বে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের নতুন কয়েদখানায় বসে এক ফরাসি যুবক সংগঠিত করতে চাইছেন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এক বিপ্লব, তৈরি করতে চাইছেন বিকল্প এক সেতু : এক ফরাসি ও বাংলা শব্দসংগ্রহ। এই ঘটনা ঘটছে প্রথম বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক অভিধান প্রকাশিত হওয়ার প্রায় দু'দশক আগে!

হয়তো অর্থ ও সামর্থ্যের অভাবে ছাপা হয়নি সেই বই। নয়তো তা হয়ে উঠতে পারত বাংলা ভাষায় বিবর্তনের ইতিহাসে এক স্বর্ণফলক। বাংলা ছাপার হরফ যে তৈরি হয়ে গিয়েছে তিনি কি খবর পাননি? নইলে কেন অত দূর এগিয়েও পাণ্ডুলিপিবদ্ধ হয়ে রইল তাঁর কাজ?

চতুর্থ ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোনও সময়ে অমরসিংহের 'অমরকোষ'-এর প্রথম বাঙালি টীকাকার সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ১১৫৯ সালের ১০টি টীকায় সংস্কৃতের প্রতিশব্দ হিসেবে প্রায় ৩০০টি বাংলা শব্দকে (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, ২০০) বাংলা অভিধান রচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ধরা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতেই এক গুজরাতি পণ্ডিত 'রত্নাবলী' নামে দেশি শব্দের যে সংকলন করেন তাতে কমবেশি ১০০টি বাংলা শব্দ ছিল। কিন্তু এগুলিকে অভিধান বলা চলে না। ইউরোপীয়রাই প্রথম ধর্মপ্রচার ও শাসনের প্রয়োজনে দ্বিভাষিক অভিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, যার আদি নমুনা ১৭৩৪ সালে রচিত ও ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে প্রকাশিত দু খণ্ড পোর্তুগিজ-বাংলা শব্দসংগ্রহ। ১৭৭২ ও ১৭৭৬ সালে জর্জ হেডলি সংকলিত 'ভোক্যাবুলরি ইংলিশ অ্যান্ড মুরস' ও হ্যালহেডের 'গ্লসারি অফ স্যান্‌স্‌ক্রিট, পারসিয়ান অ্যান্ড বেঙ্গলি ওয়ার্ডস'-এ রোমান হরফে কিছু বাংলা শব্দ সন্নিবিষ্ট হয়। ১৭৮৮-তে লন্ডন থেকে প্রকাশিত অভিধানকারের নামহীন 'দ্য ইন্ডিয়ান ভোক্যাবুলারি'-তেও প্রচলিত বাংলা শব্দের কিছু নমুনা মেলে। ১৭৯৩ সালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিৎপুরের ক্রনিকল প্রেসে 'ইংরাজ ও বাঙ্গালি লোকের শিখিবার কারণ' যে 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' বাংলা অক্ষরে ছাপা হয়, সেটিকেই পথিকৃৎ মনে করেছেন যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, যদিও কেরি সাহেবের মতে সেই সম্মান প্রাপ্য হেনরি পিট্‌স্ ফরস্টারের, যাঁর প্রায় ১৮০০০ শব্দের অভিধানের দুই খণ্ড ১৭৯৯ ও ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। উইলিয়াম কেরির নিজের অভিধানের ১ম খণ্ড প্রকাশ পেতে পেতে ১৮১৫ সাল হয়ে গিয়েছিল।

সকলেই জানেন, মানোয়েল দা আস্‌সুমসাঁও-র অভিধানটি (১৭৩৪) রোমান হরফে ও পোর্তুগিজ উচ্চারণ-পদ্ধতিতে লেখা। অন্যদিকে বিবলিওতেক নাসিওনাল থেকে ফ্রাঁস ভট্টাচার্য ও আনিসুজ্জামানের উদ্ধার করা ওগ্যুস্ত্যাঁ ওসাঁর (ছাপা হয়েছে 'ওগ্যুস্তেঁ,' যেটি ভুল উচ্চারণ) ১৭৮৫ সালের বাংলা-ফরাসি শব্দকোষটি খাঁটি বাংলায় হাতে লেখা, সঙ্গে ফরাসি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ। সংস্কৃত অভিধান বর্ণানুক্রমিকতার ধার ধারত না। বর্ণানুক্রমিকভাবে 'চলন্তিকা'-র আলোচনা করতে বসে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৭) এইচ. টি. কোলরুকই 'অমরসিংহ'-র উপস্থাপনায় (১৮০৮) 'বর্ণমালানুক্রমের প্রথম ব্যবহার' করেন। এখন দেখা যাচ্ছে বহু আগেই ওসাঁ তা করেছিলেন।

এবার ফরাসি দেশের দিকে তাকানো যাক। 'আলোর শতাব্দী'র (Le Siècle des lumières) সন্তান ওসাঁ ফ্রান্সের অনন্য অভিধান-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়। নইলে হঠাৎ ফরাসি-বাংলা অভিধান লেখার ওরকম উদ্যম ও উদ্দীপনা তিনি পেলেন কোথায়? ফ্রান্সে আধুনিক অভিধান-বিজ্ঞানের জনক রবের এসতিয়েন সংকলিত প্রথম দ্বিভাষিক (ফরাসি-লাতিন) অভিধানটি প্রকাশিত হয় ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সময় ১৫৩৯ সালে। ষোড়শ শতকেই আরও তিনটি অসাধারণ ফরাসি-লাতিন অভিধান রচনা করেন জাঁ তিয়েরি, জাঁ নিকো ও জাক দ্যুপ্যুই এবং জেনিভাবাসী জাকব স্তোয়ের। সপ্তদশ শতকে জাঁ নিকো, পিয়ের মার্কি, জাক ভুলতিয়ে (ফরাসি, লাতিন ও গ্রিক)-র অভিধানগুলি ছাড়াও তিনটি মহা-অভিধান প্রকাশিত হয়, যেগুলি লেক্সিকোগ্রাফির আলোকস্তম্ভের মতো: পিয়ের রিশলে-র 'দিকসিয়নের ফ্রাঁসোয়া' (১৬৮০), আঁতোয়ান ফ্যুরতিয়ের-এর 'দিকসিয়নের য়্যুনিভেরসেল' (১৬৯০) ও আকাদেমি

ফ্রাঁসেজের অভিধান (১৬৯৪)। ওগ্যুস্ত্যাঁ এই শেষোক্তটির চতুর্থ সংস্করণ (১৬৬২) ব্যবহার করে থাকবেন। তা ছাড়া 'ত্রেভুর অভিধান' নামে খ্যাত পাঁচ খণ্ডের ফরাসি-লাতিন অভিধানটির (১৮২১) আট খণ্ডের নতুন সংস্করণটিও প্রকাশিত হয় ১৭৭১ সালে। তিনি যখন বাংলা-ফরাসি শব্দকোষ প্রণয়ন করছেন তখনই রিশলের মহা-অভিধানের একটি চমৎকার বহনযোগ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৭৮৭-৮৮ সালে প্রকাশিত হবে তিন খণ্ডে জাঁ-ফ্রাঁসোয়া ফেরো-র 'দিকসিয়নের ক্রিতিক দ্য লা লাঁগ ফ্রাঁসেজ'। বোধ হয়, সদা-অতৃপ্ত ফরাসিদের পক্ষেই এটা সম্ভব। সুতরাং চন্দননগরে কর্মরত অভিধানভাবুকটি ভাষাচর্চার দিক থেকে এক বিদ্যুৎগর্ভ ঐতিহ্যের সন্তান।

একথাও মনে রাখতে হবে যে বুদ্ধিবিভাসার যুগ আঠারো শতকেই ফ্রান্সে ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রকৃত কৌতূহলের সূচনা হয়। ১৭৭৩ সালে 'ফ্রাগমাঁ স্যুর ল্যাঁদ' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনায় স্বয়ং ভলতের (১৬৯৪-১৭৭৮) ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য ভারত-ভাবনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ১৭৯৫ সালে প্রাচ্যভাষার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান একোল স্পেসিয়াল দে লাঁগ জরিয়াঁতাল স্থাপিত হয়। ম্যাক্স মূলার সেই ইস্কুলেরই ছাত্র। শতাব্দীর মাঝামাঝি ২০ বছর বয়সী আঁকতিল দ্যু পেরঁ ভারতবর্ষের গ্রন্থাদিকে জানবার অভিপ্রায়ে জাহাজে চড়ে বসেছিলেন। পরে তিনি দারা শিকোর ফারসি সংস্করণ থেকে লাতিনে উপনিষদ অনুবাদ করেন। ওদিকে কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ সংস্কৃতের আসন বসাতে বাধ্য করলেন সংস্কৃতবিদ গেজি। জার্মানিতে তখন 'মানবজাতির ইতিহাসের দর্শন' লিখছেন ভারতপ্রেমী হার্ডার। গ্যোয়েটে লিখতে চলেছেন শকুন্তলা-স্তুতি (১৭৯১)। অর্থাৎ ইওরোপ ও ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও আন্তঃসাংস্কৃতিক ডিসকোর্স নির্মাণের ক্ষেত্রে তৈরি হয়ে উঠতে চাইছিল অন্যতর এক স্পেস।

'ওগ্যুস্তেঁ ওসাঁর বাংলা-ফরাসি শব্দকোষ' (সম্পা: ফ্রাঁস ভট্টাচার্য ও আনিসুজ্জামান, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা)-এর সম্পাদকদ্বয় অবশ্য এই ঐতিহাসিক শব্দকোষের বৃহত্তর পটভূমির কথা ভাবেননি, যদিও ওগ্যুস্ত্যাঁ ওসাঁর স্থানাঙ্ক নির্ধারণের জন্যই এসবের প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়।

প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে ওসাঁর লেখা সাতটি পাণ্ডুলিপি রাখা

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। সম্পাদকদ্বয় যে পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করেছেন সেটি ১৭৮৫ সালে সংকলিত একটি বাংলা-ফরাসি শব্দকোষ। তাঁরা জানিয়েছেন, ১৭৮৫-রই আরেকটি পাণ্ডুলিপিতে ভারতীয় পোর্তুগিজ শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ফরাসি-বাংলা অভিধানের দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। প্রথমটির তারিখ ১৭৪৩ (এটি একটি মুদ্রণপ্রমাদ, হবে ১৭৮৩), দ্বিতীয়টির ১৭৮১ ও ১৭৮৩। ১৭৮২ সালের তারিখ দেওয়া অন্য একটি শব্দকোষে বাংলা ও ফরাসির সঙ্গে ইংরেজি, ভারতীয় পোর্তুগিজ, ফরাসি ও হিন্দুস্থানি শব্দও ছিল। ১৭৮৫-তে লিখিত তৎসম শব্দেরও একটি পাণ্ডুলিপি আছে, আছে 'প্র্যাসিপ উ ভোকাবুলের বেঁগালি' নামে ১৭৭৪ সালের এক নামহীন স্বাক্ষরহীন পাণ্ডুলিপি। ১৭৭৯ সালে ওসাঁ দুই খণ্ডে লেখেন একটি আদর্শ পত্ররচনার সংকলন ও একটি হিন্দুস্থানি ব্যাকরণ।

১৯২৩ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় (৪৭ বর্ষ, ১৩৩০, সং ২) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথম ওসাঁর কাজকর্মের ওপর আলোকপাত করেন। সম্পাদকেরা দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে জানিয়েছেন, ওসাঁ ছিলেন চন্দননগরে ফ্রান্সের রাজা ও ফরাসি প্রতিনিধির 'কৃতশপথ দোভাষী'। সুনীতিকুমার অবশ্য আগেই জানিয়েছিলেন, ওসাঁ ছিলেন 'ফরাসী সরকারের নিযুক্ত দোভাষী,' 'ভারতীয় ভাষার হলফপড়া দোভাষী।' আনুষ্ঠানিক দলিলে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে চন্দননগরের প্রধান বিচারপতির সহযোগী বলে। ১৭৭৯ সালের এপ্রিল মাসে তিনি 'প্রাচ্যের পৃষ্ঠপোষক' গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-কে চন্দননগরে থাকতে দেওয়ার জন্য করুণ আবেদন জানিয়ে যে মর্মস্পর্শী চিঠিটি লেখেন সেটিও বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। হেস্টিংস কর্ণপাত করেননি। একশো বছরের যুদ্ধের স্মৃতিদীর্ণ ফরাসি-ইংরেজের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বই হয়তো এর কারণ। পরে ৪০ জন ফরাসি বন্দির সঙ্গে তাঁকে কলকাতার 'নতুন জেলে' পাঠানো হয়। ভারততত্ত্ববিদ জাঁ ফিলিওজার মতে, তাঁদের জেলে পাঠানোর একটি সম্ভাব্য কারণ সিন্ধিয়া ও নিজামকে উপলক্ষ করে ভারতের ইংরেজ ও ফরাসিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যাই হোক, ১০ মার্চ ১৭৮১ কারাগারে পৌঁছনোর দিনই তেইশ জন কারাবন্দির সঙ্গে অসমাপ্ত কারাগৃহের দোতলায় বসে, তিনি একটি অভিধান রচনা শুরু করে ৩১ আগস্ট শেষ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজও জানা যায়নি, তিনি কবে কোথায় জন্মেছিলেন, তিনি ফ্রান্সের কোন অঞ্চলের মানুষ, কবে ও কেন এদেশে এসেছিলেন। তাঁর অসাধারণ গবেষণাপত্রে ('অনুষ্টুপ,' শীত সংখ্যা ১৯৯২, পৃ ৪৬-৮৮) প্রতাপ দে'র অনুমান ১৭৭৮ সালে ওসাঁ ভারতে ছিলেন পঁচিশ বছর, অর্থাৎ তিনি এদেশে এসে থাকবেন ১৭৫৩ নাগাদ যখন তাঁর বয়স ৫-১০ বছর। দেশে ফিরে কি তিনি জনসমুদ্রে হারিয়ে গেলেন? তিনি কি ফরাসি বিপ্লব দেখেছিলেন? তিনি নিজেই কি পাণ্ডুলিপিগুলি বিবলিয়তেক নাসিওনাল দ্য পারিতে জমা দিয়েছিলেন? তাঁর সম্পর্কে ইংরেজদের মন্তব্যগুলিও বেশ মজার: 'সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষ, কিছু দক্ষতা আছে, হাঙ্গামাসৃষ্টির লোক নয়' (not troublesome)। অথবা 'সংযত ব্যক্তি' বা 'শান্ত মানুষ', কারারুদ্ধ অবস্থায় মেজাজ বিগড়ে যাওয়ায় ইংরেজদের সম্পর্কে তিক্ত কথা বলেন! ইংরেজদের সম্পর্কে তিক্ততার ব্যাপারটি অবশ্য ঐতিহাসিক ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যৎসামান্য তথ্যের ভিত্তিতে ফ্রাঁস ভট্টাচার্য শুধু এটুকু জানাতে পেরেছেন আমাদের: 'আর দশ জনের মতো তিনি ভাগ্যান্বেষী বা ভাড়াটে সৈনিক ছিলেন না। তাঁর অধিকৃত পদ, পারিবারিক যোগাযোগ বিবেচনা করে বলতে হয় যে বাংলায় ফরাসি জনসমষ্টির মধ্যে তিনি ছিলেন একজন যথার্থ ভদ্রলোক।'

ওসাঁ যখন কাজ শুরু করেন ইংলন্ডে উইলিয়াম কেরির বয়স তখন কুড়ির নীচে, আর জন মার্শম্যান জন্মাবেন প্রায় দেড় দশক পরে। ফার্সি তখনও রাজভাষা। ফার্সি, আরবি, পোর্তুগিজ, ইংরেজি ও সংস্কৃতের চাপে বাংলার স্থান বেশ নীচে। শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন, হ্যালহেডের ব্যাকরণ প্রকাশিত হওয়ার সময়ও অনেকেই জানত না বাংলা বলে একটি ভাষা আছে, কিংবা থাকলেও সেটা 'পাতোয়া' ছাড়া অন্য কিছু।

বহুদিন পরে ১৮২১ সালে কলকাতায় রামকৃষ্ণ সেন রোমান হরফে ইংরেজি, ফরাসি ও বাংলার একটি অভিধান প্রকাশ করেন, যেটির একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। রামকৃষ্ণ সেন ওসাঁর কথা শুনেছিলেন কি না আমরা জানি না।

শব্দসংগ্রহের ফ্যাকসিমিলি দেখে মনে হয়, ওসাঁ রোমান হরফে খসড়া করতেন, পরে তা কোনও লিপিকরকে দিয়ে বাংলায় লিখিয়ে নিতেন। প্রকাশিত শব্দকোষটির লিপিকর 'কীসোর ঘোষ'। মোট অন্তর্ভুক্তি প্রায়

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১০০। ভারতে জীবনযাত্রায় এক ইওরোপীয়ের ব্যবহার্য দৈনন্দিন শব্দের ওপর ঝোঁক খুব স্পষ্ট, কিন্তু সেইসঙ্গে একজন বাঙালির ফরাসি শিক্ষার পক্ষেও আদর্শ বলা চলে। মনে রাখতে হবে, তেমন কোনও আদর্শ ফরাসি বাংলা শব্দকোষও আজও প্রকাশিত হয়নি। যেহেতু বাংলা শব্দ ও বাক্যাংশ বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রথমে সাজানো হয়েছে, মনে হয় বাঙালিদের মধ্যে ফরাসির প্রচার অভিধানকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি তৎসম শব্দ বা ধর্মীয় বচনকে পরিহার করছেন, প্রচলিত সজীব বাগ্‌ধারার দিকে তাঁর দৃষ্টি। হ্যালহেডের মতো ওসাঁও সম্ভবত বুঝেছিলেন বাংলার সরল উপযোগিতার দিকটির কথা। ফার্সির পল্লবিত রূপের তুলনায় বাংলার সাদামাটা রূপ স্বাভাবিকভাবেই হ্যালহেডকেও বেশি আকৃষ্ট করেছিল।

তৎকালীন চল অনুযায়ী 'স' হয়েছে 'ছ', 'ভ' হয়েছে 'ব'। ফলে 'ব্লাঁশিসর' (ধোবা) হয়েছে 'বেলাসিছর', 'নেসাঁস' (জন্ম) হয়েছে 'নেয়ছাচ', 'পার ইসি' (এখানে) হয়েছে 'পারইছে'। লিপিকরের নিজস্ব মুদ্রাদোষ প্রায়শই চোখে পড়ে। কখনও কখনও ঠিক জায়গায় চন্দ্রবিন্দু পড়েনি, ফলে 'রেপারাসিয়ঁ' হয়েছে 'রেপারাঁসিয়', 'কুপে' হয়েছে 'কুঁপে'। মাঝে মাঝে লিপিকর ভুল কপি করেছেন। 'এপিসিরি' নয়, 'এপিকিরি' হতে পারে, যদিও শুদ্ধ উচ্চারণ 'এপিস্‌রি'। 'পোয়াভর' (মরিচ) হয়েছে 'পুয়েব্র', 'ভিজ়াজ়' (মুখ) হয়েছে 'বিজাজ', 'পুরকোয়া' (কেন) হয়েছে 'পোর কোয়ায়'। 'কাচী (কাঁচি)-র ফরাসি প্রতিশব্দ 'সিজো'-র জায়গায় ইংরেজি 'সিজার' ঢুকে পড়েছে। 'কাঁকড়া'র ফরাসি 'ক্রাব'-র সঙ্গে ফরাসি কণ্ঠস্বরে 'কাঁকড়া'র বিকৃত রূপ 'ক্যাঁকড়া'ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কৃষ্ণপ্রেমী (শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তারণকর্তা দিয়ে শব্দকোষ শুরু) বাঙালি লিপিকর 'কামান'-এর ফরাসি 'কানঁ'-কে করেছেন 'কানু'। 'ভাশ' (গোরু) হয়েছে 'বাঁস'। লিপিকর ওসাঁর কাছে কিছুটা ফরাসি শিখে থাকবেন, কিন্তু তাতে দু'-চারটি ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা ছিল। যেমন Oreille (কান)-এর উচ্চারণ 'অরেল' নয়, 'অরেই'। কখনও 'করি নাই আমি' আর 'করিয়াছিল'-র ফরাসি অনুবাদ জায়গা বদল করে ফেলেছে। লিপিকরের এরকম ছোটখাটো ভুলে কিন্তু ওসাঁর অভাবনীয় কৃতিত্ব বিন্দুমাত্র ম্লান হয় না। এই অনবদ্য প্রয়াসের সিংহভাগই চমকে দেওয়ার মতো। মাঝে মাঝে ফরাসি শব্দের নিখুঁত প্রতিবর্ণীকরণে আশ্চর্য হতে হয়। বাংলায় 'u' ধ্বনি, ফরাসি জিহ্বায় যা ই

এবং উ-র মিশ্রণ, আনতে গলদঘর্ম হয়ে শেষ পর্যন্ত 'য়্যু' লিখে সন্তুষ্ট হয়েছি আমরা। কিন্তু এই সমস্যার একটি বিস্ময়কর রকম সহজ সমাধান করেছেন ওসাঁ: 'ধুয়া' (ধোঁয়া)-র ফরাসি 'ফ্যিমে' লিখে।

শব্দকোষটির প্রথম অন্তর্ভুক্তিটিই সবচেয়ে কৌতুককর: 'কর্তব্য নয়', অর্থাৎ 'এ আমার কাজ নয়'। আঠারো শতকেই বাঙালির জীবনদর্শনের একেবারে সার কথাটি ধরে ফেলেছিলেন ওই পারমিতাদীপ্ত নিঃস্বার্থ ফরাসি যুবক।

২০০৪

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন পৃথিবীর নতুন মানবী: জর্জ সাঁদ

'যে-শিকলগুলো তোমাদের সমাজের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে সেগুলোকে ভেঙো না। যদি তা তোমাদের রক্ষা করে, তার নিয়মগুলোকে মেনে চলো। কিন্তু যদি একদিন সমাজ তোমাদের ওপর কালিমালেপন করে ও তোমাদের দূরে ঠেলে দেয়, তাকে প্রত্যাখ্যান করার মতো আত্মাভিমান বজায় রেখো।' মেয়েদের উদ্দেশে বলেছিলেন জর্জ সাঁদ।

কে এই জর্জ! মনে পড়ছে দু' দশক আগে একটি ফরাসি ছবির নাম ছিল 'George qui?' (George who?) সাধারণ মানুষ তাঁর খবর রাখে না, আর নারীভাবুকদের কাছে তিনি একটি নাম মাত্র।

পুরুষ নয়, পুরুষের পোশাকে এক নারী, যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত নারীবাদের আবির্ভাবের বহু আগে ধরে ফেলেছিলেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একচোখো অন্ধতার দিক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও রচনায় অপ্রত্যাশিত ভাবে তুলেছিলেন এমন সব নতুন প্রশ্ন যা তাঁর আগে কেউ তোলেনি, যা কাঁপিয়ে দিয়েছিল বিপ্লবোত্তর ফরাসি সমাজব্যবস্থার ভিত। তাঁকে কেউ ডেকেছে ফরাসি বিপ্লবের অগ্নিকন্যা বলে। কেউ তাঁকে তুলনা করেছেন শৌচালয়ের সঙ্গে, যেমন শার্ল বোদল্যের। তাঁকে সম্মান করেছেন উনিশ শতকের চার মহত্তম ঔপন্যাসিক ও জীবনশিল্পী বালজাক, ফ্লবের, তলস্তয় ও দস্তয়েভ্স্কি। তাঁর অসংখ্য প্রেমপ্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং সংগীত-রচয়িতা ফ্রেদেরিক শোপ্যাঁ ও বিশিষ্ট রোম্যান্টিক কবি আলফ্রেদ দ্য ম্যুসে। জর্জ হেনরি লুইস নামে এক সমালোচক তাঁকে শতাব্দীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখক বলে চিহ্নিত করেন।

সারা উনিশ শতক জুড়ে জর্জ সাঁদ (১৮০৪-৭৬) বিরাজ করেছিলেন ঠিক ভিক্তর য়্যুগোর (১৮০২-৮৫) মতো। কাছ থেকে দেখেছিলেন শাতোব্রিয়াঁর রোম্যান্টিক রচনা 'রনে' থেকে এমিল জোলার ন্যাচরলিস্ট উপন্যাসমালা 'রুগোঁ-মাকার', ফরাসি বিপ্লবের চিত্রশিল্পী দাভিদ থেকে ইমপ্রেশনিস্ট এদুয়ার মানে, জুলাই ১৮৩০-এর ব্যারিকেড থেকে কমিউন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত। তিনি শুধু লেখক নন, তিনি এক সৌধ।

হয়তো ইংরেজি সাহিত্যের পাঠকদের মনে পড়বে অন্য এক জর্জের কথা, তিনিও নারী। তাঁর ছদ্মনাম জর্জ এলিয়ট, আসল নাম মেরি অ্যান ইভান্স্। আমাদের এই ফরাসিনী জর্জ জন্মেছিলেন ইংরেজ নারী জর্জ এলিয়টেরও পনেরো বছর আগে, মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের তেতাল্লিশ আর জেন অস্টিনের সাতাশ বছর পরে, শার্লট ব্রন্টের বারো বছর আগে, রাসসুন্দরী দেবীর পাঁচ বছর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ছেচল্লিশ, স্বর্ণকুমারী দেবীর একান্ন, তরু দত্তের চুয়ান্ন, নটী বিনোদিনী আর ইন্দিরা দেবীর ঊনষাট বছর আগে। আর 'নিজস্ব এক ঘর'-এর রচয়িতা ভার্জিনিয়া উল্ফ্ জন্মাবেন তাঁর আটাত্তর বছর পরে। এই তারিখগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো থেকে ফুটে উঠছে আবহমান সমাজভাবনার বিপরীতমুখী এক বিন্যাস। অন্য এক আত্মনগ্নায়ন।

তাঁর আসল নাম ল্যুসিল ওরোর দ্যুপ্যাঁ, যে মরে গিয়ে জন্ম দিল বিদ্রোহিনী জর্জ সাঁদকে। ফরাসি উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুযায়ী অবশ্য সাঁ-ই হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি নিজেকে বলতেন সাঁদ। নিয়মভাঙা শুরু হল নাম থেকে, নামের উচ্চারণ থেকে।

প্যারিসে জন্মালেও নোয়াঁ অঞ্চলে দিদিমার গ্রামের বাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন ল্যুসিল ওরোর। ১৮২২ সালে সতেরো বছর বয়সে ব্যারন কাজিমির দুদভ্যাঁর সঙ্গে গ্রামের মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়। সামাজিক নিয়মের নিগড়ের সঙ্গে সেই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। গ্রামাঞ্চলের দৈনন্দিন ক্লান্তিকর জীবন কাটাতে কাটাতে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সমাজের একটি অন্তঃমানচিত্র। স্থূল, নারীশিকারী স্বামীটির সঙ্গে স্বপ্নিল মেয়েটির দূরত্ব বাড়ছিল, শেষে তা এক অন্ধ গলিতে গিয়ে পৌঁছোল। শতকরা একশো জন মেয়ের মতো সেও সমাজের অন্ধত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারত, যতই কঠিন হোক সেই কাজ, কিন্তু সে গেল একেবারে বিপরীত পথে, এক বিপরীত অক্ষরেখায়।

বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের তরুণী কন্যাটি আস্তে আস্তে হয়ে উঠছিল 'ইন্টেলেকচুয়াল'। সে পড়ছিল দর্শন ও কবিতা, বিশেষ করে রুসো, শাতোব্রিয়াঁ আর বায়রনের লেখা। এই পথপ্রদর্শকেরা কেউই নারীর দাসত্বের কথা, নিঃশব্দ যন্ত্রণার কথা আলাদা করে বলেননি। তাঁরা বিদ্রোহ

ও স্বাতন্ত্রের ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন। ল্যুসিল ওর‍্যোর দ্যুপ্যাঁ তাঁদের কাছে শিখলেন এক নতুন বচনের অমিত সম্ভাবনার কথা যা প্রচলিত চিন্তার কাঠামোতে আনতে পারে আমূল পরিবর্তন। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের রক্তের অন্তর্গত ঝোঁকের কথা বলতে গিয়ে ল্যুসিল বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন। হাত থেকে খসে পড়ল ঘরকন্নার প্রতীক সেলাইয়ের সরঞ্জাম। প্যারিসের লাতিন কোয়ার্টারে কালো চুরুট ঠোঁটে নিয়ে 'কোরকের আবরণ টুটি' আবির্ভূত হলেন এক নতুন মানুষ।

এক নতুন মানুষ, ভবিষ্যতের এক নতুন পৃথিবীর নতুন মানবী। পরনে রুক্ষ ধূসর পোশাক, উলের বিরাট এক টাই, তাঁর নিজের ভাষায়, এক প্রথম বর্ষের ছাত্রের মতো দেখতে। তাঁর প্রথম সহযোগী ও প্রেমিক জ্যুল সাঁদো-র নাম কেটেছেঁটে ল্যুসিল ওরোর দ্যুপ্যাঁ বারণ দ্যুদভাঁ নিলেন এক পুরুষ-নাম: জর্জ সাঁদ।

ফ্রান্সে তখন ক্লাসিসিজ্‌ম ও রোম্যান্টিসিজ্‌মের বিতর্ক সূচিত করেছে ভিক্‌তর য়্যুগোর নাটক 'এরনানি' (১৮৩০) ও 'ক্রমওয়েল' (১৮২৭)। প্রকাশিত হওয়ামাত্র জনপ্রিয় হয়েছে তাঁর উপন্যাস 'নত্র-দাম দ্য পারি' যা 'হাঞ্চব্যাক অফ নত্র-দাম' নামে আমাদের কাছে পরিচিত (১৮৩১)। ১৮৩১ সালে যখন সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করলেন ওই মানবী তখন তাঁর প্রতিযোগী এক চোখ-ধাঁধানো প্রজন্ম: ভিক্‌তর য়্যুগো, আলফ্রেদ দ্য ম্যুসে, প্রসপের মেরিমে, স্তাঁদাল, বালজাক, স্যাঁৎ-বভ, ফ্লবের, বোদল্যের। প্রথমে প্রেমিক জ্যুল সাঁদো-র সঙ্গে একযোগে লিখলেন 'রোজ এ ব্লাঁশ' ('গোলাপি ও শাদা') নামে এক উপন্যাস। পরের বছর নিজেই লিখলেন এক উপন্যাস, 'অ্যাঁদিয়ানা'।

শুধু কলম নয়, শরীরমন দিয়েও লিখলেন এক ঐতিহাসিক বিবৃতি। বিশ্বসাহিত্যে এতজন প্রেমিক ও বন্ধু একাটি শিখার চারপাশে পতঙ্গের মতো ঘোরেনি কখনও। একই সঙ্গে সমসময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ম্যুসে ও সংগীতকার শোপ্যাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা সহজ কথা নয়।

যে বছর পরিবার ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্যারিসে উপস্থিত হলেন সাঁদ, সে বছরই তিনি লেখার সুযোগ করে নিলেন 'ল্য ফিগারো'-র মতো প্রভাবশালী কাগজে। 'লা রভ্যু দে দো মঁদ'-এ লিখলেন ন'বছর ধরে, 'লা রেপ্যুবলিক'-এ লিখলেন (১৮৪৮) এবং 'রভ্যু অ্যাঁদেপাঁদাঁত'-এর

সহ-সম্পাদনা করলেন এক বছর (১৮৪১)।

১৮৩২ সালে 'অ্যাঁদিয়ানা' উপন্যাস প্রকাশ হওয়া মাত্রই প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিলেন সকলের দৃষ্টি। সে বছরই পরপর বেরোল 'ভালাঁতিন' ও 'ল্যলিয়া'। 'অ্যাঁদিয়ানা' পড়ে আলফ্রেদ দ্য ম্যুসে জর্জ সাঁদকে চিঠি লিখলেন, যার থেকে শুরু হল তাঁদের দু'জনের দুর্মর প্রেম।

তেত্রিশ বছর বয়সে আরেক আশ্চর্য প্রেম। এবার পোলিশ সংগীতকার শোপ্যাঁর সঙ্গে। জর্জ সাঁদ ও শোপ্যাঁর কিংবদন্তীপ্রতিম ভালবাসা (১৮৩৮-৪৭) উনিশ শতকের এক শ্রেষ্ঠ প্রেম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রথমে শোপ্যাঁর সাঁদকে ভাল লাগেনি। বলেছিলেন: 'ওর মধ্যে কিছু একটা আছে যা আমি সহ্য করতে পারি না।' তবু এক দশকে ভেঙে গেল সেই জুড়ি। কেউ কেউ বলেছেন, সাঁদের মনে হয়েছিল শোপ্যাঁ তাঁর কন্যা সোলাঁজের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তবে কি তাঁরও মনে ছিল ঈর্ষা? সোলাঁজ-কে শিক্ষা দেওয়াই কি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল?

যাঁদের সঙ্গে মিশেছিলেন জর্জ সাঁদ তাদের অনেকের ভাবনাচূর্ণন মিশে গিয়েছিল তাঁর রচনার আঁশে। তিরিশের দশকে কয়েকজন শিল্পী যখন কঁৎ দ্য স্যাঁ-সিমঁ-র নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সমাজকে শোধনের আহ্বানে সাড়া দিলেন, জর্জ সাঁদ যোগ দিলেন তাতে। স্বয়ং ফ্রান্স লিস্ট হয়ে উঠলেন তাঁর বন্ধু। বন্ধু হলেন বিপ্লবের প্রখ্যাত সমর্থক মিশেল দ্য বুর। আর তাঁর বন্ধু পিয়ের ল্যরু, যিনি সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে আর নারীর সমান অধিকারের পক্ষে কথা বলছিলেন। বলছিলেন প্রয়োজন হলে শয়তানকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

ফরাসি সেনেট ফ্রান্সের গ্রন্থাগারগুলিতে জর্জ সাঁদের বইয়ের উপস্থিতিতে চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ। নিমফোমেনিয়া ও সমকামিতার অভিযোগ উঠছে বারবার। আসলে সুখের সংজ্ঞা বদলে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন সরল উপন্যাসের জায়গায় মানবী অনুভূতি ও প্রেমের কথা পৌঁছে দেওয়ার সময় হয়েছে। তাঁর ভাষায়, 'বাস্তবের পাঠ নয়, এক আদর্শ বাস্তবের অনুসন্ধানই শিল্পের উদ্দেশ্য।' ('L'art n'est pas une étude de la réalité positive; c'est une recherche de la vérité idéale.')

বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বন্ধুত্বের খবরে ফরাসি সমাজের মনোজগৎ উথালপাথাল হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

বোদল্যেরের প্রতিক্রিয়া এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। একই সঙ্গে ভালবাসা ও নিন্দের এমন উদাহরণ সাহিত্যের ইতিহাসে বেশি নেই। যদিও অনেকেরই সাঁদের সমতুল্য আরেক নারী বিংশ শতাব্দীর তসলিমা নাসরিনের নাম মনে পড়বে।

একদিকে femme fatale, অন্যদিকে ভাঙচুর করে দেওয়া এক বিদ্রোহিনী। তাঁর উপন্যাস যে সম্পূর্ণ নতুন ভাষার কথা বলবে তা তো স্বাভাবিক, কিন্তু কর্মকাণ্ড তাঁকে আরও বেশি করে পুরাণকথায় পরিণত করেছে। অন্যদিকে, বোদল্যের কথিত 'la femme Sand', যিনি মিশেল দ্য বুর ও পিয়ের ল্যরুর শিষ্যা, প্রতিবাদীদের গ্যালারিতে যাঁর অবস্থান, সশস্ত্র যাঁর ভূমিকা।

এছাড়াও আর এক সাঁদ। শেষ বয়সে যিনি নয়া রুসোপন্থী। অন্যের কণ্ঠস্বর অতিক্রম করে, অন্যের প্রভাব আত্মস্থ করে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে উঠছিল চল্লিশের দশক থেকেই 'দ্য মিলার অফ আজ্যাঁবো', 'কনসুয়েলো' ও 'লা কঁতেস দ্য রুদেলস্টাট'-এর মতো উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসে এসে পড়ছিল ছোটবেলার গ্রাম-জীবনের প্রতিধ্বনি। পাঠকেরা বুঝতে পারছিলেন, ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিকে সংহত করে নিচ্ছেন সাঁদ। যৌনতার তৃষ্ণার জায়গা নিচ্ছে বিধ্বস্ত সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার তাড়না। রোম্যান্টিক কবি-প্রেমিক ম্যুসের আলেকসান্ড্রাইন বা সংগীতস্রষ্টা শোপ্যাঁর নকটার্নকে অনুপ্রাণিত করার চেয়ে বড় কোনও আকাশের স্বপ্ন তাঁকে তখন বাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বিখ্যাত সমালোচক-বন্ধু স্যাঁৎ-ব্যভকে ধমক দিয়ে লিখেছিলেন সেই ১৮৩৪ সালে:

> অন্যেরা যা ইচ্ছে করুক। কিন্তু বন্ধু, তুমি এমন একটা বই লেখো যা মানবজাতিকে বদলে দেবে, মানবজাতির উন্নতি ঘটাবে। বুঝতে পারলে? তুমি পারো, সুতরাং তোমার লেখা উচিত। হায়! বেচারি! আমি নিজে যদি পারতাম! আমার আবার মাথা তুলে দাঁড়ানো দরকার, নয়তো আমার বুক ভেঙে যাবে! বৃথাই আমি খুঁজে চলেছি এক ধর্মকে: সেই ধর্ম কি ঈশ্বর, প্রেম, বন্ধুত্ব, সর্বমানবের মঙ্গল? আমার ভয় হচ্ছে যে আমার আত্মা একটিকেও বাদ না দিয়ে এর সবগুলোকেই চাইছে!

এই নতুন মানবীর নতুন ধর্মের নাম 'la religion de l'humanité' (মানবজাতির ধর্ম)। তাঁর কথায়, 'সবার সুখ চাই, যাতে কিছু মানুষের সুখ ঈশ্বর-অভিশপ্ত এক অপরাধ হিসেবে না গণ্য হতে পারে!' শেষ জীবনটা সমাজবাদের আদর্শে উৎসর্গ করলেন জর্জ সাঁদ। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর বিষণ্ণ সাঁদ ফিরে গিয়েছিলেন নোয়াঁয়। ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত বাসা বেঁধেছিলেন ভের্সাইয়ের কাছে পালেজো-তে। তাঁর আঁকা গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে অবশ্য এমিল জোলার বাস্তবতা মিলবে না। কিন্তু এক ঝোড়ো জীবনের শেষে জর্জ সাঁদ সত্যিই গাঁয়ের শান্ত সরলতাকে ভালবেসে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন।

'মাদাম বোভারি' (১৮৫৭)-র মতো যুগান্তকারী নারী-উপন্যাসের রচয়িতা গ্যুস্তাভ ফ্লবেরের সঙ্গে সাঁদের যে বন্ধুত্ব হবে তা স্বাভাবিক। একদিকে ফরাসি বিপ্লবের কন্যা জর্জ সাঁদ, আর অন্যদিকে ফ্রান্সে সেকেন্ড এম্পায়ারের অতৃপ্ত সন্তান ফ্লবের। এদের দীর্ঘ পত্র-বিনিময় উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের সাহিত্য ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে আছে। তাঁদের মতের মিল ছিল না, ফলে চিন্তার সংঘাতে সেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল যা জর্জ সাঁদ সারা জীবন ধরে চেয়েছিলেন।

আমরা সেই চিঠিপত্র থেকে জর্জ সাঁদের দু'-তিনটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে দিচ্ছি:

> পাল তোলা বিরাট জাহাজে উঠব না জেলেডিঙিতে উঠব, তা নির্বাচন করে নেওয়ার অধিকার সকলের আছে। শিল্পী হলেন সেই অভিযাত্রী যাকে কিছুই থামাতে পারে না। সে ডানদিকে ফিরছে না বাঁদিকে, তাতে ভালমন্দ কিছু এসে যায় না, উদ্দেশ্যটাই আসল।

> না, কোনও তত্ত্ব নেই আমার। আমি জীবন অতিবাহিত করেছি শুধু প্রশ্ন তুলে আর কোনও না কোনও উত্তর শুনে, যদিও সমাধান খুঁজে পাওয়ার মতো স্পষ্ট উত্তর কখনও পাইনি। আমি নতুন এক ধীশক্তি ও শরীরের এক নতুন উজ্জ্বলতার জন্য অপেক্ষা করে আছি, কারণ এই জীবনের যে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই শেষ পর্যন্ত দু'দিক রক্ষা করে চলতে হয়।

আমি নর্দমা থেকে পালিয়েছি শুকনো আর পরিষ্কার জায়গার খোঁজে। জানি সেটাই জীবনের নিয়ম। মানুষ হয়ে জন্মানো তো বিরাট কিছু ব্যাপার নয়। আমরা এখনও বাঁদরদেরই কাছাকাছি আছি যাদের থেকে আমাদের উৎপত্তি বলে শোনা যাচ্ছে।

১৮৪৭ সালে মধ্যবয়সে লিখতে শুরু করা তাঁর আত্মজীবনী 'Histoire de ma Vie' (আমার জীবনকাহিনি)-র এপিগ্রাফে হাজার কুৎসা ও কুব্যাখ্যার জট ছাড়িয়ে তিনি তাঁর জীবনদর্শনকে স্পষ্ট করে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন:

Charité envers les autres
Dignité envers soi-même
Sincerité devant Dieu
(অন্যদের প্রতি দাক্ষিণ্য
আত্মমর্যাদা
ঈশ্বরের সামনে আন্তরিকতা)

রুসোর 'কনফেশন্‌স্'-কে নতুন করে লিখতে চেয়েছিলেন জর্জ সাঁদ। কালপুরুষ জানে, তিনি তা পেরেছিলেন।

আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা ওই মানবীই বলতে পারেন, যেমন বলেছেন ১৮৩৭ সালে লেখা 'মোপ্রা' উপন্যাসে: 'জীবনের একটি পৃষ্ঠাও আমরা ছিঁড়ে ফেলতে পারি না। কিন্তু গোটা বইটা আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি।'

জর্জ সাঁদের সারা শরীরে হাজার বছরের ক্ষত। পায়ের নীচে পড়ে আছেন শোপ্যাঁ ও ম্যুসে। নৈতিকতা ও অনৈতিকতার পুরুষতান্ত্রিক মাপকাঠিগুলো এলোমেলো করে দিয়েছিলেন বলে স্বয়ং শার্ল বোদল্যেরের মনে হয়েছিল তিনি শিল্পীই নন ('elle n'a jamais été artiste'), তিনি 'নির্বোধ' ও 'বাচাল', 'দারোয়ান ও বেশ্যাদের মতো বিচারশক্তির গভীরতা ও অনুভূতির সূক্ষ্মতা! অনেক পুরুষ যে এই শৌচালয়ের প্রেমে পড়েছে, সেটা শতাব্দীর অধঃপতনের প্রমাণ!' তিনি নাকি এক স্থূল পশু (grosse bête) যিনি লোকচক্ষুর সামনে থাকতে চান।

তিনি নাকি possessed ('possédée')। আর অন্যদিকে, তাঁকে সম্মান করেছেন তলস্তয়, দস্তয়েভ্স্কি! পরবর্তী শতাব্দীতে তাঁর পথে হেঁটেছেন কুসুমবন থেকে বেরিয়ে আসা ভার্জিনিয়া উল্ফ্, সিমন দ্য বোভোয়ার ও নতুন নারীবাদীরা।

সাঁদের এসব স্তুতি ও নিন্দেয় কিছু যায় আসেনি। তিনি তাঁর এক সমালোচককে লিখেছিলেন: 'একদিন পৃথিবী আমায় জানবে, বুঝবে। কিন্তু তেমন দিন যদি নাও আসে, সত্যিই কিছু যায় আসে না। আমি অন্য মেয়েদের জন্য পথ খুলে দিয়েছি।'

২০০৪

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালার্মে-কাহিনি

যদিও প্রতীকবাদ আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানিত আন্দোলনগুলির একটি, পৃথিবীতে খুব কম অভিধাই এতটা অনিশ্চয়তা আর দ্বিধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। 'প্রতীকবাদ'? শুনে আঁতকে উঠেছিলেন ভেরলেন, 'জানি না তো! মনে হচ্ছে কোনও জার্মান শব্দ।' গভীরভাবে স্বতন্ত্র এই আন্দোলনের শিকড় যদি নেমে যায় জার্মান রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌-এ, হেগেল ও শোপেনহাওয়ারের দর্শনে, সুইডেনবর্গের মিস্টিক রচনায়, ইংরেজি প্রি-র‍্যাফেলাইটিজম্‌, এডগার অ্যালেন পো বা ভাগনারে, এর জন্ম নিশ্চিতভাবে ফরাসি।

১৮৮০ সাল নাগাদ বাস্তবসম্মত শিল্পসাহিত্যের যথাযথ বর্ণনার বিরুদ্ধে তরুণদের মনে দানা বাঁধছিল এক মানসিক প্রতিক্রিয়া, যা এক গা-শিরশিরানি (un frémissement)—অবক্ষয়ী সাহিত্য সম্পর্কে এক ক্লান্তি। তাঁরা নিজেদের মধ্যে এক ঐক্য অনুভব করেছিলেন, একই সঙ্গে তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে তাঁরা আধুনিক আক্রমণাত্মক (ও মুগ্ধতাময়) জগতের কারাগারে বন্দি। তখনও তা 'প্রতীকবাদ' হয়ে ওঠেনি। অবক্ষয়ের একটা বোধ মাত্র। কাফেগুলিতে ক্লাব তৈরি হচ্ছিল— Hydropathes, Hirsules, Zutistes, Je m'en foutiste। রোদলফ্‌ সালিস তৈরি করলেন কালো বেড়ালের ক্যাবারে (১৮৮১)। প্রতিষ্ঠান-বিরোধী পত্রপত্রিকা বেরোতে লাগল। যেমন *Lutèce, La Nouvelle Rive gauche*। আলফঁস আলে ও শার্ল ক্রো যুক্ত করলেন অ্যাবসার্ডিটির মাত্রা। মরিস রলিনা-র 'নিউরোসিস' (১৮৮৩) ও জ্যুল লাফর্গের 'নালিশ' (১৮৮৫) উদ্বেগের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা প্রকাশ করল।

অবক্ষয়েরও ছিল গুরু ও আদর্শ। পল বুর্‌জে তাঁর 'বর্তমান মানসিকতার' প্রবন্ধগুলি উৎসর্গ করলেন স্তাঁদাল, তেন, রনাঁ, ফ্লবের ও বোদল্যেরকে। ১৮৮৪ সালে ভেরলেন তাঁর 'অভিশপ্ত কবিরা' (Poètes maudits) নামক সংকলনে পরিচয় করিয়ে দিলেন মালার্মে, করবিয়ের ও র‍্যাঁবোকে। পাঠকের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসা বিদ্যুৎতরঙ্গের কথা একবার ভাবুন।

যাঁরা 'প্রতীকবাদ'-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৮০-৮৫-র সত্তার সংকটকে কমবেশি অনুভব করতে পেরেছিলেন। অসকার মিলজের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামই ছিল 'অবক্ষয়ের কবিতা'। অবশ্য সামগ্রিক এই অবক্ষয়ের অনুভূতি ১৮৮৫ সাল নাগাদ কমে আসছিল, যদিও আনাতোল বাজ্যু, ভেরলেনের সহায়তায় এই অবক্ষয়ী আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তরুণ কবিরা ৮৭, রু্য দ্ রোমের বাসায় মালার্মের (পল ক্লোদেলের ভাষায়, 'la fleur suprême de Paris'—'প্যারিসের শ্রেষ্ঠতম ফুল') মঙ্গলবারের আড্ডায় যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন মতবাদ ও নন্দনতত্ত্ব তৈরি হল। তাঁরা শিখলেন তাঁদের আকাঙ্ক্ষার নাম দিতে, অতিরিক্ত সূক্ষ্মতা ও তাৎক্ষণিক ঘৃণাকে অতিক্রম করে কবিতার একটি আধিবিদ্যক ভিত্তি খুঁজে নিতে। তাঁরা মনে রেখেছিলেন গুরুর কথা: শিল্প হবে বাতাস-রুদ্ধ (hermétique) এবং শুধুমাত্র দীক্ষিতদের জন্য খোলা।

এটা ছিল বাস্তবতার বিরুদ্ধে, বহিরঙ্গের ক্লান্তিকর নিখুঁত বর্ণনার বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া। সরাসরি বিবরণের ও তুলনার পরিবর্তে তাঁরা জোর দিলেন ইশারার দিকে। মালার্মের ভাষায়, 'জিনিসটিকে আঁকা নয়, জিনিসটির ফলশ্রুতিকে আঁকা।' প্রতীককে দেওয়া হল বস্তুপৃথিবী ও পরাবাস্তবের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম মিলকে ছোঁয়ার দায়িত্ব। কোনও মতবাদের চেয়ে চুল্লির পাশে বসা মালার্মে-ভক্তরা যেটা চেয়েছিলেন সেটা হল পৃথিবী ও নিজেদের সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গি (une attitude face au monde et à soi-même)। মালার্মে ছাড়াও তাঁরা ফিরলেন 'আক্সেল'-এর লেখক ভিলিয়ে দ্য লিল-আদামের দিকে, যিনি লিখেছিলেন, 'আমাদের বসবাসের পৃথিবী একটা স্বপ্ন, যেখানে আমরা ফুটিয়ে তুলি 'আমার' প্রতিফলন।' ১৮৮৫-তে প্রকাশিত 'লা রভ্যু ভাগনেরিয়েন'-এ এদ্যুয়ার দ্যুজারদ্যাঁ ও 'দ্রাম ম্যুজিকাল' বা 'সংগীতনাট্য' পত্রিকায় এদ্যুয়ার শুরে নানান শিল্পের মধ্যে মৌলিক সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। বোদল্যের অনেক আগেই শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছিলেন ভাগনারকে, মালার্মেও। বোদল্যেরের মতে, স্বপ্নে ছিন্ন হয়ে যাওয়া অন্ধকারের গভীরতাকে এঁকেছিলেন ভাগনার। তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন অনুভূতির অপ্রকাশ্য অংশকে। বোদল্যের জানতেন ভাগনার প্রভাবিত করতে চলেছেন নতুন সাহিত্যকে। 'শেষ পর্যন্ত তো ধারণাটিকে ছুঁড়ে দেওয়া গেল...'

১৮৮৬-র ১৮ সেপ্টেম্বর জাঁ মোরেয়াস 'ফিগারো'-র সাহিত্যপত্রে লিখলেন এক নিবন্ধ, যাকে প্রতীকবাদের জন্ম-ম্যানিফেস্টো বলা চলে। এই

রচনাটি 'প্রতীকবাদ' কথাটির চারপাশে দানা বাঁধা মূল ঝোঁকগুলিকে ধরার চেষ্টা করছিল। একটি তত্ত্বকে ঘিরে এ এক প্রতিষ্ঠান নয়, এক সাধারণ বিবেকী অনুভূতির নিজেকে আবিষ্কার করে নেওয়া। স্তেফান মালার্মের উদাহরণকে পল ভেরলনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল, স্বপ্নকে জীবনের চেয়ে, সঙ্গীতকে গানের চেয়ে। তারা কবিতার এক নতুন ভাবনাকে বিস্তৃত করলেন। ভাষার ইঙ্গিতমূল্যকে তুলে ধরা হল, যার পেছনে থাকবে এক সুনিশ্চিত ওয়াকিবহাল শব্দযোজনা। র‍্যনে গিলও তাঁর 'ক্রিয়াপদের চুক্তি' (১৮৮৩)-তে মালার্মের উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চাইলেন কাব্যভাষার কাজ হল বাস্তব ও আইডিয়ার যাদুকরি মধ্যস্থতা।

টি. এস. এলিয়ট যেটিকে 'milestone' মনে করেছেন সেই আর্থার সাইমনসের 'সাহিত্যে প্রতীকবাদ' (১৮৯৯) গ্রন্থের এপিগ্রাফে উদ্ধৃত হয়েছে কার্লাইলের উক্তি: 'প্রতীকের মাধ্যমে ও ভেতর দিয়ে মানুষ সচেতন বা অবচেতন ভাবে বেঁচে থাকে, কাজ করে, হয়ে ওঠে।' প্রতীকের রয়েছে এক যৌথ অস্তিত্ব, একই সঙ্গে লুকোনো ও প্রকাশ করা। এ এক সাহিত্য যেখানে দৃশ্য পৃথিবী আর বাস্তব নয়, অদৃশ্য পৃথিবী আর স্বপ্ন নয়। বর্ণনাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়, যাতে সুন্দরকে জাদুবলে ফুটিয়ে তোলা যায়। রহস্যকে আর ভয় পাওয়ার দরকার নেই। জঙ্গলের গাছের তালিকা আর নয়। কাজেই প্রতীকবাদ বহিরঙ্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অলংকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বস্তুতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সমস্ত কিছুর সারবত্তাকে, আত্মাকে আলাদা করে নিতে হবে। কাজেই সদাসর্বদা বিভিন্ন ভাবে অবনত সাহিত্য শেষ পর্যন্ত খুঁজে নিতে পারে মুক্তি ও নির্ভেজাল কথা।

বোদল্যেরের কাছে প্রতীক হল করেসপঁদাস (প্রকৃতি এক মন্দির যার স্তম্ভেরা মিস্টিক ভাষায় কথা বলে, মানুষ অরণ্যঘন প্রতীকের ভেতর দিয়ে সেখানে পৌঁছয়)। ভেরলেনের কাছে, রঙ নয়, শুধু ন্যুয়ান্স, যেখানে 'l'indécis au précis se joint' অমীমাংসিতের সঙ্গে যুক্ত হয় যথাযথ। মালার্মের কাছে, প্রতীক হল ইশারার সাহায্যে রহস্যোদ্ধার। তাঁরা এক অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যবস্তুর মাধ্যমে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন, অনুভূতির অগম্য বাস্তবকে ছুঁতে চেয়েছেন। আগেই বলেছি, মালার্মের মতে, 'জিনিসটিকে নয়, জিনিসটির ফলশ্রুতিকে রঙ করতে হবে।' মালার্মে-শিষ্য পল ভালেরির কাছে স্নায়ুর ওপর সঙ্গীতের প্রতিফলনই প্রতীকবাদ।

১৮৮৯ সাল থেকে শুরু হল নতুন এক পর্ব। ওই বছর ছাপা হয় 'প্রতীকবাদের প্রথম অস্ত্র' নামে জাঁ মোরেয়াসের এক প্রবন্ধ-সংকলন। তাতে একটি প্রবন্ধ ছিল জর্জ ভানরের 'প্রতীকবাদী শিল্প', যা যুক্ত করেছিল আন্দোলনের নান্দনিক ভাবনার সঙ্গে একটি সর্বজনীন উচ্চভ্রু ধর্মীয় প্রতীকবাদ: 'বিশ্বচরাচর অন্য এক জগতের প্রতীক মাত্র। এটি ঈশ্বরের একটি বই।' তুলনার, প্রতীকের মাধ্যমে কবি সেই বইয়ের পাঠোদ্ধার করবেন, পৌঁছে যাবেন অলৌকিকে, রহস্যের উৎসে। 'আজকের সাহিত্য' (১৮৮৯) প্রবন্ধে কার্ল মরিস লিখলেন যে শিল্প এক নতুন মিস্টিসিজ্‌ম্‌কে ফুটিয়ে তোলে যা তুলনা ও করেস্‌পন্ডেন্সের ভিত্তিতে রচিত। ১৮৮৩ সালে বিশিষ্ট সমালোচক রেমি দ্য গুরমঁ আদর্শবাদী দর্শন ও প্রতীকবাদের অন্তর্গত মিলের মধ্যে একটি প্রক্রিয়া খুঁজে পেলেন, যাতে দ্বিতীয়টি হয়ে উঠতে পারে 'নতুন সত্যের' নান্দনিক ধর্ম। প্রতীকবাদ হয়ে উঠল বিশ্বজগতের ব্যাখ্যা ও কবিতা হল 'জ্ঞানের মাধ্যম' (moyen de connaissance)।

নতুন কিছু পত্রপত্রিকা উঠে এল, যেমন *La Mercure de France, La revue blanche, Entretiens poétiques et littéraires, La plume, l'Ermitage,* যা আগের পত্রিকাগুলির চেয়ে বেশি টিকবে। আসলেন নতুন প্রজন্মের তরুণেরা, যেমন আঁদ্রে জিদ, পল ভালেরি, পল ক্লোদেল, ফ্রাঁসিস জাম ও পল ফর। জ্যুল য়্যুরে-কৃত মতামতের গোনাগুনতিতে দেখা গেল স্বাভাবিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রতীকবাদীদের জয় সর্বত্র। সেটিকে বস্তুবাদের পরাজয় বলে গণ্য করা হল।

প্রতীকবাদের কুশীলবদের মধ্যে কোনও কোনও লেখক ছিলেন যারা স্বপ্নের হাতে আত্মসমর্পণ করে মনের অন্ধকার উৎসে অভিযান চালিয়ে ছিলেন। ভেরলেনের বিষণ্ণতা থেকে উঠে এসেছিল শোকগাথার একটি ধরন, যা প্রভাবিত করেছিল এফ্র্যায়েম মিখায়েল ও আলব্যের সাম্যাঁকে। অন্যেরা, গুস্তাভ কান, ফের্দিনাঁ এরো, আদল্‌ফ্‌ রেতে এবং জাঁ মোরেয়াস পলায়ন করলেন রূপকথাপ্রতিম ছদ্ম-মধ্যযুগীয় চিত্রকল্পে। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে স্বতন্ত্র ফ্রাঁসিস ভিলে-গ্রিফ্যাঁ, মুক্তছন্দের বিশিষ্ট কবি যাঁর আশা ও আনন্দ পলায়ন ও স্বপ্নের দিকে ধাবিত হয়নি। তবে এঁদের অধিকাংশই প্রতীকবাদ থেকে সরে যাচ্ছিলেন। ১৮৯১ সালে জাঁ মোরেয়াস প্রতিষ্ঠা করলেন রোমান ইস্কুল, স্টুয়ার্ট মেরিল বুকে আঁকড়ে ধরলেন প্রকৃতিকে, আদল্‌ফ্‌ রেতে অবস্থান

নিলেন মালার্মের বিপরীত দিকে। এঁদের অনেকেরই মালার্মের মতো গোঁড়া অনুসন্ধানী মন ছিল না। জীবনের মুখ্য প্রয়োজনের বদলে তাঁদের কাছে প্রতীকবাদ ছিল একটি রাস্তা মাত্র।

জাঁ মোরেয়াসের ম্যানিফেস্টো প্রতীকবাদী উপন্যাসের কথাও বলেছিল, যার ভিত্তি বাস্তবের এক আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে। এমনকী এদ্যুয়ার দ্যুজার্দ্যাঁর 'লে লোরিয়ে সঁ কূপে'—যেটিকে পরবর্তী কালের 'স্ট্রিম অফ কনশাসনেস' রচনাপদ্ধতির পূর্বসূরি বলা হয় এবং যেখানে ভাগনারের রচনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রয়াস ছিল—মনস্তাত্ত্বিক ইম্‌প্রেশনিজ্‌মের থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারেনি, এবং যার সঙ্গে প্রতীকবাদের রহস্যমেদুর কেলাসের তেমন কোনও মিল নেই।

প্রতীকবাদীরা থিয়েটারের সম্পর্কেও অভিভূত ছিলেন। তাঁরা এক সামগ্রিক থিয়েটারের স্বপ্ন দেখেছিলেন যার আবেদন মনের (esprit) কাছে, দৃশ্যের (spectacle) কাছে নয়। এই নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয় পল ফর প্রতিষ্ঠিত তেয়াত্র্ দার-য়ে ও বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক লুনে পো-র তেয়াত্র্ দ্য ল্যভে। ভিলিয়ে দ্য লিল-আদামের গদ্যকবিতায় রচিত চার অঙ্কের নাটক 'আকসেল' (১৮৯৪)—এক বিচ্ছিন্ন জার্মান দুর্গে প্রেম ও মৃত্যুর ভাগনারীয় বিবরণ—হয়ে উঠেছিল প্রায় উদাহরণের মতো। পরমকে খুঁজে পাওয়ার জন্য এ এক অন্বেষণের কাহিনি। কিন্তু অনেকের মতে প্রতীকবাদের নাট্যকার যদি কেউ থেকে থাকেন তিনি মরিস মেতেরল্যাঁক, যার রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণায় ভরা নাটক ফুটিয়ে তোলে এমন এক রহস্য ও বেদনা, ফুটিয়ে তোলে যা প্রতীকের জগৎকে অতিক্রম করে যায়। ১৮৯০ সালে এক অপরিচিত যুবক—পল ক্লোদেল—'স্বর্ণমস্তক' নাটকের একশো কপি প্রকাশ করলেন।

কাজেই প্রতীকবাদ নানা ধরনের ভাবনা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিল। যা তাঁদের সকলেরই মধ্যে ছিল তা হল তৎকালীন সমাজ ও দর্শন সম্পর্কে ঘৃণা। বাহ্য পৃথিবীকে অতিক্রম করে অন্য এক অধরা বাস্তবকে ধরা। এবং তাকে শিক্ষামূলক ভঙ্গি ও আবেগ থেকে মুক্ত করা—এই ছিল মোটামুটি ১৮৮৫ সালের কাব্যিক প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য।

এখন আমরা ফিরে যাব সেই মানুষটির কাছে, যিনি অন্য সকলের চেয়ে বেশি প্রতীকবাদকে সম্ভব করে তুলেছিলেন। যিনি বলেছিলেন, 'যেখানে প্রতীক আছে, সেখানে সৃষ্টি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালার্মে প্যারিসে এসেছিলেন ১৮৭১ সালে উনত্রিশ বছর বয়সে। কবি ল্যকঁৎ দ্য লিলের ভাষায়, 'স্তেফান মালার্মে এলেন, আগের চেয়েও বেশি নরম, বিনীত ও উন্মাদ, এবং কপর্দকশূন্য। সঙ্গে এমন কিছু কবিতা ও গদ্য যা সম্পূর্ণ অবোধ্য, এক স্ত্রী ও দুই শিশু, যাদের মধ্যে একজন তখনও জন্মায়নি।'

তাঁর আগে বোদল্যেরের মতো, মালার্মেকেও মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন এডগার অ্যালেন পো ও ভাগনার। বোদল্যেরের কাছে পো-র কবিতা গভীর ও বেদনাময়, সুমার্জিত, বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল, 'comme un bijou de cristal' (ক্রিস্টালের গয়নার মতো)। 'বিষয় খুবই ক্ষীণ, এটি এক বিশুদ্ধ শিল্প।' 'স্নায়ু-বিপর্যস্ত করা কান্নাকাটির কবিতা এ নয়।' বোদল্যের বলে ওঠেন, 'তাঁর ঘনবদ্ধ ও যন্ত্রণাবর্জিত কবিতা তাঁকে নিশ্চয় অনেক কষ্ট দিয়েছে।' দ্বিধাহীনভাবে তিনি বলেন, তিনি 'শান্ত ও পুণ্যবান' গ্যোয়েটের চেয়ে 'দরিদ্র, মাতাল, নিন্দিত' পো-কে বেশি পছন্দ করেন। পো-র কবিতা 'স্বপ্নের মতো উজ্জ্বল ও রহস্যময়, ক্রিস্টালের মতো নিখুঁত।' আর মালার্মে ইংরেজি শিখেছিলেন—তিনি ছিলেন ইংরেজির শিক্ষক—শুধু পো-র রচনা পড়বেন বলে, যেকথা তিনি ভেরলেনকে লেখা এক আত্মজীবনীমূলক চিঠিতে স্বীকার করেছেন। তিনি পো-র কবিতা অনুবাদ করেন ও তাঁর কবিতা 'এডগার পো-র সমাধি'-তে সেই বিখ্যাত লাইনটি লেখেন: পো 'গোষ্ঠীর ভাষাকে বিশুদ্ধ করে তোলেন।' মালার্মে ও তাঁর ভক্তরা তো তাই-ই চেয়েছিলেন, কবিগোষ্ঠীর ভাষাকে বিশুদ্ধ করে তুলতে।

এলিয়ট যাকে বলেছেন পো-র যাদু কবিতার (magic of verse) সাংগীতিকতা মালার্মেকে তা মুগ্ধ করে থাকতে পারে। এলিয়ট আমাদের মনে করিয়ে দেন মালার্মে ও ভালেরি শুধু বোদল্যেরের মাধ্যমেই পো-কে চেনেননি, তাঁরা সরাসরি তাঁর প্রভাব আহরণ করেছেন।

অন্যদের দশ বছরেরও বেশি আগে, মালার্মে লিখেছিলেন কবিতার কর্তব্য হল বিশ্বনিখিলকে পরোক্ষ উল্লেখ ও প্রতীকের এক জালের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণভাবে সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া। আগেই লিখেছি, জ্যুল য়্যুরেকে তাঁর উক্তি, 'যেখানে প্রতীক, সেখানে সৃষ্টি।' রহস্যের নিখুঁত ব্যবহার থেকেই প্রতীক উঠে আসে কোনও বস্তুকে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলতে, একটি মুডকে প্রকাশ করতে, কিংবা উলটোভাবে, একটি বস্তুকে নির্বাচন করে তার ভেতরে একটি মুডকে খুঁজে নিতে, এক সারি সংকেতোদ্ধারের মাধ্যমে।' মালার্মে যখন

বলেন যে কবি একটি বস্তুর নাম না করে তার কথা ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন, তিনি সেই শব্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিলেন যা বস্তুকে মাত্রা দেয়, এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার পরিধির মধ্যে নিয়ে আসে। বস্তুকে সীমাবদ্ধ করে প্রতীকটিকে প্রসারিত করার সম্ভাবনা নষ্ট করাটা তিনি প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন।

কাজেই মালার্মের কাছে প্রতীক হল প্রতিনিধিত্বের বিপরীত, ইঙ্গিত হল নামকরণের বিপরীত। যা কিছু নামাঙ্কিত তা সীমাবদ্ধ, যা ইঙ্গিত তা 'অর্ফিক' কবিতা। তিনি ভেরলেনকে লিখেছিলেন, পৃথিবীর অর্ফিক ব্যাখ্যাই তাঁর অভীপ্সা।

এখন এই 'অর্ফিক' ব্যাপারটি কী? গ্রিক পুরাণে অর্ফিউস ছিলেন আপোলো ও কাব্যের দেবী ক্যালিওপের সন্তান। তিনি ছিলেন এক মহৎ সংগীতজ্ঞ, সন্ত ও দ্রষ্টা। পিথাগোরিয়ানিজ্‌ম্ এবং প্লেটোনিজ্‌ম্-এর মতোই ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে অর্ফিজ্‌ম্ এক জীবনদর্শন হিসেবে স্বীকৃত হয়। এই দুরূহ মিস্টিক দর্শনের মতে, আত্মা অমর তা পুনর্জন্মের মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধতা অর্জন করে। দেবী ভেনাস বিশ্বসংসারের সব কিছুকে মিলিয়ে দেন, সমস্ত বিপ্রতীপতা সেখানে মিলে যায়, অংশ মিশে যায় সমগ্রের সঙ্গে, সমগ্র মিশে যায় অংশে। সমস্ত কিছুই এক এককের অংশ। বিশুদ্ধতাকামী অর্ফিক জগৎ সর্বদাই পরিবর্তমান। মালার্মেও বিশ্বাস করতেন শিল্পী একটিই টেক্সট নির্মাণ করেন, যার শুধু অংশবিশেষ লেখা হয়, যার অংশ মিশে যায় সমগ্রের সঙ্গে, সমগ্র মিশে যায় অংশে। অবশ্য এর মানে এই নয় যে মালার্মে 'অর্ফিস্ট' ছিলেন। তিনি অর্ফিজমের একটি বিশেষ ধারণাকে ব্যবহার করেছেন মাত্র।

মালার্মে যখন তত্ত্বটিকে লিখতে গেলেন তিনি বিশেষ করে সংগীতের কথা বললেন। সংগীত ব্যাপারটাই এক ইশারা এবং শুধুমাত্র তাই। আগেই বলেছি, বাকি ফ্রান্সের মতোই তিনি ভাগনারের সংগীতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সংগীতের সঙ্গে পরিচয় তাঁর নন্দনতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে। মালার্মের প্রথম রচনাটি ছাপা হয় ১৮৮৫ সালের জুলাই মাসে 'লা রভ্যু ভাগনেরিয়েন' কাগজে। ফরাসিদের যা মুগ্ধ করেছিল তা হল এক সামগ্রিক নাট্যসৃষ্টি, যেখানে সংগীতের উদ্দেশ্য আর কান জুড়োনো নয়, মনের বিভিন্ন স্তরকে মেলে ধরা। সেজন্যই ভাগনার অপেরাকে খণ্ডিত করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এক অনন্ত সংগীত (unendliche melodie), যা নাটকের নিখুঁত ঐক্যকে সম্ভব করে

তুলবে, যেখানে সঙ্গীত, কবিতা, দৃশ্য, মঞ্চ-রূপায়ণ, নৃত্য মিশে একই লক্ষ্যের দিকে এগোবে। শব্দের জগতের ওপারে বিশুদ্ধ এক অন্তঃসংগীত, যা পৃথিবীর নির্যাসের কথা বলে। সুতরাং সেই শিল্পের প্রতি মালার্মের মহতী ঈর্ষা (sublime jalousie) যা আদর্শ জগতের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হতে পারে। মালার্মে তাঁর ইচ্ছের কথা বলেন তাঁর বিখ্যাত উক্তিতে: 'reprendre à la musique son bien' (সংগীতের ধর্মকে ছিনিয়ে নেওয়া), যা ভালেরির মতে, যখন তিনি ১৯২০ সালে প্রতীকবাদের সালতামামি করতে বসেছিলেন, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ফলে মালার্মের কাছে কবিতা মানুষের সেই ভাষা যা ফিরে আসে মৌলিক ছন্দের কাছে, যা আমাদের অস্তিত্বের রহস্যময়তাকে প্রকাশ করে, যা আমাদের বেঁচে থাকাকে সত্যতা দেয় এবং যা আমাদের একমাত্র আধ্যাত্মিক মোক্ষ। শুধু সংগীত নয়, সংগীতের অবয়বকে তিনি ধরতে চেয়েছিলেন। ভেরলেন সঙ্গীতের কথা বলতে গিয়ে সিলেবল ও মিলের কথা ভেবেছিলেন। মালার্মের কাছে, সংগীতের ধ্বনি নয়, সুরের কাঠামো ও শরীর বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

> রাতের জানলা খোলা, দুটি খড়খড়ি আটকানো। একটি ঘর যার ভেতর কেউ নেই, খড়খড়ির স্থিতিময়তার ছবি সত্ত্বেও যা অনুপস্থিতি ও প্রশ্ন দিয়ে গড়া, আসবাবহীন; একটি ফ্রেম যা আক্রমণাত্মক ও যন্ত্রণাময়, আয়না যা পেছনে লাগানো, তার প্রতিফলনকে নিয়ে, নক্ষত্রের, দুর্বোধ্য বিরাট ভালুকের ছায়া, যা তাকে আকাশের সঙ্গে যুক্ত করে।

এ এক অন্দরমহল যা, ব্রোঞ্জের মূর্তির হাতের আলোয় উদ্ভাসিত। মালার্মের কাছে, একটি কবিতার সঙ্গে থাকবে স্বপ্ন ও শূন্যতায় ভরা ভালবাসাময় একটি খোদাই-চিত্র।

একবার *Symphonie littéraire*-এ মালার্মে তাঁর কবিতার দৃশ্যপট এঁকেছিলেন: একটি দুমড়ানো গাছ, যার বাকল একগুচ্ছ স্নায়ুশিরার মতো, যার স্নায়ুমুখের ঘনিষ্ঠতাকে তুলনা করা হয়েছিল বেহালার কান্নাভরা সুরের সঙ্গে, যা গাছের ডালের শেষ প্রান্তে সংগীতের পৃষ্ঠার মতো কাঁপছে...। শোকার্ত অববাহিকা এক আবহমান বাগানের ফুলশয্যার ভেতরে ঢুকে পড়েছে: মৃত,

ধাতব জল, ভারী, পেতলের ফোয়ারা, যেখানে এসে পড়ে বেদনার্ত এক অদ্ভুত রশ্মি, মুছে যাওয়া জিনিসের মাধুর্য নিয়ে।

মালার্মের ৮৭, রু্য দ্য রোমের বাড়িতে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর গুণমুগ্ধেরা বিস্মিতভাবে শুনেছেন তাঁর কথা। তাঁরা হলেন ভিলিয়ে দ্য লিল-আদাম, পল ফর, ভেরায়েরেন, মেতেরল্যাঁক, মরিস দ্যুজারদ্যাঁ, বুর্জ, চিত্রশিল্পী হুইসলার, গগ্যাঁ, কখনও ভেরলেন, পল আদাম, বারেস, রেন্যিয়ে, ভিলে গ্রিফ্যাঁ, তেওদর দ্যুরে, ফেনেয়ঁ, রনে গিল, গ্যুস্তাভ্ কান, জ্যুল লাফর্গ, লরাঁ তাইয়াদ, আলফ্রেদ জারি, স্টুয়ার্ট মেরিল, দ্যব্যুসি, স্টেফান গেয়র্গ, আঁদ্রে জিদ, পল ভালেরি, লেয়ঁ পল-ফার্গ, পল ক্লোদেল, চিত্রকর মানে, দ্যগা, পিসারো, রনোয়ার। আমরা জানি, এরা অনেকেই হয়ে উঠবেন নতুন পথের নির্মাতা।

মালার্মে নিশ্চয় তাঁদের অনেক বার বলেছেন যা তিনি ১৬ নভেম্বর ১৮৮৫ তারিখে পল ভেরলেনকে লিখেছিলেন:

> আজ কুড়ি বছরের বেশি সময় নষ্ট করার পর, আমি দুঃখের সঙ্গে বিশ্বাস করি যে আমি ঠিক কাজই করেছিলাম। কারণ আমার যৌবনের ও তার পরবর্তী সময়ের টুকরো টাকরা গদ্য-পদ্য বাদ দিলে—যা প্রতিধ্বনি তুলতে পেরেছিল, এবং যা প্রায় সর্বত্র ছাপা হয়েছে—প্রত্যেকবার কোনও এক নতুন সাহিত্য-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলে আমি সবসময় এক অ্যালকেমিস্টের ধৈর্য নিয়ে স্বপ্ন দেখি যেমন একসময় লোকে ঘরের আসবাব ও কড়িকাঠ জ্বালিয়ে দিত, সমস্ত ভণিতা ও তৃপ্তিকে বিসর্জন দিয়ে, তেমনি করে মহাশিল্পের উনুনে উৎসর্গ করতে...কী? তা বলা শক্ত: সোজা কথায় বললে, একটি বই যা বহু খণ্ডে লেখা, একটি বই যা স্থাপত্যময় ও পূর্বনির্ধারিত এবং যা কোনওমতেই তাৎক্ষণিক অনুপ্রেরণার সংকলন নয় তা সে যত চমৎকারই হোক না কেন...আমি আর এক ধাপ এগিয়ে বলব: এক মহাগ্রন্থ, কারণ আমি নিশ্চিত যে বই একটিই, অচেতনভাবে যেই তা লিখুক না কেন, এমনকী প্রতিভাবানেরা। পৃথিবীর 'অর্ফিক' ব্যাখ্যাই কবির একমাত্র কাজ ও শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক খেলা, কারণ বইটির ছন্দ (যা নৈর্ব্যক্তিক ও সজীব) থেকে পৃষ্ঠাঙ্ক পর্যন্ত এই স্বপ্ন বা 'ওড'-এর সমীকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।
>
> প্রিয় বন্ধু, এই হল আমার দুষ্কর্মের স্বীকারোক্তি, পাপের নগ্নতা, যা আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার বার রক্তাক্ত, ক্লান্ত মনে প্রত্যাখ্যান করেছি, কিন্তু তা আমায় ভর করে থেকেছে, এবং হয়তো আমি সফল হব, গোটা বইটি লিখতে নয় (তার জন্য না জানি কী হতে হয়), কিন্তু অন্তত এক টুকরো নির্মাণ তুলে ধরতে, যা বাস্তবতার গরিমায় ঝলমল করে উঠবে, বাকি সব কিছুর দিকে নির্দেশ করে যা বলে উঠবে ওসব একটি জীবনও টেঁকার নয়। ওই নির্মিত অংশগুলো দিয়ে প্রমাণ করা যাবে বইটির অস্তিত্ব, যা আমি চিনতে পেরেছি কিন্তু শেষ করে উঠতে পারিনি।

মালার্মের কাছে পৃষ্ঠাঙ্ক ও ফাঁকা জায়গাও কবিতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সময়ের অনেক আগেই তিনি বলতে পেরেছিলেন কবিতার নিরপেক্ষ বইটিতে লেখকের কোনও স্থান নেই। মালার্মে মাকে খুইয়েছিলেন সাত বছর বয়সে, বোনকে তাঁর যৌবনে, এবং তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন হিংস্রভাবে গোপনচারী। তাঁর অস্তিত্বের সংকট, স্নায়ুশূল, নিদ্রাহীনতা ও আত্মহত্যার প্রবণতা কখনওই তাঁর কাব্যিক বচনকে প্রভাবিত করেনি। তাঁর কাছে কবি সেই মানুষ যিনি নিজেই নিজের কবর খোঁড়ার জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, 'un homme qui s'isole pour creuser son tombeau'।

মালার্মের উৎকণ্ঠা তাঁকে কবিতার এক চূড়ান্ত অভিযানে পাঠিয়েছে। এবং ইতিহাসে এই প্রথম, কবিতার সার্থকতা হয়ে উঠেছে চরমপন্থার সামিল। তিনি যদি জীবনে বারোটি মহৎ কবিতা লিখে থাকেন তার জন্য দায়ী তাঁর নির্দয় আত্মবিশ্লেষণ। মহাশিল্পের কথা ভেবে তাঁর সুকঠোর শব্দস্থাপত্য দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে পাঠকের কাছে। তিনি অবশ্য এডমান্ড গসকে বলেছিলেন, 'আমার নীতিকে বুঝে আমার কবিতা পড়লে সেটা আর শক্ত মনে হবে না। লোকে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা মনে করলে সত্যিই আমার কবিতা দুর্বোধ্য।'

মালার্মের শব্দভাস্কর্য আবেগাতীত, বিষয়বস্তুমুক্ত হতে চেয়েছিল, যদি তা হতে পারা যায়। একটি হাত-পাখা, একমাথা চুল, পোর্সেলিনের রং করা টুকরো, ছোটখাটো গয়না...বিষয়টিকে যতদূর কমিয়ে আনা যায়, কবিতার সূচনাবিন্দুকে উত্তরণ করে যাওয়া যায়। তাঁর ফিসফিসানি—যা নৈঃশব্দ্যের খুব কাছাকাছি—হয়ে ওঠে স্বপ্নময়।

'তথ্যকে ঈশ্বরপ্রতিমভাবে আদর্শায়িত' করে নিতে গিয়ে ঘটনার গুরুত্ব কমে আসে, কমে আসে দৈবক্রমের প্রভাব। ওই রচনা মহাগ্রন্থের অংশ,

কবিতা-র অংশ, যেন আমাদের মনের কাঠামো সারা বিশ্বনিখিলের ছাপ বহন করছে।

জীবনের শেষ পর্বে, মালার্মেকে আলোড়িত করেছে সত্তাহীনতা, নৈঃশব্দ্য, অনুপস্থিতি। তিনি পৌঁছতে চেয়েছেন আপেক্ষিক থেকে পরমে, সীমায়িত থেকে অসীমে। আর কেউই প্রতীকবাদের এক আধিবিদ্যক ভিত্তিভূমি তৈরির জন্য এমন মরিয়া প্রয়াস করেননি।

তিনি শেষ পর্যন্ত মহাশিল্প-নির্মাণে কুড়ি বছরের বেশি ব্যয় করেছিলেন, সফল হয়েছেন কিনা, তা বোধ হয় তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। শব্দের চারপাশে অর্থের প্রতিপত্তির জন্য কবিতার পক্ষে বিশুদ্ধ নন্দনদৃষ্টি হয়ে ওঠা কঠিন। তবু মালার্মের নন্দন তার সবচেয়ে কাছে পৌঁছতে পেরেছিল।

২০০১

আঁরি মিশো: কেন্দ্র ও অনুপস্থিতির মাঝখানে

যখন তাঁর জন্মশতবর্ষে, বাংলা কবিতার অস্থিমজ্জার ভেতর জীবনানন্দের ভাবনাপ্রতিভাকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করে নিতে চাইছি আমরা, ঠিক তখন এক সমবয়সী ফরাসি কবির দুঃসাহসিক স্নায়ু-অভিযান আমাদের খানিকটা ভিন্নভাবে অন্তর্দীপ্ত করে।

জীবনানন্দ যাকে বলেছেন 'নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর' বাস্তবকে ফলিয়ে দেখা, এ যেন তারই এক অন্য প্রতিরূপ। স্নায়ু-কবিতার এই অভিযাত্রীর নাম আঁরি মিশো (১৮৯৯-১৯৮৪)। মাঝে মাঝে মনে হয়, দৈবাৎ যদি তা সম্ভব হত, মিশোর কবিতা পড়ে কী ভাবতেন জীবনানন্দ?

কিন্তু প্রথমেই আমরা এক সমস্যার মুখোমুখি। মিশো কি ফরাসি? যে-অর্থে গোদার সুইস, গীয়োম আপোলিনের ইতালীয়-পোলিশ এবং ত্রিস্তাঁ ৎসারা বা য়্যজেন ইওনেস্কো রুমানীয় হয়েও ফরাসি, ঠিক তেমনই জন্মসূত্রে বেলজিয়ান হয়েও আঁরি মিশো বিশ শতকের ফরাসি কবিতার জন্মযন্ত্রণার শরিক। তা ছাড়া, যে-অর্থে ফ্রানৎস এলেন্স্, ক্লেমাঁ পাঁসের্স্, মাক্স এলস্কাঁ, পল নুজে, গোমাঁস বা ওদিলঁ পেরিয়ে বেলজিয়ান, সে-অর্থে মিশো কখনওই তা নন। হয়তো মাতৃভূমি ছেড়ে ফ্রান্সে চলে আসার মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর জীবনদৃষ্টি: সংকীর্ণ ভূগোলকে অতিক্রম করে এক বিহ্বল শেকড়হীন অনুভূতির কাছে পৌঁছনো, কেন্দ্র ও অনুপস্থিতির মাঝখানে।

মিশোর জন্ম হয়েছিল বেলজিয়ামের নাম্যুরে, ১৮৯৯ সালের ২৪ মে অর্থাৎ বরিশালে জীবনানন্দ দাশের জন্মের তিন মাস পর। একই বছর দক্ষিণ ফ্রান্সের মোঁপেলিয়েতে জন্মেছিলেন আধুনিক ফরাসি কবিতার আরেক স্তম্ভ ফ্রাঁসিস পঁজ। ফরাসি ভাষার কাব্যিক বচনের প্রকৃতি বদলে দেওয়ার ব্যাপারে এঁদের দু'জনের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। এঁদের পর কবিতা আর এক রকম থাকেনি।

বেলজিয়ামে এক ভেতর-রক্তাক্ত শৈশব মিশোর; দেয়াল-তোলা পৃথিবীর গোলক-ধাঁধার মধ্যে বিভ্রান্ত এক শিশু। সে জানে না কী করে ওই ধাঁধার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোকাবিলা করবে: তার কোনও শিরস্ত্রাণ নেই। মাত্র আট বছর বয়সেই গাছ হয়ে ওঠার অসহায় স্বপ্ন দেখছে সে। তারপর হঠাৎ একদিন পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে জাহাজের নাবিক হয়ে যাওয়া। মিশোর ভাষায়,'যা আমি জানি, যা আমার, তা এক অনির্দিষ্ট সমুদ্র।'

স্যুররেয়ালিস্ত্ চিত্রকরদের সঙ্গে মিশতেন। বিশের দশকের গোড়াতে হঠাৎই যেন শুরু হল নতুন এক লিখন-ক্রিয়া। তখনও পর্যন্ত মিশোর মনে হয়েছিল কবিতা বা ছবি ব্যাপারটা একটা বাইরের জিনিস। এখন চমকে উঠে দেখলেন, অন্য এক বাস্তবকে ধরা যায় তো বেশ, তাকে ভাস্কর্যের মতো আঙুল দিয়ে ছোঁয়া যায়। এই নতুন চোখ খুলে দিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাউল ক্লে, মাক্স এর্নস্ট, জর্জিও দে শিরিকোর মতো ভিনদেশি চিত্রশিল্পীরা। বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকে যখন সমস্ত শিল্পের সুর মিলেমিশে যাচ্ছে পরস্পরের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছিল কবিতা, নাটক, ছবি ও ভাস্কর্য, তখন মিশোর প্রসঙ্গে চিত্রশিল্পী কথাটা ঘুরেফিরে আসবে।

এই সাদা পাতা, যা আর সাদা নেই, নৈঃশব্দ্য খুঁড়ে সেখানে কেউ এসে খুঁজে দেখছে আঁতিপাতি করে, প্রশ্ন ছুঁড়ছে, আক্রমণ করছে, আর সাদা পাতা হয়ে উঠছে চিৎকার, অস্ত্র, ঢেউ, শিহরন।

তাঁর আবিষ্কারের সৃজনে আঁরি মিশো আলোড়িত, আক্রান্ত, ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছেন তিনি, আবার নিজেকে সংযত করে তাঁর আবিষ্কারকে, অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখেন তিনি, ছুঁতে চাইছেন সেই শব্দোত্তরকে যেখানে বহির্জগতের প্রচলিত বাকভঙ্গির পোকাখাওয়া শব্দ পৌঁছতে পারে না, 'un domaine qui ne crystallise pas les mots, un domaine incrystallisable', সে এক এলাকা যেখানে শব্দেরা দানা বাঁধতে অক্ষম।

একজন মানুষ নয়, মিশোর পাঠকদের সামনে এক অসম্ভবের জগৎ। আল্যাঁ জুফ্রোয়ার ভাষায়: 'Ça parle tellement que c'est muet'—তা এত কথা বলে যে তা বোবা; 'Ça bouge tellement que c'est immobile'—তা এত নড়ে যে তা অনড়। (আমাদের মনে পড়ছে মিশোর কবিতার বইয়ের নাম *La nuit remue:* 'রাত নড়ে'। 'Ça vous annihile par sa seule existence'—তার অস্তিত্ব দিয়ে এই কবিতা তোমায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

ভেতরের মানুষ, যার মুখ নেই, শব্দ নেই। যা সে হতে পারে, এই ভেতরের

মানুষ, কত দূর সে ডুবে যেতে পারে ঘুম, অন্ধকার আর বালির ভেতর, কত দূর পর্যন্ত সে শব্দ খুঁজে পায় নিজেকে পৃষ্ঠার ওপরে ফোটাতে, কতটা সে সরে আসে কেন্দ্র ও না থাকার মাঝখানে, 'entre centre et absence'.

মিশোর এই সম্পূর্ণ এককভাবে নিজস্ব কাব্যজগতের এই যে—রনে শারের শব্দ ব্যবহার করে বলতে হয়—'Fureur et mystère', তার ধর্ম ও রূপরেখা, অন্তর্মানচিত্র, স্নায়বিক মানচিত্র তা ফুটে ওঠে তাঁর বইয়ের নামগুলির মধ্যে: 'অন্তঃস্থ সুদূর' (*Lointain intérieur*, ১৯৩৮), 'পরীক্ষা, অভিচার' (*Tests, exorcismes*, ১৯৪৫), 'ভাঁজের মধ্যে জীবন' (*La vie dans les plis*, ১৯৪৯), 'কেন্দ্র ও অনুপস্থিতির মাঝখানে' (*Entre centre at absence*), 'ভাঙচুরের মধ্যে শান্তি' (*Paix dans les brisements*, 1959) 'গহ্বরের ভেতরে অভিজ্ঞান' (*Connaissances par les gouffres*, ১৯৬৭) ও 'যখন ছাদ ভেঙে পড়ে' (*Quand tombent les toits*, ১৯৭৩)। সংহত ও বাঙ্ময়। এমনকী ফরাসি কবিতাতেও নামের এই চিত্ররূপময়তা সুলভ নয়।

বিশের দশকের গোড়ায় কবিতা ও ছবির জগতে প্রবেশ করা এই শিল্পী আভাঁ গার্দ ফরাসি সাহিত্যের স্বর্ণযুগেও সেই বিরল কবিদের একজন যিনি কোনও আন্দোলনে, কোনও দলে নাম লেখাননি; তাঁর পথ হাতড়ানো সর্বদাই একক, কেউ তাঁর সহযাত্রী নন। তাঁকে ঘিরে বুকে হাঁটা স্তাবকদের হুক্কা-হুয়া আমরা কল্পনা করতে পারি না। কারণ তা কোনও শিল্পীকে বেশিদূর এগোতে দেয় না।

তিনি ভেতর খুঁড়ছেন, l'espace du dedans, বাইরে তাঁর নির্বাসন ও প্রত্যাখ্যান, যেমন বেলজিয়ামকে অস্বীকার করে ফ্রান্সে চলে আসা ও খোঁজা—লাতিন আমেরিকায়, আফ্রিকায়, তুরস্কে, ইতালিতে, মিশরে, ভারতবর্ষে, চিনে। মিশোর ভারতবর্ষ ও চিন উঠে এসেছে তাঁর এশিয়া-সংক্রান্ত গ্রন্থে, যার নাম 'এশিয়ায় এক বর্বর', *un barbare en Asie* (১৯৩২)—যেখানে আমরা লক্ষ করব এক অসম্ভবের উৎস-সন্ধান, মিশোর ভাষায়, 'আমাদের জটে জড়ানো বিষাদকে' অতিক্রম করে করে।

এই 'অন্যত্র'-র সন্ধানে বেরিয়ে—এখানে 'অন্যত্র' (ailleurs) শব্দটিকে গভীরতর অর্থে একটি চাবিশব্দ বলব—এক দিব্য উন্মাদ লোত্রেয়ামঁ-কে আবিষ্কার, যাঁর আসল নাম ইজিদোর ল্যুসিয়্যাঁ দ্যুকাস, উনিশ শতকের সেই ব্যতিক্রমী ফরাসি কবি যিনি বোদল্যের, র‍্যাঁবো ও মালার্মের মতো

'আধুনিকতার এক স্তম্ভ' বলে অনেকের কাছে স্বীকৃত। যাঁর ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ *Les chants de Maldoror* (মালদররের গান) অভূতপূর্ব ঝুঁকি নিয়ে বাচ্যভাবনাকে প্রচলিত গতিপথ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল এবং হয়ে উঠেছিল স্যুররেয়ালিস্ত্‌দের পূর্বসূরি।

আসলে, ১৯১৯ সালে প্যারিসের 'লিতেরাত্যুর' পত্রিকায় লোত্রেয়ামঁ-র ১৮৬৯ সালের টেক্‌স্‌টি সম্পূর্ণ ছাপা হয়, এবং তার পরের বছরই ১৯২০ সালে স্যুররেয়ালিস্ত্‌ ফিলিপ সুপোর সম্পাদনায় এটি আলাদা করে বই হিসাবেও বেরোয়। যুক্তিবুদ্ধির নিয়ন্ত্রণের তোয়াক্কা না করে স্বয়ংক্রিয় অবচেতন লিখনপদ্ধতির প্রবক্তা, অজানার অনুসন্ধানী ফ্রান্সের এই নতুন প্রজন্ম লোত্রেয়ামঁ-র আত্মখননের ঐশ্বর্যময় উন্মাদনার ভেতর খুঁজে যাচ্ছিলেন একেবারে নতুন এক বিস্ফোরক সম্ভাবনা। আঁদ্রে ব্রোতঁ লিখেছেন: 'আমাদের কারও কারও চোখে এই বইটিতে ছিল এক তুলনাহীন দীপ্তি; এ এক সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন (révélation totale), যা মানব-সম্ভাবনাকে প্রসারিত করে।' এ হল নৈরাশ্য ও আতঙ্কের এক নির্মাণ, যা শেষ পর্যন্ত কোনওভাবেই নিজেকে অতিক্রম করতে পারে না। মানুষের অভিজ্ঞতাকে sublimate না করে তাকে তা ভেঙে গুঁড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলে। তবু আমার মনে হয়েছে লোত্রেয়ামঁ-র এই নির্বায়ু বদ্ধ জগতের 'অবচেতনার বাইবেলে'র মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে মিশোর কবিতার ঠিকানা। আমরা জানি, সাহিত্যে এরকম যোগাযোগ ঘটে যায় অনেক সময়, যেমন জ্যুল লাফর্গ নামে এক সাতাশ বছরের মৃত ও উপেক্ষিত ফরাসি তরুণের কবিতা থেকে জন্ম নিয়েছিলেন টি. এস. এলিয়ট। এলিয়টের ভাষায়: '(There is) a feeling of profound kinship, or rather of a peculiar, personal intimacy with another, probably a dead author. It may overcome us suddenly...it is certainly a crisis... We do not imitate, we are changed, metamorphosed almost.' বিশের দশকের গোড়ায় লোত্রেয়ামঁ-মিশোর সম্পর্ক অনেকটা এইরকম ছিল বলে মনে হতে পারে। লোত্রেয়ামঁ ছাড়া র‍্যাঁবোকেও ('নরকে এক ঋতু') নিশ্চয়ই মিশোর পূর্বসূরি বলতে হয়, যে-র‍্যাঁবোর বীজমন্ত্র ছিল 'dérèglement de tous les sens' (ইন্দ্রিয়বিপর্যয়) এবং অবশ্যই জেরার দ্য নেরভালকে। অর্থাৎ কাব্যধারাটিকে এভাবে সাজানো যায়: নেরভাল, লোত্রেয়ামঁ, র‍্যাঁবো,

স্যুররেয়ালিস্তরা ও আঁরি মিশো। বোদল্যেরীয় অন্য একটি ধারাও, যেমন জ্যুল লাফর্গ ও ত্রিস্তাঁ করবিয়েরের শব্দখেলা ও আত্মশ্লেষ, মিশোর আত্মমগ্ন গোপনতাকে শূলবিদ্ধ করেছে অনেক সময়।

এইসঙ্গে এটাও বিশেষভাবে লক্ষ করার ব্যাপার যে মিশো বোদল্যেরের গদ্যকবিতাগুচ্ছ *Les petits poèmes en prose* এবং র‍্যাঁবো ও লোত্রেয়ামঁ-র গদ্যকবিতার অনুসরণে কবিতাকে মিল ও মাত্রার বন্ধন থেকে ছিন্ন করে নিয়ে এলেন টানা গদ্যের কাঠামোয়, যেমন আধুনিক ফরাসি কবিতায় মাক্স জাকব, রনে শার ও ফ্রাঁসিস পঁজও করেছেন (পল ক্লোদেল ও স্যাঁ-জন পের্সকে ধরছি না, কারণ তাঁদের গদ্যকবিতা বাইবেলী ও স্তোত্রধর্মী)। কবিতা ও পদ্যের এই আপসহীন পৃথক্‌করণ আধুনিক ফরাসি কাব্য-অভিযানের এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ; মিশোর মতো অভিযাত্রীর পক্ষে পদ্যের আনুষ্ঠানিকতা ও আলংকারিকতাকে প্রত্যাখ্যান করে টানা গদ্য ব্যবহার করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। এদিক থেকে আমরা বাঙালিরা এতই ভীতসন্ত্রস্ত রয়ে গেছি যে ('লিপিকা'র কাব্যিক গদ্যকে বাদ দিলে) একমাত্র অরুণ মিত্র বাদে আর কেউ সেভাবে এ-পথে পা বাড়াননি।

প্রশ্ন হচ্ছে, র‍্যাঁবোর মতো দ্রষ্টা ও করবিয়েরের মতো শ্লেষছিন্ন, গদ্যারূঢ় কবিকে হিঁচড়ে টেনে এনে বিশ শতকের অন্ধকারের কিনারে দাঁড় করিয়ে দিলে কি মিশো হয়? আর তার সঙ্গে যদি মিশে যায় আলফ্রেদ জারীর উদ্ভটতা? মিশোর কবিতা পড়তে গিয়ে ফরাসি বিশেষজ্ঞ জাঁ রুস্‌লোর মনে পড়েছে রাব্‌লে ও সুইফ্‌টের নাম। আবার সেইসঙ্গে উইলিয়াম ব্লেক ও লুইস ক্যারলের কথা, গোইয়া ও আঁতোন্যাঁ আর্তোর কথা। রুস্‌লোর এই ভাবনা থেকে, এই যে একদিকে রাব্‌লে-সুইফ্‌টের ক্ষমাহীন বিদ্রূপ, অন্যদিকে ব্লেক-ক্যারলের সরলতা, আরেক দিকে গোইয়া-আর্তোর নিষ্ঠুরতা ও যন্ত্রণা—এসব থেকে মিশোর কাব্যচেতনার একটা আভাস আমরা পেয়ে যাচ্ছি নিশ্চয়ই। কেউ কেউ তাঁর মধ্যে পেতে পারেন ফ্রান্সে উপেক্ষিত বেলজিয়ান স্যুররেয়ালিস্ত্ কবি পল নুজের প্রস্বর, যা ক্ষয়কারী ও 'র‍্যাডিকাল'। কথার এই সন্ত্রাস বেলজিয়ান কবি ক্লেমাঁ পাঁসেরসের মধ্যেও পাওয়া যাবে। এ-যেন লিখনকে ওলটপালট করে দিয়ে এক নতুন বাস্তবের অবয়বকে বের করে আনার যুদ্ধ, যে-যুদ্ধ সালভাদর দালিরও। বিশ শতকের দুই মহাযুদ্ধের মধ্যেকার ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে ক্ষোভিত সময়,

সেখানে মিশোর অনতিদূরে আছেন কাফকা, বেকেট বা ইওনেস্কো (যাঁর একটি নাটক 'আমেদে'-তে পাশের ঘরে স্ফীয়মান একটি লাশ—স্বপ্নের?—বড় হতে হতে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে)।

তবু আধুনিক অন্তর্মুখীনতা, যাবতীয় কাপট্যের প্রতি ঘৃণা এবং ভাবনার প্রচলিত গতিপথ ভেঙে ফেলার এই সাধারণ প্রতিবেশেও বলব, মিশো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক কণ্ঠস্বর। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি এক অতি-ব্যক্তিগত কৃত্রিম পরিমণ্ডল তৈরি করে নেন, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্যুররেয়ালিস্‌মের দ্রুত অবলুপ্তি সত্ত্বেও অবিচল স্থিরতায় এক নির্মল ও ভয়ংকর স্বপ্নহীন স্বপ্নের জগৎকে rêverie vigile তুলে ধরেন, যা প্রবল উদ্বেগ, যন্ত্রণা, নৈতিক পীড়ন ও ভয়ের সম্মিলনে এক দানবীয় অভিজ্ঞতার রূপ নেয়। নিষ্ঠুর ও হিংস্র পরিপার্শ্বকে প্রতিরোধ করার এ এক অপূর্ব উদ্যম। মিশোর এই দমবন্ধ করা নিরাশার মধ্যে একমাত্র যা স্বস্তির কথা তা হল কবিতা ও ছবির প্রতি গভীরতম আস্থা। শিল্পের এলাকায় তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করেন, কারণ সেখানে দাঁড়িয়ে বাস্তবের এক প্রতিকল্প তৈরি করা যায়, অন্তর্জগৎকে পুনর্গঠন করা যায় এবং বাগ্‌বিধিকে ওলটপালট করে দেওয়া যায়। 'Mon roi' কবিতায় যে রাজার তার ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর কথা তার টুঁটি টিপে ধরেন, পশ্চাদ্‌দেশে লাথি মেরে ঘর থেকে তাড়ান। অন্য একটি কবিতায়, ছোট খামে ঘেরা হৃদয়ে ক্ষতচিহ্নগুলো ফুলের মতো ফুটে ওঠে। একটা আয়না-লাগানো আলমারিতে চাবুক কষাতে কষাতে নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে আনেন। সিংহেরা মেয়েদের খেয়ে ফেলে অথবা 'পিঁপড়েরা উদ্বিগ্নভাবে মাটিতে পেট ঠেকিয়ে ধুলো ঠেলে।' দুঃখকে উদ্দেশ্য করে বলতে পারেন: 'আমার বিরাট রঙ্গালয়, আমার বন্দর, আমার ভিটে,/আমার সোনার গুহা,/আমার ভবিষ্যৎ, আমার সত্যিকারের মা, আমার দিগন্ত।/তোমার আলো, তোমার বিশালতা, আমার আতঙ্কের কাছে আমি নিজেকে ছেড়ে দিই।' অন্ধকারকে নিয়ে খেলা করেন তিনি: 'Le noir est ma boule de cristal'—অন্ধকার হয়ে ওঠে স্ফটিকের বল।

এক আক্রমণাত্মক বহির্বাস্তবের দুর্ভেদ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে ভাষার প্রতারক সুসংবদ্ধতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। গত একশো পঞ্চাশ বছর ধরে ভাষার অভিনবত্ব, পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাঁরা কম দেখেননি, সেই ফরাসি সমালোচকেরাও মানতে বাধ্য হয়েছেন মিশোর 'étonnante hardiesse', আশ্চর্য দুঃসাহসিকতা, যার মাধ্যমে কবিতার ভাষায় তিনি সঞ্চারিত করেন এক আভিচারিক শক্তি।

শূন্যের অন্তঃস্থ বাক্যকে খোঁজা, মেলে ধরা।

স্নায়ুকবিতার সম্ভাবনাকে আরও নিশ্চিত করার জন্য আঁরি মিশো ১৯৫৫ সাল থেকে মেসকালিনের মতো মারাত্মক মাদক গ্রহণ করেছেন। পঞ্চাশের দশকের শেষে ও ষাটের দশকের গোড়ায় অন্তত চারটি বই সরাসরি এই মাদকের প্রভাবে লেখা। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বইটির নাম 'খাদের ভেতর অভিজ্ঞান।' একটি কবিতায় লিখেছেন, 'একটা মাথাঝিমঝিম অনুভূতি নেমে আসে পয়োনালির ভেতর দিয়ে, আর তারপর ফুটে ওঠে সর্পিল রেখার রাশি।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিশোর মনে হয়েছে মাদকের কোনও প্রয়োজন নেই, স্নায়ু-বিপর্যয় তো এমনিই হয়ে আছে। তাঁর ভাষায়: শুধু শিল্পই পারে বিচ্ছিন্নতাকে প্রবহমান করে তুলতে ('la continuité du discontenu')।

এই প্রবহমানতার বৈদ্যুতিক অন্তঃস্রোতকে ছুঁতে কবিতার পাশাপাশি ছবিও এঁকেছেন মিশো। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে মিলের কথা নিশ্চয়ই উল্লেখ করতে হয়। মিশোর ছবিও রবীন্দ্রনাথের মতো *espace aux ombres*: ছায়ার জগৎ, অনুজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ অথচ তীক্ষ্ণ, বিসর্পিল আঁকিবুকি। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে প্যারিসের left bank-এ তাঁর ছবির প্রদর্শনীর সময় মিশো লেখেন: 'যেমন লেখার সময় তেমনি ছবি আঁকার সময়ও আমার নিজস্ব ঐশ্বর্যকে খুঁজেছি... জেগে ওঠার জন্য... যা আমার আছে বলে জানতামই না।' আল্যাঁ জুফ্রোয়া মিশোর চিত্রকলাসংক্রান্ত একটি বইতে মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁর লেখা ও রংরেখা পরস্পরের পরিপূরক, মূলত তাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

অনিশ্চয়তা, রূঢ়তা, আর্তিময় পাগলামির জগৎ। চিত্রিত ভ্রমণ, স্নায়ুশিরার প্রতিকৃতি... যেন এক প্রবল কম্পন তাঁকে গ্রাস করে, আর তিনি হয়ে ওঠেন এক সিসমোগ্রাফ।

শান্ত ও ঊষর দৃশ্যপট।
ফালাফালা হয়ে যাওয়া ছিন্ন স্নায়ুর দৃশ্যপট,
ক্ষতচিহ্ন, ইস্পাত, চোখধাঁধানি, অশুভ সময়, ফাঁসি আর
যুদ্ধের প্রস্তুতিকে বেচে দেওয়ার দৃশ্যপট
চিৎকারকে মুছে ফেলার দৃশ্যপট।

একটা *অবস্থার* ছবি। যুদ্ধের উপাদানের চেয়েও যুদ্ধটাই, যুদ্ধের তাৎপর্যটাই মিশোর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। তিনি অভিনয় করেন না, তিনি নিজেই হয়ে ওঠেন যুদ্ধ।

স্নায়ুকবিতার এ এক চরম দৃষ্টান্ত। মিশো-বিশেষজ্ঞ রবের ব্রেশঁ-র অনুসরণে বলা যায়, 'মিশোর সৃষ্টির মধ্যে সীমাহীনভাবে ফিরে আসে মানবতার অনুরণন, এবং সেখানে প্রবেশ করামাত্র আমরা উদ্বিগ্ন হই, কারণ মানবাবস্থা থেকে পালানো নয়, প্রকৃত ও সম্পূর্ণভাবে বাঁচাই তাঁর লক্ষ্য।'

আমাদের যুগকে তিনি এড়িয়ে যাননি, কিন্তু প্রবলভাবে ঘৃণা করেছেন। কারণ এই 'শূন্যে', 'কোনও চিৎকার নেই, কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই।' পালানোর চেষ্টাও এক বিভ্রম। 'যে মুহূর্তে আমরা বাইরে পা রাখি, বাতাস এসে আমাদের আত্মাকে ছিঁড়ে ফেলে।' ফলে মিশোর সামনে একটাই পথ খোলা ছিল। তা হল পরিচিতির পর্দা ছিঁড়ে এক অপরিলিখিত অনন্তে বিচরণ করার।

আঁরি মিশোর কবিতা আমাদের ভাঙাচোরা জীবনের বিপন্নতার মহান সাক্ষী।

ঘুমোনো (Dormir)

ঘুমিয়ে পড়া খুব শক্ত। প্রথমত সর্বক্ষণ লেপগুলোর ভয়াবহ ওজন, এবং শুধুমাত্র বিছানার চাদরগুলোর কথা বললে, সেগুলো যেন লোহার পাতের মতো।

নিজেকে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করার পর কী ঘটে সেটা সকলেরই জানা। বিশেষত অনস্বীকার্য ওই কয়েক মুহূর্তের বিশ্রামের পর আমরা শূন্যে প্রতিভাত হই। অতঃপর নেমে আসা, আর এই নেমে আসাটা সর্বদাই এত আকস্মিক যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

অথবা, পিঠের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে, হাঁটুগুলো তুলে ধরা। এটা ঠিক নয়, কারণ পেটের ভেতরকার জল নড়ে ওঠে আর ক্রমশ জোরে জোরে ঘুরপাক খায়। এরকম একটা লাট্টুর সঙ্গে ঘুমোনো যায় না।

এজন্যই অনেকে ভেবেচিন্তে উপুড় হয়ে শোয়, আর সঙ্গে সঙ্গে—ওরা

সেটা জানে, কিন্তু কী করব, ওরা বলে—ওরা গড়িয়ে পড়ে, ওরা গড়িয়ে পড়ে গভীর খাদের ভেতর, আর যত নীচেই ওরা যাক কেউ না কেউ ওদের পাছায় পা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দেয়, আরও নীচে...আরও।

তাই ঘুমোতে যাওয়ার সময়টা বেশিরভাগ লোকের কাছে এক অতুলনীয় দুর্ভোগ।

১৯৯৯

স্বপ্নের কারিগর

জাঁ আনুই-এর জন্ম হয়েছিল ১৯১০ সালে ফ্রান্সের বরদো শহরে। বাবা ছিলেন দরজি, মা বাজাতেন বেহালা।

অনেকদিন পরে বাবার কথা বলতে গিয়ে আনুই লিখেছেন, 'এমনিতে সাদাসিধে লোক, কিন্তু নিজের পেশায় কী অসম্ভব দক্ষতা ছিল তার। যেদিন থেকে আমি বখে গিয়ে সাহিত্য করা শুরু করি, সেদিন থেকে সবসময়ই ভেবেছি তাঁর মতো কারুশিল্পী হতে হবে।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে ফরাসি দেশে যাঁরা নাটক লেখা শুরু করেন তাঁদের মধ্যে প্রাকরণিক নৈপুণ্যে একমাত্র তাঁকেই বোধহয় কারিগর বলা চলে। তিনি বলেছেন, 'কারিগর যেভাবে চেয়ার বানায়, আমি সেভাবে নাটক তৈরি করি।'

ফরাসি নাট্যজগতে তিনি অতি বিশিষ্ট, অথচ তাঁকে কোনও তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা শক্ত। সমস্ত পূর্বনির্ধারিত ছক তিনি ভেঙে দিয়েছেন। যুদ্ধ-পরবর্তী ফরাসি থিয়েটারের সামনে খোলা ছিল দুটি পথ, একটি জনপ্রিয়তার পথ, অন্যটি আভাঁ-গার্দ থিয়েটারের। জাঁ আনুই দুটি পথই পরিহার করে পার্শ্বরেখা দিয়ে হেঁটেছেন। আনুই ছিলেন সম্পূর্ণত থিয়েটারের মানুষ। বিশ শতকের ফরাসি নাট্যকারদের উজ্জ্বল মিছিলে, যাতে সামিল ছিলেন ক্লোদেল, কক্‌তো, কাম্যু, সার্ত্র, বেকেট ও জাঁ জ্যনের মতো জ্যোতিষ্ক, একমাত্র তিনিই সাহিত্যের অন্য শাখার দিতে হাত বাড়াননি।[১] নাটকের এই থিয়েটারে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত অভিনিবেশ ও আবেগ। শুধু নাটক লিখেই তিনি দায়মুক্ত হননি অধিকাংশ সমসাময়িক নাট্যকারের মতন, সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থেকেছেন প্রযোজনার সঙ্গে। তাঁর সম্পর্কে তাঁর সারাজীবনের কাজের সঙ্গী আঁদ্রে বারসাক ও রোলাঁ পিয়েত্‌রি লিখেছেন, 'আনুই আমাদের আপনজন, আমাদের কাজের প্রতিটি রহস্যের সঙ্গে তিনি পরিচিত।' তাঁর নাটকের মঞ্চনির্দেশক জাঁ-দ্যনি মালসেস বলেছেন তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ নাট্যচেতনার কথা। 'কোনও খুঁটিনাটিই আমরা তাঁকে ছাড়া কল্পনা করতে পারি না।' থিয়েটার যেন তাঁর কছে এক বুদ্ধির খেলা। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বদাই অত্যন্ত সচেতনভাবে নাটকীয়, যেখানে দর্শকদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় অভিনয়ের কথা, অভিনেতারা হয়ে ওঠে চরিত্র (*Le Rendezvous de Senlis*, ১৯৩৭ ও *Eurydice* '৪১) কিংবা থিয়েটারের জগতই নাটক হয়ে ওঠে (*Colombe* '৫০)। কখনও অভিনেতারা মলিয়েরের পোশাক গায়ে চড়ায় (*Ornifle*, '৫৫), কখনও হয়তো (যেমন *Le répétition* নাটকে) নাটকের গল্পটি তৈরি হয় অন্য একটি নাটকের অভিনয় করতে করতে। আনুই লিখেছেন, 'দর্শক ও সমালোচকদের জন্যেও যদি রিহার্সালের বন্দোবস্ত থাকত, চমৎকার হত!'

তিনি আগাগোড়াই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নীরব। নাটকের প্রিমিয়ারে ছাড়া তাঁকে কদাচ কোথাও দেখা যেত না। আনুই-এর অধিকাংশ বিখ্যাত নাটকের নায়িকা মোনেল ভালাঁত্যাঁর সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদের খবর বহুকাল কেউ জানতে পারেনি। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার যে কোনও জীবনী নেই, সেটা খুবই আনন্দের কথা।' আসলে, নাটকের মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকতে তিনি চেয়েছেন। একথা মনে রাখতে হবে যে জীবনের প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তি থেকেই তাঁর নাটকের জন্ম। তরুণ বয়সে তাঁকে বারবার দেয়ালে মাথা ঠুকতে হয়েছে: 'দেয়াল' মানে দারিদ্র, সেই মানুষদের দলে থাকা 'যাদের জন্য হাস্যোজ্জ্বল নারীরা নয়, যারা রাস্তায় ছুঁচ ছড়িয়ে বেড়ায়, যাদের জন্য নীতির বই লেখা হয়'। তিনি দেখেছেন, শৈশব পালিয়ে যায়, প্রেম ও বন্ধুত্ব প্রতারণা করে, বিদ্রোহ কোনও কাজে লাগে না। এসবকে ঘৃণা করার জন্যও নাটককে প্রয়োজন ছিল তাঁর।

অনেক ছোটবেলায় এক আত্মীয়ের কাজিনোতে কাজ করার সুবাদে প্রায়ই নাটক দেখার সুযোগ জুটে যেত, অবশ্য রাত হয়ে যেত বলে কোনওদিনই বিরতির পর থাকা হত না। বারো বছর বয়সে তিনি কয়েকটি কাব্যনাটক লেখেন যেগুলি শেষ করা হয়ে ওঠেনি। ১৯২৫ সাল থেকে তিনি নিয়মিত থিয়েটারে যেতে শুরু করেন। এইসময় তিনি পরিচিত হন বার্নার্ড শ, ক্লোদেল ও পিরানদেল্লোর নাটকের সঙ্গে। আনুই লিখেছেন: 'আমি পিরানদেল্লো থেকে জন্মেছি, ব্যস। 'লেখকের সন্ধানে ছটি চরিত্র' ...তারপর থেকে আমি নতুন কিছুই লিখিনি।' (*Opera*, Feb. 14, 1951) আনুই-এর কাছে 'লেখকের সন্ধানে' কেবল সুগঠিত নাটকের মৃত্যুবাণই ছিল না, সেখানে তিনি শিখেছিলেন নাটক কীভাবে নাটকের বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করে যেতে পারে।

তিনি কিছুদিন নাট্যবিদ জুভের সহকারী ছিলেন, লোকটিকে তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে একটি বিরাট অঘটন ঘটে যায়। ১৯২৮-এর এক বিকেলে কমেদি দে শাঁজেলিজে'তে জুভে অভিনয় করছিলেন জাঁ জিরোদুর *Siegfried*। 'আমি প্রবেশ করলাম এক রাতের ভেতরে যার থেকে আজও বেরোতে পারিনি, হয়তো পারবও না কোনওদিন। ১৯২৮-এর সেই বসন্তের বিকেলে আমি কাঁদছিলাম, একমাত্র দর্শক, এমনকী হাসির কথাতেও। সে এক আশ্চর্য হতাশা, গর্ব, আনন্দ আর নম্রতার অনুভূতি।' জিরোদু তাঁকে খুঁজে দিলেন সেই গোপন চাবি, 'যা বহুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল', সেই বাক্‌ভঙ্গি যা একই সঙ্গে কথ্য ও কাব্যময়। 'সে এক ধাক্কা। আশা করি, আমি এমন কিছুই করিনি যা জিরোদুর প্রভাব-দুষ্ট। কিন্তু তিনিই আমায় শিখিয়েছেন কীভাবে নাটকের অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে এক কাব্যিক ও কৃত্রিম ভাষা, যা আটপৌরে কথোপকথনের চেয়ে অনেক বেশি খাঁটি। আমি এটা কল্পনাও করতে পারিনি। সে ছিল এক বিরাট উদ্‌ঘাটন।'[২] পিরানদেল্লোর তুখোড় নাটকীয়তা ও জিরোদুর কাব্যিকতাতেই নিহিত আছে আনুই-এর জগৎ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনায়মান ছায়ায় এ এক অস্থির ও ভয়ংকর পৃথিবী। যেখানে চরিত্রেরা ভীষণভাবে অসুখী, প্রায় সকলেই আত্মকেন্দ্রিক ও নীচ। তাদের প্রেম ও সুখের পথে প্রধান কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও অর্থলিপ্সা। যেখানে একটিও সুখী দম্পতি নেই, কেউ তার সন্তানদের ভালবাসতে পারে না। কেউই খাদ্য, পানীয়, শিল্প ও যৌনতায় তুষ্ট নয়।

আনুই-এর নাটকের জগতকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একদিকে আত্মতৃপ্ত, সাধারণ মানুষ, যারা পশুর মতো বেঁচে রয়েছে। অন্যদিকে, সেই উদ্ধত জাতি, la bonne race, যাদের ভাগ্যে আছে হয় এক মহৎ মৃত্যু নয় পুলিশের হাতকড়া। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে, সুখের সঙ্গে আপস করতে এরা অস্বীকার করে। অন্যদিকে, শুদ্ধতা ও পুণ্যের জন্য মানুষের প্রতিটি চেষ্টা এক নিষ্ঠুর ও অসহিষ্ণু পৃথিবীতে নষ্ট হয়ে যায়।

১৯২৯ থেকে আরম্ভ করে, তাঁর প্রথম নাটক *I'Hermine*-এর সময় থেকেই, আনুই তাঁর নাটকগুলিকে নানাভাবে সাজিয়েছেন: পিয়েস নোয়ার, পিয়েস রোজ, পিয়েস ব্রিয়াঁত, পিয়েস গ্র্যাসাঁত, পিয়েস কসত্যুমে, অর্থাৎ অন্ধকার নাটক, সুখী নাটক, উজ্জ্বল নাটক, দাঁতে দাঁত লাগা নাটক, পোশাক

পরা নাটক... কিন্তু কখনওই তিনি এই অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। বিভিন্ন স্বাদ ও মেজাজের নাটকের ভেতর দিয়ে আনুই অনিবার্যভাবে ফিরে এসেছেন সেই ক্ষতের যন্ত্রণায়, সেই একই তিক্ততা, ঘৃণা ও বিদ্রোহের সামনে যার মধ্যে থেকে বেরোবার পথ ছিল না। গ্রিক নাটকের যে পুনর্পাঠ তিনি করতে চেয়েছেন তাতে আন্তিগোনে বা ইউরিডিসের মতো চরিত্রেরা সেই উত্তরণ খুঁজতে চেয়েছে স্বপ্নের ভেতর, কবিতার পৃথিবীতে। যেন সেখানে এক অনন্ত শৈশব। ১৯৬০ সালে *l'Express* পত্রিকা *La Grotte*-এর সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিল: 'তিরিশ বছর ধরে তিনি আমাদের হারিয়ে-যাওয়া শুদ্ধতার কথা বলেছেন যেভাবে অন্যেরা শুনিয়েছেন ব্যভিচারের গল্প।' এই শুদ্ধতাকে কবির মতো, প্রেমিকের মতো মমতায় আঁকড়ে ধরে রেখেছেন তিনি ও তাঁর নায়কেরা। সমালোচক রবের দ্য ল্যুপের ভাষায়, 'মার্সেল প্রুস্ত মানে হারানো শৈশবকে ফিরে পাওয়া, বোদল্যের মানে হারিয়ে যাওয়া শৈশব, আনুই মানে শৈশবকে নিয়ে বাঁচা, যে শৈশব আত্মার এক কোণে লুকিয়ে থাকে, যে মরতে চায় না।'

আনুই-এর কাছে, ক্ষমতা অর্থ সমাজ সবকিছুই যখন মানুষের স্বাভাবিক সারল্য ও শুদ্ধতাকে নষ্ট করে ফেলে, প্রাথমিক পবিত্রতাকে বিষিয়ে দেয় পরিবার ও সমাজ, তখন মৃত্যু ছাড়া কোনও রাস্তা নেই, উত্তরণ নেই (যদি না কেউ এক মিথ্যেকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চায়)। এইভাবে আনুই-এর নাটকে মৃত্যু যেন এক বাড়তি তীব্রতা পায়, হয়ে ওঠে জীবনের চেয়ে উজ্জ্বল। যেমন, আমাদের মনে পড়ছে 'আরদেল' ও 'রেপেতিসিয়ঁ' নাটকদুটির আত্মহত্যা, কিংবা আঁতিগোন ও য়্যরিদিস-এর মহৎ মৃত্যু যা জীবনকে ছাপিয়ে যায়। 'রোমেও ও জানেৎ' নাটকে চরিত্র দুটির ডুবে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

জাঁ আনুই এর প্রধান নায়ক-নায়িকারা—গ্রিক চরিত্রদের বিশ শতকী প্রতিনিধি অর্ফে, আঁতিগোন, মেদে ও জান—সকলেই জীবনকে 'না' বলে। মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে আঁতিগোন জীবনের সঙ্গে আপসের আহ্বানকে সদর্পে প্রত্যাখ্যান করে। অথচ আনুই-এর ক্রেয়ন গ্রিক নাটকের ক্রেয়নের মতো নয় আর, সে কোনও বর্বর অত্যাচারী নয়, সে আরও আধুনিক, নিজের ক্ষমতার সীমানা সে অতিক্রম করতে চায় না। সে কেবল অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধ থেকে রাজ্যকে রক্ষা করতে চায়। আনুই-এর সান্ধ্য পোশাক-পরা রাজা তাই মৃত্যুর

মুখ থেকে আঁতিগোনকে ফিরিয়ে আনতে সর্বতোভাবে ব্যগ্র। কিন্তু এমন এক জীবনের প্রতি দাসখতের বিনিময়ে যা নিতান্ত সাধারণ ও মেকি। যেখানে ব্যক্তির চেতনা ও প্রজ্ঞার কোনও স্থান নেই। আঁতিগোনে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের আইন থেকে পালানোর মুহূর্তে বলে ওঠে: 'আপনাদের আর আপনাদের সুখ আমার জঘন্য লাগে।' ক্রেয়নের আঁকা সুন্দর জীবনের ছবি আসলে সেই অন্তঃসারশূন্যতা, সার্ত্রের 'হারামজাদারা' *(Salauds)* যে-জীবনে বিশ্বাস করে। এদিক থেকে আনুই-এর নায়কেরা অনেকটা সার্ত্র-প্রার্থিত 'সত্যিকার মানুষে'র মতো, অন্যদের দৃষ্টিতে তৈরি নরকের মায়াজাল ছিঁড়ে যারা বেরিয়ে আসতে চায়, নিজের সত্তাকে আবিষ্কার করার এক ভয়ংকর স্বাধীনতা যাদের রয়েছে।

সোফোক্লেসের 'আন্তিগোনে' নাটকের শেষে কোরাস জ্ঞানের কথা বলে। ঈশ্বরের পৃথিবীর নিয়ম যেখানে প্রধান প্রশ্ন। আর আনুই-এর নাটকের শেষে প্রহরীরা তাস খেলে—জীবনের অর্থহীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতার এ এক ভয়াবহ ছবি। ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সে প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় যখন এই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়, তখন ফ্রান্সের মানুষ অনায়াসে ক্রেয়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে মিলিয়ে নিতে পেরেছিল ভিশী শাসনের সঙ্গে। অবশ্য এতে সাহায্য করেছিল আঁদ্রে বারসাকের প্রযোজনায় রক্ষীদের কালো বর্ষাতি, যা তৎকালীন গুপ্ত পুলিশের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। কোরাস আঁতিগোনের 'কর্তব্যে'র কথা বলে। সে-'কর্তব্য' নিজের প্রতি সৎ থাকা। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, নিজেকে আবিষ্কার করা। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার গভীর প্রয়োজন।

'মেদে' বা 'লালুয়েৎ' নাটকের জানও যেন এই একই আত্ম-আবিষ্কারের দোসর। আনুই-এর মেদেয়া নির্ভয়ে জীবনের ভয়াবহ অর্থহীনতার সামনে দাঁড়ায়। নিজের সন্তানদের হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বামীর সঙ্গে তার অতীত জীবনের জঘন্য আপসের চিহ্নকে নষ্ট করে ফেলে। এই আশ্চর্য বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে সে তার নিজের কাছে ফিরে আসে। 'আমি আবার আমার দেশ ও কুমারীত্ব ফিরে পেয়েছি... আমি এতক্ষণে মেদেয়া হলাম। সেনেকা ও ইউরিপিডিসের নায়িকার মতো কোনও অদম্য আবেগ নয়, সে এক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা। আর দ্বিতীয় নাটকটিতে জোন অব্ আর্কের ধর্মীয় অনুষঙ্গগুলিকে সচেতনভাবে অস্বীকার করায় আনুই-এর জান হয়ে ওঠে এক নতুন মানুষ: মানুষের মৌলিক সারল্য ও শুচিতার প্রতীক। সে যেন সেই

মানবিক বোধ থেকে উৎসারিত যার জোরে এই অন্ধ, অবাস্তব পৃথিবীর বাধাবিঘ্ন ও অবমাননাকে অতিক্রম ক'রে নৈতিক ও আত্মিক মূল্যের শিকড় পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া যায়। 'যখন জিনিসটা মনে হচ্ছে কালো, তখন আমি কিছুতেই বলতে পারব না যে তা শাদা।' এই সেই স্বচ্ছতা সমাজপতিরা যাকে চিরকাল ভয় পেয়ে এসেছে। ক্রেয়নের মতো বিশপ কোশঁও (ফরাসি 'কোশঁ' শব্দের অর্থ 'শুয়োরের বাচ্চা') জানকে বাঁচানোর কথা বলে। সে এই ঈশ্বরহীন মরুভূমির ভেতর সমাজের বিরাট ও পুরনো ইমারতটিকে রক্ষা করতে উদ্যত। কিন্তু আঁতিগোনের মতো জানও এই ক্লিন্ন জীবনের সঙ্গে আপসকে প্রত্যাখ্যান করে। সে তার বিশ্বাসকে ধরে রাখতে চায়। আর শৈশবকে। জীবনকে বলতে চায়, 'না'।

জীবনের গতির সামনে দাঁড়িয়ে এই পিছুটান কি আসলে আধুনিক সমাজের বিরুদ্ধে এক নিষ্ফল বিদ্রোহ, যেমন কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন? নাকি তারা বড় হতে ভয় পায়? না তারা অবুঝের মতো শুধু নিজেদের সার্থকতা খোঁজে? এটা কি এক ধরনের automystification ('বেকেট' নাটকে বেকেট রাজাকে বলে, 'আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করব না। আমি শুধু বলব 'না'।' রাজা: 'কিন্তু তুমি যুক্তিহীনের মতো কথা বলছ...।' বেকেট: 'না, তার প্রয়োজন নেই, রাজা। আমাকে কেবল চেষ্টা করে যেতে হবে, যুক্তির তোয়াক্কা না ক'রে—শেষ পর্যন্ত।') আনুই-এর চরিত্রদের বিদ্রোহের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল তারা কোনও বাস্তব সমাধানের ইঙ্গিত দেয় না। এদিক থেকে আনুইকেও আমরা 'অ্যাবসার্ড' বলব। (আনুই যে অ্যাবসার্ড নাটকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার প্রমাণ তিনি স্যামুয়েল বেকেটের 'গোদো' নাটকের প্রথম অভিনয়কে ১৯২৩ সালে প্যারিসে পিরানদেল্লোর নাটকের প্রথম অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করেন। পরে তিনি ইওনেস্কোর 'লে শেজ' [চেয়ারগুলি]-কেও এক যুগান্তকারী সৃষ্টি বলে গণ্য করেন।)

তিনি বারবার শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড়ান। এক চোখধাঁধানো নাটকীয়তার খেলার ভেতর দিয়ে তাঁর নাটক তুলে ধরে এক হতভাগ্য মানুষের ছবি। আত্মিক অখণ্ডতার সন্ধানে বেরিয়ে এ এক চূড়ান্ত হতাশার সামনে দাঁড়ানো। ক্লিন্নতার জমির ওপরে সুখ ও সৌন্দর্যের অবলুপ্তি।

কিন্তু জাঁ আনুই তো বাজিকর। তাঁর অনন্যতা এইখানেই যে তিনি জানেন নাটক কীভাবে নাটকের বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করে যায়। জীবনের হাতে

মানুষের এই লাঞ্ছনা তো আসলে অভিনেতার জয়, যেখানে মানুষ অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে তার ভাগ্যকে নিয়ে খেলতে পারে।

আসলে তো এটা একটা খেলা। এক কঠিন আর দুর্দান্ত মুখোশের খেলা। আধুনিক ফরাসি থিয়েটারে এ-কথা আনুই-এর চেয়ে আর কেউ ভাল বুঝেছিলেন বলে মনে হয় না।

উল্লেখপঞ্জি

১. আনুই কিছু নাটকের ফরাসি অনুবাদও করেছেন, যেমন অসকার ওয়াইল্ডের *Importance of Being Earnest*, শেক্‌সপীয়রের *Twelfth Night*, রজে ভিত্রাকের *Victor* ও গ্রাহাম গ্রীনের *The Complacent Lover*! চিত্রনাট্য লিখেছেন 'মসিয়ো ভ্যাঁসাঁ' ('৪৭) ও 'বেকেট' ('৬৩) ছবির।

পরিচালক হিসেবে আনুই-এর জনপ্রিয়তার নমুনা: মোঁপারনাস গাস্তঁ-বাতি'তে আনুই (ও রলাঁ পিয়েত্‌রি) পরিচালিত নাটকগুলির মধ্যে *L'Alouette* (৫২) নাটকটি ৬০৮ বার ও 'বেকেট' নাটকটি ৬১৮ বার অভিনীত হয়।

২. জিরোদুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ কখনও আসেনি, শুধু একবার ছাড়া। ১৯৪৩-এর এক শীতের বিকেলে ওঁরা একসাথে খান। স্বভাবত লাজুক ও স্বল্পবাক্ আনুই একটি কথাও বলতে পারেননি। 'আমি আপনাকে ওভারকোট পরতে সাহায্য করলাম, আপনার কলার উল্টিয়ে দিলাম যাতে আপনার শীত না লাগে...। আমি এটা কাউকে কখনও করি না। হঠাৎ আমার খুব অস্বস্তি লাগল আর আমি আপনাকে ছেড়ে দিলাম।' (*Hommage à Giraudoux*, জিরোদুর মৃত্যুর পরের দিন *Chronique de Paris* পত্রিকায়, ১৯৪৪।)

১৯৮৫

শূন্যতার মহাকাব্য

দু'পায়ের ফাঁকে একটুখানি কালো ধুলো। দুটি পা অবশ, হুইল চেয়ারে বসে আছে এক অন্ধ মানুষ। সে উঠে দাঁড়াতে পারে না। তার সঙ্গী পারে না বসতে। পাশেই ডাস্টবিনের মধ্যে তার হাত-পা কাটা বাপ-মা। বাইরে এক ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিশ্বচরাচর। এ কি মহাসংগীত, মহাকবিতা, না মহাশূন্যে আঁকা খোদাইচিত্র? এই কি শেক্সপীয়ারের কিং লিয়রের উত্তরসূরি, যেমন ভেবেছিলেন পোলিশ সমালোচক ইয়ান কট?

এই অবিস্মরণীয় নাটকের ('ফ্যাঁ দ্য পার্তি', ওরফে 'এন্ডগেম') রচয়িতা স্যামুয়েল বেকেটের (১৯০৬-১৯৮৯) জন্ম হয়েছিল একশো বছর আগে, ১৯০৬ সালের ১৩ এপ্রিল গুড ফ্রাইডের দিন আয়ারল্যান্ডে ডাবলিনের কাছে ফক্সরক শহরে। এও কি এক আশ্চর্য সমাপতন নয় যে, সেটাই ছিল ইবসেনের মৃত্যুর বছর? এক দিকে, সমাজ বদলানোর থিয়েটারের মহত্তম কান্ডারির মৃত্যু, আর অন্য দিকে মানুষের অন্তহীন অসহায়তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চরূপকারের জন্ম। তাঁর মাত্র এক বছর আগে অনতিদূরে ফ্রান্সে জন্মেছিলেন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে লড়াই করা আরেক দার্শনিক জাঁ-পল সার্ত্র।

আইরিশ প্রোটেস্টান্ট পরিবারে সার্ভেয়ার বাবা ও সেবিকা মায়ের সন্তান স্যামুয়েল চোদ্দো বছর বয়সে পোর্টোরা রয়াল স্কুলে ভর্তি হন, যেখানে এক সময় ছাত্র ছিলেন অস্কার ওয়াইল্ড। ১৯২৭ সালে ট্রিনিটি কলেজ থেকে ফরাসি ও ইতালিয়ানে স্নাতক। পরের দু'বছর ফ্রান্সের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একোল নরমাল স্যুপেরিয়র-এ ইংরেজির অধ্যাপক। ১৯৩৭ থেকে প্যারিসেই পাকাপাকি ভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে আরেক দেশত্যাগী জেমস জয়েসের সঙ্গে দেখা। বিশ শতকের দুই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের সেই নৈঃশব্দ্যময় কথোপকথন তো আজ কিংবদন্তি। তাঁদের মাঝখানের নৈঃশব্দ্যকে ভরিয়ে রাখত এক সীমাহীন বেদনা। দীর্ঘকায় ও ক্ষীণ মানুষ দুটি অনেকটা একই ভঙ্গিতে বসে থাকতেন, পা দুটি ভাঁজ করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপরের পায়ের আঙুলগুলি অন্যটির চেটোর নীচে ঢোকনো। জয়েসের জীবনীকার রিচার্ড এলম্যান লিখেছেন, বেকেট জয়েসকে ফ্রিৎস মাউতনারের লেখা পড়ে শোনাতেন যিনি তাঁর 'ক্রিটিক অফ ল্যাংগুয়েজ' বইতে ভাষার অপ্রকাশ্যতার কথা তোলেন। দৃষ্টি কমে আসায় জয়েস তাঁকে 'ফিনেগানস্ ওয়েক' উপন্যাসের কোনও কোনও অংশের শ্রুতিলিখন দেন। বেকেট মাঝে মাঝে জয়েসের মানসিক ভারসাম্যহীন কন্যা লুসিয়াকে নিয়ে থিয়েটার ও রেস্তোরাঁয় যান, কিন্তু তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া বেকেটের উপায় ছিল না, কারণ তিনি নিজে 'মৃত', তাঁর কোনও 'মানবিক অনুভূতি' অবশিষ্ট ছিল না। বেকেট লুসিয়াকে নিষ্ঠুর ভাবে জানিয়ে দেন, জয়েসের সঙ্গে দেখা করার জন্যই তিনি তাঁদের ফ্ল্যাটে আসেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩০ সালেই তিনি লিখে ফেলেছেন প্রুস্তকে নিয়ে একটি স্বগতকথন ছাড়াও 'হোরোস্কোপ' নামে এক দীর্ঘ কাব্যিক স্বগতোক্তি, যেখানে দার্শনিক দেকার্ত সময়, মুরগির ডিম ও বিলুপ্তি নিয়ে চিন্তা করছেন! যুদ্ধের সময়ে তিনি এক ফরাসি প্রতিরোধী দলে যোগ দেন, পরে তাঁকে দক্ষিণ ফ্রান্সের এক অনধিকৃত অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে চাষের কাজ করতে হয়। এক সময় একটি রেড ক্রস ইউনিটেও যোগ দেবেন।

বেকেট তাঁর যুগান্তকারী নাটক ও উপন্যাসগুলির প্রায় কোনওটিই মাতৃভাষা ইংরেজিতে লেখেননি, লিখেছেন ফরাসিতে। ১৯৬৮ সালে ল্যুদোভিক জাঁভিয়েকে বলেন, নিজেকে 'আরও নিঃসম্বল করে তোলার জন্য' এই সিদ্ধান্ত। যেন ভাষার সঙ্গে এক যন্ত্রণাক্ত লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। পরে তিনিই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, কিন্তু ফরাসি না জানলে রচনাগুলির অপরিহার্য কিছু মাত্রা হারিয়ে যায়।

১৯৩৮ সালে হার্বার্ট রীডের সহযোগিতায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম ইংরেজি উপন্যাস 'মারফি' সফল হয়নি। বিখ্যাত সমালোচক মরিস নাদোর মতে, ফরাসিতে রচিত 'মলয়' উপন্যাসটিই বেকেটকে এক লাফে কাফকা ও জয়েসের পাশে বসিয়ে দেয়। স্মৃতি-হারানো মলয়ের দুটি পা একে একে অবশ, সে পেট আর কনুই দিয়ে মাটি ঘষটে চলে—মৃত্যুপথযাত্রী মা'র কাছে পৌঁছনোই তার লক্ষ্য, যদিও সে কোনও দিন সেখানে পৌঁছতে পারে না। যেন মানুষ ফিরে গেছে শূককীটের স্তরে; এ যেন তার মূলগত দারিদ্রের ছবি। বেকেটের ভুবন-বিখ্যাত নাটক 'ওয়েটিং ফর গডো'র মূল ফরাসি রূপ

'আঁনাতাঁদাঁ গোদো' প্রথম অভিনীত হয় প্যারিসের তেয়ার্ত্র দ্য বাবিলোনে, ৫ জানুয়ারি ১৯৫৩। একই সঙ্গে স্বচ্ছ ও দুরূহ, যৌনতা ও বাইবেলের অনুষঙ্গে ভরা, রগুড়ে ও নৈরাশ্যময়; এক দিকে সার্কাস ও স্ল্যাপস্টিক কমেডি, অন্য দিকে এক অতলান্ত অন্তর্বীক্ষা! যেন একই সঙ্গে মানুষের দুর্দশার ছবি আঁকছেন এক সার্কাসের ভাঁড় এবং দান্তে আলিগিয়েরি। তাঁর একমাত্র চলচ্চিত্রের একমাত্র চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নির্বাক চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট কমেডিয়ান বাস্টার কীটনের নির্বাচন তাই এত অর্থময় হয়ে ওঠে।

একবার প্যারিসের রাস্তায় একটি অচেনা লোক বেকেটকে ছুরি মারে। তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কয়েদখানায় গিয়ে আততায়ীকে জিগ্যেস করেন, কেন মারতে চেয়েছিলে? সে উত্তর দেয়, জ্য ন্ সে পা, তা তো জানি না। এই উত্তর হয়ে ওঠে বেকেট-বিশ্বের যন্ত্রণাক্ত সারাৎসার। গোদো কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বেকেট বলেছেন, তা তো জানি না।

'আঁনাতাঁদাঁ গোদো' (While *waiting for Godot*, এই ছিল ফরাসি নাটকটির নাম) নাটকের বিষয় যে গোদো নয়, মানুষের অন্তহীন অপেক্ষা, এ কথা বহুবার বলা হয়েছে। মার্টিন এসলিন বালজাকের কমেডি 'ল্য ফোজর'-এর চরিত্র মেরকাদে-র একটি উক্তি স্মরণ করেছেন: 'তুল মঁদ আ সঁ গোদো, অ্যাঁ ফো ক্রিস্তফ কোলবঁ।' (প্রত্যেকেরই রয়েছে এক নিজস্ব গোদো, এক জাল ক্রিস্টোফার কলম্বাস।) ব্যক্যটি যেন মুহূর্তের মধ্যে হয়ে ওঠে বেকেটের নাটকের ভাবনাকঙ্কাল।

ফরাসি লিখন ও ইংরেজি পুনর্লিখনের দুই বৈদ্যুতিক তারের অন্তর্বয়ন বেকেটের নাটকের খাঁজে খাঁজে মিশে থাকে, দ্বিতীয় ভাষায় প্রথমে লেখা ও মাতৃভাষায় দ্বিতীয়বার লেখার মধ্যে এক পরস্পরান্বয়ী বহুমাত্রিকতা তৈরি হয়। একটি টেক্সট অন্য একটি টেক্সটের ভেতর সেঁধোনোর চেষ্টা করে, একই সঙ্গে একটা সংঘাত আর খেলা চলে। 'গড' শব্দটির ইংরেজি অনুষঙ্গটিকে যেন ভেতর থেকে পুড়িয়ে দেয় ফরাসি অপভাষায় 'গোদিয়ো' (godillot) বা 'গোদাস' (godasse) যার মানে জুতো! অথবা ফরাসি অপভাষায় বিকৃত 'গড' শব্দটি (এটি নিশ্চয়ই ইংরেজি-ফরাসি সাংস্কৃতিক সংঘাতের চিহ্ন) যার অর্থ সমকামী মহিলাদের ব্যবহার করা কৃত্রিম পুরুষলিঙ্গ। সুতরাং সহজ ব্যাখ্যার কাঠামো ভেঙেচুরে যায়। তেমনি ভাবেই 'ওয়েটিং ফর গোদো' নাটকে লাকির দীর্ঘ স্বগতোক্তিতে আকাদেমি শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে থাকে শিশুদের ব্যবহার

করা একটি ফরাসি অপশব্দ 'কাকা' (caca), যার অর্থ বিষ্ঠা! সুতরাং বেকেটীয় নাটকের দ্বিভাষিক চরিত্র সম্পর্কে সচেতন না হলে তাঁর বিশ্ববীক্ষাকে বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে না তাঁর নাটকের ভাঙচুরকে।

তাঁর অধিকাংশ রচনায় যে এক জোড়া চরিত্র দেখা যায় (এসত্রাগঁ/ ভ্লাদিমির, পোৎসো/ লাকি, হ্যাম/ ক্লোভ, পুরনো ক্র্যাপ/ নতুন ক্র্যাপ), তারা যেন পরস্পরের পরিপূরক। তাদের পারস্পরিক অপরিহার্যতা (পরে যাদের তিনি বলবেন 'pseudo-couple') এক জটিল দ্বিমুখী মানবসম্পর্ক তুলে ধরে, সেইসঙ্গে পাশাপাশি ফুটে ওঠে এক বিভাজিত ব্যক্তিসত্তা।

বেকেট বলেছিলেন, চিন্তার আকার তাঁকে মুগ্ধ করে। নাটকের পর নাটকে শূন্যের এই দম বন্ধ করা নিখুঁত বিন্যাস আমাদেরও মোহিত করে রাখে। এবং নাটকগুলিকে দেয় তাদের হয়ে ওঠার কাঠামো।

বেকেটের টেক্সটের যেন একটাই উদ্দেশ্য, এক অব্যক্তকে প্রকাশ করা: 'আমায় কথা বলে যেতে হবে, তা তার যে মানেই দাঁড়াক। কিছু বলার নেই, অন্যের শব্দ ছাড়া কিছু বলার নেই, তবু আমায় কথা বলে যেতে হয়...আমায় সমুদ্রপান করতে হবে, সুতরাং সমুদ্র আছে।'

তাঁর উপন্যাস, কবিতা ও নাটক সবই এক অবিচ্ছিন্ন অন্তর্কথন (monologue intérieur)। যা অস্তিত্বের সবচেয়ে গোপন ও নির্জন কোরক থেকে উঠে আসে, অথচ যা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যার অতীত নেই বা ভেঙেচুরে প্রায় অচেনা হয়ে গেছে।

কাহিনিকথকেরা বারবার একই ভাঙা গল্প বলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। স্মৃতি পুনর্নির্মাণের অসম্ভাব্যতা বেকেটের রচনায় বারবার আসে। প্রায় সবকিছু মৃত, অবসিত— নৈঃশব্দ্যে মুছে যাওয়া থেকে যা আটকে রেখেছে তা হল এই জীবন যা শূন্য। তাঁর চরিত্রদের 'বাঁচা' শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু মৃত্যু এখনও আসেনি। ধ্বংসের এই গোধূলিতে বস্তুরা দূরে সরে যায়। শব্দেরা দাঁড়িয়ে থাকে, উলঙ্গ, বিমূর্ত প্রায় চিত্রকল্পহীন।

'আমাদের কথার কি কোনও... মানে হতে শুরু করেছে?

— অ্যাঁ!... তোমার আমার কথার মানে!'

বেকেটের চরিত্রেরা নিরন্তর 'কথা' বলে যায়, সেই শেষ কথা খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায় যা অতল নৈঃশব্দ্যে তলিয়ে যাবে। তাঁর শেষ পর্বের রচনায় ক্রমশ এই বিড়বিড়ানিও থেমে যায়। শুধু থাকে নৈঃশব্দ্য। কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুলতে পারবে মাদার পেগকে, '(who) died of darkness?'

বেকেট একটিই বই লিখেছেন, আবহমানের বিস্তারে দীর্ঘায়িত করে নেওয়া একটিই মুহূর্তের অন্তহীন উপাখ্যান। এক আণবিক অস্তিত্বের কথা, যাকে অ্যাবসার্ডিটির মানদণ্ড ছাড়া মাপা যায় না। যা ঘোষণা করতে চায় তা শূন্য থেকে এসেছে, আবার শূন্যেই ফিরে যাবে।

ফরাসি সমালোচক পিয়ের দ্য বোয়াদেফ্‌র আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে আমরা সার্ত্র-এর উপন্যাস 'লা নোজে' (বিবমিষা)-র নিয়ন্ত্রিত অন্তর্কথন (monologues policés) থেকে অনেক এগিয়ে এসেছি, কারণ একই শূন্যতা বোঝাতে চেয়ে সার্ত্র এমন এক রেটরিক ব্যবহার করেছিলেন যাকে তিনি অস্বীকার করতে চান। কিন্তু বেকেটের নাটকের কথা যুক্তিকে খুইয়ে সেই শূন্যতাকে আবহশরীরে ধারণ করতে চেয়েছে। বোয়াদেফ্‌র-এর ভাষায়: 'এইখানে শেষ হল সাহিত্যের রাত্রি অতিক্রম করে আমাদের যাত্রা। আমরা আর শিল্পের কথা, সৃজনের কথা বলব না... সাহিত্যের বাইরে, সব কিছুর বাইরে এক আন্ত্রিক অনস্তিত্বের (une inexistence viscérale) জন্ম হচ্ছে।'

তাঁর সমসাময়িক য়্যজেন ইওনেস্কোর মতো বেকেটও বলতে পারতেন, 'কোনও সমাজই মানুষের বিষণ্ণতাকে মুছে দিতে পারেনি, কোনও রাজনৈতিক পদ্ধতিই বাঁচার যন্ত্রণা থেকে, মৃত্যুভয় থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারেনি। মানবাবস্থাই নির্ধারিত করে দেয় সমাজের অবস্থা, উল্টোটা নয়।' উত্তর-আধুনিক যুগের কোনও সৃষ্টিই তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। শূন্যতার এই মহাশিল্পী যেন সকলেরই পিতা। পণ্ডিতেরা যত বার আধুনিকতার নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন, মানবাবস্থার এই মহান দ্রষ্টা তাঁদের অতিক্রম করে যান।

২০০৬

আয়না ভাঙতে ভাঙতে

ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে মর্মন্তুদ ও বিতর্কিত শতাব্দীটি শেষ হল যখন, তখন সেটিকে সহস্রাব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বিস্তর লম্ফঝম্প করা হল, কিন্তু 'সময়প্রসৃতির পটভূমিকায়' (জীবনানন্দের ভাষায়) নিজেকে ও পৃথিবীকে বুঝে নেওয়ার সত্যিকারের কোনও চেষ্টাই হল না। একশো বছরে বাঙালি চিন্তাজগতে কম টানাপোড়েন তো চলেনি। তবু খানিকটা ধূসর বাতাস খেয়ে মুখ আচমন করে বসে রইলাম আমরা।

অথচ ভিড়ের আহাম্মুকি থেকে দূরে, নিভৃত আয়নার সামনে দাঁড়ানোর নির্ভয় ও নির্মোহ কাজটি যাঁরা করার চেষ্টা করেন, সেই ফরাসিদেরই একজন লিখলেন এমন একটি বই, যা পেঁয়াজের খোসার মতো চিন্তার ইতিহাসকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দেখতে চাইল, এক অনুপুঙ্খময় অন্তর্মানচিত্রের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইল আমাদের: বইটির নাম 'ল্য সিয়েকল্ দে জ্যাঁতেলেকত্যুয়েল' (বুদ্ধিজীবীদের শতক)। আমাদের মনে পড়বে বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের নিয়ে রেমঁ আরঁ-র *L'Opium des intellectuels*, লুই বোদ্যাঁর *Les intellectuels*, রেজি দ্যব্রের *Le pouvoir intellectuel en France*, পিয়ের বুরদিও-র *Homo Academicus*, সার্ত্র-এর *Plaidoyer pour les intellectuels*, এমনকী পিয়ের আসুলিন বা জাঁ-ফ্রাঁসোয়া সিরিনেলির বইয়ের কথা।

বিখ্যাত প্রকাশক স্যই-এর এই ৭০০ পৃষ্ঠার বইটিতে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক মিশেল ভিনক কালক্রম অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে চেয়েছেন, যা ব্যক্তির ইতিহাস ততটা নয় যতটা চিন্তা ও কাজের, সংঘাত, বন্ধুত্ব ও ঘৃণার। শতাব্দীকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন লেখক: মরিস বারেস, আঁদ্রে জিদ ও জাঁ-পল সার্ত্র-এর যুগ, যার ভেতর দিয়ে সমকালের ঘটনাবলি ও সার্বিক তাৎপর্য বুঝতে চেয়েছেন, আবিষ্কার করতে চেয়েছেন প্রধান ও অপ্রধান অংশগ্রহণকারীদের; তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ, মধ্যাহ্নভোজন, বন্ধুত্ব, বিরক্তি ও নির্বুদ্ধিতা, পারস্পরিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্রমণকে। স্বচ্ছমনা অথবা পক্ষপাতদুষ্ট যাই হোন না কেন, প্রতিবেশকে প্রভাবিত করতে পারুন বা না পারুন, তাঁরা দায়বদ্ধ এক লড়াইয়ে শামিল হয়ে যান। দার্শনিক, শিল্পী ও বিজ্ঞানীরাও বিতর্কে অংশ নিলেও, লেখকদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য, মনে করেছেন ভিনক। তাঁর কাছে তিনটি কালপর্বে তিনজনের নাম প্রতীকী তাৎপর্য বহন করেছে: দ্রেফ্যুস-কেলেঙ্কারি (যে সময়ে ফরাসি ভাষায় প্রথম 'ইনটেলেকচুয়াল' কথাটির বর্তমান অর্থে প্রয়োগ) থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বারেস (১৮৬২-১৯২৩); দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে আঁদ্রে জিদ (১৮৬৯-১৯৫১) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবমাননার থেকে মুক্তির পরবর্তী পর্যায়ে জাঁ-পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০)। ওই তিনজনকে দেখে একদিকে ফরাসিরা মুগ্ধ হয়েছে, অন্যদিকে ঘৃণা ও অনুকরণও করেছে ব্যাপকভাবে। বুদ্ধিজীবীদের খতিয়ানে ভিনক তাঁদেরই নির্বাচন করেছেন যাঁদের অংশগ্রহণ তাঁর মতে সবচেয়ে 'অর্থময়' ('chargé de sens')।

১৮৯৭ সালের ১৫ নভেম্বর 'লা রভ্যু ব্লাঁশ' পত্রিকায় লেয়ঁ ব্লুম লিখেছিলেন: 'বারেস না থাকলে ও না লিখলে তাঁর সময়টা অন্যরকম হয়ে যেত এবং আমরাও অন্যরকম হতাম।' ১৯১১ সালে বারেস-এর *Scènes et Doctrines du nationalisme* গ্রন্থের একটি উক্তি মনে পড়ে: 'যুক্তি দিয়ে চিন্তার সমন্বয় সম্ভব হবে না, তার সঙ্গে দরকার আবেগের শক্তি (force sentimentale)।' ১৮৯৭-এর ডিসেম্বরে ন্যই-র বুলভার মাইয়ের এক ছোট হোটেলে লেয়ঁ ব্লুম যখন বারেসের সঙ্গে দেখা করতে যান, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ১৮৯৪ সালে ক্যাপ্টেন আলফ্রেদ দ্রেফ্যুস-এর বিচারের রায় বদলানোর জন্য সই সংগ্রহ করা। ওই রায়ে দ্রেফ্যুসকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে কালিমালাঞ্ছিত করে জাহান্নামে (গায়ানায়) পাঠানো হয়; অতঃপর দ্রেফ্যুস-এর পরিবার, বিশেষ করে ভাই মাতিয়্য, বেরনার লাপার নামে এক লেখকের সাহায্যে অসাধ্যসাধন করে অবিচার প্রমাণ করেন। যে কয়েকজন ব্যাপারটি জানতে পারেন, তাদের মধ্যে ছিলেন 'লা রভ্যু ব্লাঁশ' পত্রিকার লেয়ঁ ব্লুম প্রভৃতি লেখকেরা। ফরাসি জাতীয়তাবাদের 'বৃহত্তম' লেখকের সঙ্গে ভবিষ্যতে সোসালিস্ট পার্টির প্রধান ও পপুলার ফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রীর সংযোগবিন্দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিনক জানাচ্ছেন, মতবাদ সব কিছু নির্ধারণ করে না। বারেসের দ্বারা 'মন্ত্রমুগ্ধ' ফরাসি প্রজন্মের একজন সদস্য হিসেবে ব্লুম তাঁকে ঘিরে 'এক ইস্কুল, প্রায় এক রাজসভা'-র কথা লিখেছেন। বারেস

ব্লুমকে জানান তিনি দ্রেফ্যুস প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই জোলার সঙ্গে দেখা করেছেন। পরে জানা গেল জোলার বিখ্যাত প্রতিবাদী রচনা 'J'accuse'-কে তাঁর 'উদ্ভট' লেগেছিল; এবং তিনি ব্লুমের আবেদনপত্রে সই করেননি, 'চিন্তা করবেন' বলে, কারণ 'জাতীয় অনুভূতি'-ই আসল। তিনি শিষ্যদের তোয়াক্কা না করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দ্রেফ্যুস-এর বিরুদ্ধে, তাঁর কাছে একদিকে দ্রেফ্যুস, অন্যদিকে ফ্রান্স। অচিরে বারেসের দল ইন্টেলেকচুয়ালদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। অচিরে বারেসের দল সারা ফ্রান্সের মস্তিষ্ক-প্রক্ষালন করে ফেলল। এবার দ্রেফ্যুস-এর পক্ষে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন একোল নরমাল স্যুপেরিয়রের গ্রন্থাগারিক ল্যুসিয়্যাঁ হের, যাঁর অসমাপ্ত বইটির নাম 'চিন্তার অগ্রগতি ও মানবমুক্তি'। তিনি জাঁ আলমানের বিপ্লবী শ্রমিক পার্টির সদস্য হয়ে নিজের স্থানাঙ্ক আরও স্পষ্ট করে দিলেন। বললেন, দ্রেফ্যুস-এর দিকে রয়েছে 'সত্যিকারের মানুষ, ভাবুক মানুষ, শেকড়হীন ও বিচ্ছিন্ন মানুষ।' বারেস লিখলেন, একদিকে সমগ্র (collectivité), সামাজিক সংরক্ষণবাদ, অন্যদিকে 'বিচারের বিমূর্ত ভাবনা', প্রজাতন্ত্রী মতবাদ, যা বাস্তবের দিকে পিঠ করে আছে। এদিকে জোলা ঘোষণা করলেন, 'সত্য এগিয়ে চলেছে, কিছুই তাকে থামাতে পারবে না।... এটা অংকের মতো।' ১৮৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে 'ফ্রান্সকে চিঠি'-তে লিখলেন, 'ফ্রান্স, তুমি আবার মহান হয়ে ওঠো, নিজের কাছে ফিরে এসো, নিজেকে খুঁজে পাও।' ক্রমশ দ্রেফ্যুসের বিচারের পুনর্বিবেচনার জন্য জোলার নামের পাশে যাঁরা সই করলেন তাঁরা হলেন আনাতোল ফ্রাঁস; পাস্তর ইনস্টিটিউটের পরিচালক এমিল দ্যুক্লো, ফেলিক্স ফেনেয়ঁ, মার্সেল প্রুস্ত, জর্জ সোরেল, ক্লোদ মনে, এমিল দুর্কহাইম...। ভিনক লিখছেন, 'রাস্তায় যখন ইহুদিবিরোধী চিৎকার, সেনাবাহিনীর পক্ষে ও জোলার বিরুদ্ধে হুল্লোড়, তখনই দেখা গেল এক নতুন শক্তির জন্ম হচ্ছে: 'বুদ্ধিজীবী।' 'দিগন্তের সবদিক থেকে' এক ক্ষুদ্র ইহুদি অফিসারের পাশে দাঁড়ালেন 'বুদ্ধিজীবীরা' (*L' Aurore* পত্রিকায় জর্জ ক্লেমাঁসো-র ব্যবহৃত শব্দ): ২৬১ জন শিক্ষক, ২৩০ জন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। এদিকে 'বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ'-এর বিরুদ্ধে সাবধান করে দিয়ে বারেস বললেন, ওই অভিজাতেরা 'ঘৃণ্য জনতা'-র থেকে পৃথক হতে চায়। বললেন, জোলা ফরাসিই নয়। ওদিকে ২৯ অক্টোবর বিচারশালা মাদাম ল্যুসি দ্রেফ্যুসের আবেদন মঞ্জুর করে। পরে ১৯০৮ সালে জোলার

ভস্মকে পাঁতেয়ঁ-তে সমাধিস্থ করার দিন মুক্ত আলফ্রেদ দ্রেফ্যুস স্বয়ং উপস্থিত হলে তিনি রিভলবারের গুলিতে আহত হন।

১৯৫১ সালে 'জীবন্ত জিদ' প্রবন্ধে সার্ত্র লিখেছিলেন পূর্ববর্তী তিরিশ বছরে 'সমস্ত ফরাসি চিন্তা'-র ওপর মার্কস, হেগেল, কির্কেগার্দের সঙ্গে জিদের প্রভাবের কথা। মঞ্চ থেকে বারেসের প্রস্থান ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে জিদের প্রবেশ প্রায় একই সঙ্গে ঘটে। জিদের বয়স তখন চুয়ান্ন, কয়েকটি বই লিখে তিনি তখন খ্যাতির শীর্ষে। জিদের ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অভিযোগ তিনি তরুণদের নষ্ট করছেন ও সাহিত্যের মর্যাদাহানি করছেন। মোট কথা, সর্বত্র জিদই বিতর্কের কেন্দ্রে। এই সময়, নৈতিকতা নিয়ে জিদের প্রকাশ্য তর্ক বাধে বিশিষ্ট কবি ও ক্যাথলিকদের ধ্বজাধারী পল ক্লোদেল-এর সঙ্গে। জিদ-পরিচালিত (নাম ছাপা হত না) 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ' ১৯২০ সালের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সাহিত্য পত্রিকা হয়ে দাঁড়ায়। লেখকেরা ছিলেন জিদ ছাড়াও প্রুস্ত, জুল রম্যাঁ, জাঁ জিরোদু, আঁরি দ্য মঁতেরলাঁ, আঁদ্রে সালমঁ, দ্রিয় লা রোশেল, পল মরাঁ, পল ভালেরি, ভালেরি লারবো, জাঁ পলাঁ, মার্সেল জুয়াঁদো, আলবের তিবোদে, আঁদ্রে স্যুয়ারেস, জাঁ কক্‌তো, ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক, জ্যুলিয়্যাঁ গ্রীণ, লুই আরাগঁ, পল এল্যুয়ার, ফিলিপ সুপো, আঁদ্রে ব্রোতঁ। দাদাবাদীদের নায়ক তো জিদেরই নায়ক লাফকাদিও। এদিকে বারেসের শিষ্য বারেসের চেয়েও বারেসীয় আঁরি মাসিস (যিনি 'ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রম্যাঁ রলাঁ' নামে এক পুস্তিকা লেখেন) জিদের 'নোংরামি'-কে ভর্ৎসনা করেন। প্রত্যুত্তরে জিদ 'করিদঁ' নামে বোমাটি ছোঁড়েন, যেখানে ছিল শিশুকামিতার জয়গান। তাঁর আত্মজীবনী 'সিল গ্র্যাঁ ন্য ম্যর' বিশুদ্ধবাদী ধর্মীয় পরিবারে যৌনতার সমস্যার কথা বলে। এই প্রকাশ্য স্বগতোক্তি তাঁকে এক লহমায় এক সত্যদ্রষ্টা ও এক 'মহান সমসাময়িক' (contemporain capital) করে তোলে।

এরই পাশাপাশি রম্যাঁ রলাঁর শান্তিবাদী ভূমিকা ও সন্ত্রাসবিরোধিতা, কমিউনিজমের লক্ষ্য ও উপায়ের বিরোধ নিয়ে ১৯২১-২২ সালে আঁরি বারব্যুসের সঙ্গে বিতর্ক। শেষে তিনি বিশের দশকে এশিয়া ও ভারতের দিকে মুখ ফেরান। তিনি মনে করতেন ইউরো-মার্কিন ব্লকের বিরুদ্ধে বিপ্লবী রাশিয়া এক 'প্রয়োজনীয় ভারসাম্য' এনেছে। পরে ১৯৩৪ সালে গোর্কির আমন্ত্রণে মস্কো যাত্রার সময় থেকে তিনি স্পষ্টভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের

মানস-পরিসরে পৌঁছে যান। অধিকাংশ ফরাসির মতো ভিনকও বিশ্বাস করেন ১৯৩২ সালে মারিয়া পাভলোভা কুদাশেভাকে বিয়ে করার পর ভিলি ম্যুনৎসেনবার্গ ও কোমিনটারনীয় প্রচারের পথ ধরে ওই রমণী তাঁর নতুন স্বামীর সমস্ত সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন। ভিনক লেখেননি যে মস্কো বিচার ও সোভিয়েত-জার্মান চুক্তির সময় রলাঁ গভীর বিপন্নতা বোধ করেছিলেন।

তিরিশের দশকে জিদও মানবাধিকারের প্রশ্নে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন, যদিও রলাঁর মতো তিনিও পার্টির সদস্য হননি। তাঁর নতুন বই *Les Nouvelles Nourritures terrestres*-এর নায়ক বলে: 'অন্যের সুখেই আমার সুখ।' অতঃপর ১৯৩৬ সালে সরকারি আমন্ত্রণে মস্কো যাত্রা করেন জিদ, এবং ফিরে এসে *Le Retour de L'URSS* ('সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রত্যাবর্তন') নামে এক বোমা নিক্ষেপ করেন। 'এ এক হাস্যকর প্রবঞ্চনা! কোনও অবস্থাতেই আমি ওই মিথ্যাকে, ওই অপরাধকে স্বীকার করে নিতে রাজি নই।' ভিনক জানাচ্ছেন, ১৯৩৭-এর মধ্যে ৯টি সংস্করণ ও ১৫০০০০ কপি বিক্রি হয় সেই বইয়ের। আর দক্ষিণপন্থা? ১৯৪২ সালে পেত্যাঁ সরকারের জমানায় দ্রিয় লা রশেল যখন 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ'-কে সরকারি তাঁবেদারির দিকে নিয়ে যেতে চান, জিদ তাঁর পত্রিকা থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর অনমনীয়তার প্রতিবাদে উপদেষ্টা পরিষদ তাঁকে জেলে পোরার পরামর্শ দেয়।

প্রায় একই সময় প্রকাশিত হয় স্পেন-ফেরত জর্জ বেরনানোসের 'লে গ্রাঁ সিম্‌তিয়ের সু লা ল্যুন' (চাঁদের নীচে বিরাট বিরাট সমাধিক্ষেত্র)। জিদের সঙ্গে যতই দূরত্ব থাক, দু'জনেই হৃদয় দিয়ে, এমনকী নৈতিকতা দিয়ে রাজনীতিকে বুঝতে চেয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে ফ্রাঁসোয়া মরিয়াকের সঙ্গে বিচ্ছেদের মুহূর্তে তিনি তাই লিখেছিলেন যা জিদও লিখতে পারতেন: 'ফরাসিদের যুক্তির আকাল পড়েনি, তাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হল ধৈর্যশীল অনুভূতির বিনিয়োগ।'

এ বইয়ের তৃতীয় অংশের নাম 'দেজানে সার্ত্র', সার্ত্র-এর বছরগুলি।

১৯৪৫ সালের ৮ নভেম্বর তাঁর জার্নালে রজে মারত্যাঁ দ্যু গার এই স্বগতোক্তি করেছিলেন: 'সার্ত্র দিশার সন্ধানী সমস্ত তরুণকে টেনে নেবেন। এক রাজকীয় আন্দোলন দানা বাঁধছে... এক নতুন বাড়ি তৈরি হতে চলেছে যেখানে বাস করবে আগামী দিনের সত্য। আর আমরা আমাদের অদৃশ্য হওয়া

ছাড়া উপায় থাকবে না। কেউ নিন্দিত হবে, কেউ ডুবে যাবে বিস্মৃতিতে...।' সোভিয়েত ইউনিয়ন বিষয়ক বজ্রপাতের পর জিদ ধীরে ধীরে বিবেকের দিশারীর ভূমিকা থেকে সরে যাচ্ছিলেন। ফ্রান্সে জার্মান অবস্থানের সময় তাঁর অবসরগ্রহণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। পরে ছেড়ে দিলেও ১৯৪০-৪১-এ 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ'-এর দুটি সংখ্যায় তিনি লিখলেন কেন? ফ্রান্সেই যা সম্ভব, মারত্যাঁ দ্যু গার জিদকে লিখলেন: 'আপনি কষ্ট পাচ্ছেন, এর কারণ এখন আপনার আর কোনও রাজনীতি নেই।' (আঁদ্রে জিদ-রজে মারত্যাঁ দ্যু গার চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড) বিগ্রহ-ভাণ্ডার পরিবেশে জিদ কি তবে অবক্ষয়ের প্রতীক? মৃত্যুর আগে জিদ নিজে সার্ত্র-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান, স্বয়ং সদা-সন্দিগ্ধ সার্ত্র ও সিমোন দ্য বোভোয়ার যখন জিদের সঙ্গে ডিনার খেতে যান, জিদের বিষণ্ণতার সামনে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সার্ত্রকে মালরোর শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। জিদ সার্ত্র-এর সব মতামতকে পছন্দ না করলেও তাঁদের দেখাসাক্ষাৎগুলি ছিল সহজ ও সৌহার্দ্যময়। ১৯৪৮ সালে সার্ত্র-এর 'রেফ্‌লেক্‌সিয়ঁ স্যুর লে কেসতিয়ঁ জ্যুইভ' (ইহুদিপ্রশ্ন নিয়ে ভাবনাচিন্তা) বইটি জিদ অর্ধেকের বেশি পড়তে পারেননি! তাঁর মতে, ইহুদি বিদ্বেষ শুধু ঘৃণা ও ঘৃণাকে বাঁচিয়ে রাখা দিয়ে তৈরি হয়নি, এর মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, যার কোনও সমাধানই সার্ত্র বাতলাতে পারেননি। সার্ত্র-এর উপন্যাস 'লা মর দঁ লাম' (আত্মার ভেতরে মৃত্যু) পড়ে বান্ধবী তেও-কে লেখেন: 'বইটি খারাপ লেগেছে, কিন্তু ওটি অবশ্যই পড়া উচিত।' তর্কপ্রবণ এক দেশে, যেখানে বিগ্রহ ভাঙতে এক মুহূর্ত দ্বিধা হয় না কারও, সেখানেই সম্ভব যে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ জিদের মৃত্যুর পর 'ল্যুমানিতে' পত্রিকা লেখে: 'এক মৃতদেহের মৃত্যু হল।' প্রত্যুত্তরে স্বয়ং সদা-সন্দিগ্ধ সার্ত্র তাঁর 'লে তাঁ মদেরন্' কাগজে 'জীবন্ত জিদ' নামক শ্রদ্ধার্ঘ্যে জিদের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সাহসকে কুর্নিশ করেন।

ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলন ও মুক্তির সময় সার্ত্র ও কাম্যু হাতে হাত ধরেছিলেন। ১৯৪৩-এর জুন মাসে 'আউটসাইডার' ও 'মিথ অফ সিসিফাস'-এর লেখক তরুণ কাম্যু সার্ত্র-এর সঙ্গে এক থিয়েটারে আলাপ করেন। কাম্যুর মনে হয়েছিল সার্ত্র 'সীমাহীন প্রতিভার অধিকারী', যদিও তাতে ঝাঁঝ বেশি। বয়সে আট বছরের ছোট, এক শ্রমিক ও অশিক্ষিত পরিচারিকার সন্তান কাম্যু সার্ত্রকে বিমোহিত করে দেন (ভিনক 'seduction'

কথাটি ব্যবহার করেছেন)। আলজিরিয়া থেকে ১৯৪০ সালের মার্চে প্যারিসে এসে একটি হোটেলে বসে মে মাসের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত 'আউটসাইডার' (ফরাসিতে 'লেত্রাঁজে') শেষ করে ফেলেছিলেন। আলজিরিয়ার বান্ধবী ইভনকে লিখেছিলেন, 'Pour un homme libre, il n'y a pas d'autre avenir que l'exil ou la révolte stérile.' (একজন স্বাধীন মানুষের পক্ষে নির্বাসন অথবা নিষ্ফল বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোনও ভবিষ্যৎ নেই।) কিন্তু ১৯৫০ নাগাদ সার্ত্র কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করায় কাম্যু, ল্যফর, এতিয়াঁবল্ ও মেরলো-পঁতির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়। কাম্যুর সঙ্গে আগেই সংকট দেখা দিয়েছিল, যদিও কমিউনিজ্‌মের প্রশ্ন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। চারের দশকে তাঁদের বন্ধুত্বের সময়, কাম্যু তাঁর 'কঁবা' কাগজে সার্ত্রকে আমন্ত্রণ করেন। সার্ত্র খুলে দেন তাঁর পত্রিকা 'লে তাঁ মদের্ন্'-এর দরজা। ফরাসি সাহিত্যজগতের এই দুই প্রধান চিন্তক ও যোদ্ধা একদিকে অনূদিত ও প্রশংসিত, অন্যদিকে নিন্দিত হয়েছিলেন অনেক সময় একই লোকেদের কাছে। ভিনক মনে করেন, তাঁদের আলাদা সামাজিক উৎসের কারণে তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রথম থেকেই একটা লুকোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। শ্রমিক শ্রেণী থেকে আসা কাম্যু পার্টিকে কম বয়স থেকে চিনেছিলেন, ফলে কোনও মিথ্যে স্বপ্ন তাঁর ছিল না। সার্ত্রীয় এনগেজমেন্টের তত্ত্বের চেয়ে নৈতিক অনুজ্ঞা তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাম্যু ও সার্ত্র-এর অন্তঃশীল সংঘাত প্রকাশ্যে ফেটে পড়েনি, কারণ তাঁদের অধিকাংশ শত্রু ও মিত্র ছিল এক। ১৯৫১-তে সার্ত্র তাঁর কাগজে কাম্যুর নীৎসে ও নাস্তি-বিষয়ক লেখা প্রকাশ করেন। ১৯৫২-র ২২ ফেব্রুয়ারি কাম্যু ও সার্ত্র একসঙ্গে ফ্রাঙ্কোর হাতে দণ্ডিত স্পেনীয় শ্রমিকনেতাদের জন্য মিটিং সেরে বেরোনোর সময় সার্ত্র জানান তাঁর পত্রিকায় কাম্যুর নতুন বই 'বিদ্রোহী'র সমালোচনাটি অপ্রীতিকর হতে চলেছে। কাম্যু অপেক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত কাম্যু-হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় ফ্রাঁসিস জাসঁ-কে। মে মাসের 'লে তাঁ মদের্ন্'-এ জাঁসঁ কাম্যুর 'চিন্তাবিশৃঙ্খলা'কে তুলোধুনো করে বলেন, তাঁর আধিভৌতিক বিদ্রোহ কোনওদিন ঐতিহাসিক বিদ্রোহ হতে পারবে না। বিস্মিত, আহত, কাম্যু বিস্রস্ত ভাষায় সার্ত্রকে 'সম্পাদক মহাশয়' নামে সম্বোধন করে একটি প্রাণঘাতী চিঠি লেখেন, যেখানে সার্ত্রকে এক 'বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী' বলে ধিক্কার দেওয়া হয়। সার্ত্র আগস্ট মাসে সেই চিঠি ছাপেন, এবং সেইসঙ্গে কাম্যুকে লেখেন: 'আমার প্রিয় কাম্যু,

আমাদের বন্ধুত্ব সহজ ছিল না। কিন্তু তবু তার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।... কাম্যু, বলুন, কোন্ রহস্যময় কারণে আপনার বইয়ের আলোচনা করা যাবে না মানবজাতির বাঁচার যুক্তির কথা না তুলে?' সার্ত্র তাঁদের রাজনৈতিক পার্থক্যের কথা বলেন: তিনি নিজে ইতিহাসের মধ্যে আছেন ('dans l'Histoire'), আর কাম্যু দূর থেকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে আছেন মাত্র, আর মাঝে মাঝে পায়ের আঙুল দিয়ে জল স্পর্শ করছেন। সার্ত্র স্তালিনবাদকে অস্বীকার করলেও কাম্যুর বিরুদ্ধে সমাজবাদ-বিরোধিতার অভিযোগ করেন। আর তাঁদের মিল হয়নি। তবে ১৯৬০ সালে গাড়ি-দুর্ঘটনায় কাম্যুর মৃত্যুর পর ৭ জানুয়ারি সার্ত্র 'ফ্রাঁস-অবসেরভাতর'-এ লেখেন: তিনি ছিলেন 'ইতিহাসের বিরুদ্ধে' বিশ শতকের এক মরালিস্ট, যিনি 'সম্ভবত ফরাসি সাহিত্যে সবচেয়ে স্বতন্ত্র'। কাম্যুর প্রত্যাখ্যানের গোঁয়ার্তুমিকে 'বর্তমান কালের ম্যাকিয়াভেলিদের বিরুদ্ধে, সোনার বাছুরদের বিরুদ্ধে' এক প্রশংসনীয় নৈতিক অবস্থান বলে মনে করলেও সমকালের দৈত্যাকার ও বেঢপ ঘটনাবলির সামনে কাম্যুর 'একগুঁয়ে, সংকীর্ণ ও বিশুদ্ধ' মানবিকতাকে যথেষ্ট মনে করেননি সার্ত্র।

১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত সার্ত্র পার্টিপন্থী ছিলেন, ১৯৫৫ সালে পপুলার ফ্রন্ট গড়ার কথাও বলেন। ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভের স্তালিনীয় অপরাধের ব্যাপারে গোপন সমঝোতা ও হাঙ্গেরিতে সোভিয়েতদের নাক গলানোর পর সার্ত্র আবার সংহার-মূর্তি ধারণ করেন। দুঃখের বিষয়, মিশেল ভিনক সার্ত্র-এর দুটি বামরাজনীতিবিষয়ক নাটক 'নোংরা হাত' ও 'নেক্রাসভ'-এর সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করেননি। করলে একটি পূর্ণতর অন্তর্মানচিত্র দিতে পারতেন। পরের বছর জানুয়ারিতে হাঙ্গেরির বিদ্রোহের ওপর একটি বিশাল সংখ্যা সম্পাদনা করেন সার্ত্র, যাতে তাঁর নিজের নিবন্ধটিই ছিল ১২০ পৃষ্ঠার, নাম 'স্তালিনের ভূত'।

তবে দ্রেফ্যুস-কেলেঙ্কারির মতোই যে-প্রশ্নে ফ্রান্স আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে সেটি আলজিরিয়ার যুদ্ধ। 'ফরাসি জনগণের নামে' অত্যাচারিত আলজিরিয়দের পক্ষে দস্তখস্ত করেন ১২১ জন বুদ্ধিজীবী: সার্ত্র, সিমোন দ্য বোভোয়ার, মার্গরিৎ দ্যুরাস, আদ্রেঁ ব্রোতঁ, নাতালি সারোৎ, ফ্রাঁসোয়াজ সাগাঁ, ভেরকর, আল্যাঁ রব-গ্রীয়ে, ফ্রাঁসোয়া ক্র্যফো, আল্যাঁ রেনে, সিমোন সিনিয়োরে, স্যামুয়েল বেকেটের প্রকাশক জেরোম ল্যাঁদোঁ...। এর প্রতিক্রিয়ায়

সরকার শিক্ষকদের ছুটি দিয়ে দেয়, কয়েকজনকে (যেমন লরা সোয়ারজ ও পিয়ের ভিদাল-নাকে) সাসপেন্ড করা হয়, কারাদণ্ড দেওয়া হয়, থিয়েটার ও ছবি নিষিদ্ধ হয়। ওই ১২১ জনের বিরুদ্ধে দল পাকান দক্ষিণপন্থীরা, যাতে আকাদেমি ফ্রাঁসেজের সাত জন সদস্য ছাড়াও লেখক, বিজ্ঞানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ছিলেন। দস্তখতকারীদের মধ্যে ছিলেন জ্যুল রম্যাঁ ও আঁরি মাসিস। সার্ত্র দিনরাত্রি আলোচনায় বসেন মার্তিনিকের ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী মৃত্যুপথযাত্রী মনস্তাত্ত্বিক ফ্রানৎস ফাঁন-র সঙ্গে। বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক অবস্থানের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়।

ষাটের দশকে ফরাসি 'নুভো রমাঁ' বা নতুন ধারার উপন্যাস সার্ত্র-এর 'সাহিত্য কী?' গ্রন্থের জঙ্গি মোকাবিলার ধারণাকে নস্যাৎ করে দিতে চাইল। ওই ঔপন্যাসিকেরা—মিশেল ব্যুতর, ক্লোদ অলিয়ে, রবের প্যাঁজে, নাতালি সারোৎ, ক্লোদ সিমঁ—১২১ জনের মধ্যে সই করলেও শৈল্পিক দর্শনে সার্ত্রকে অগ্রাহ্য করলেন। সার্ত্রীয় সাহিত্য সেকেলে হতে শুরু করল। ১৯৬৭ সালে সিলভি ল্য বঁ লিখলেন, 'ইতিহাসকে বর্জন করব কীভাবে?' মিশেল ফুকো তাঁর 'শব্দ ও বস্তু' বইতে এর উত্তর দিলেন, 'ইতিহাসের কথা না ভেবে, তাকে বাস্তব ও জ্ঞান থেকে বাদ দিয়ে।'

ফ্রান্সে তাঁর প্রভাব কমে আসার মুহূর্তে সার্ত্র-এর নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান এক মস্ত বিবৃতি। ১৯৬৭-তে ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদের পরই সার্ত্র মরিস ব্লাঁশো, ক্লোসোভস্কি, লাকাঁ, ল্যফেব্‌র্ ও মরিস নাদোর সঙ্গে 'ল্য মঁদ'-এ বিপ্লবী ছাত্রদের পক্ষে সই করেন। সঙ্গে থাকতে হবে। রেডিয়োতে এক সাক্ষাৎকারে সার্ত্র বলেন, 'ছাত্রেরা ওদের বাবার, অর্থাৎ আমাদের তৈরি ভবিষ্যতে বিশ্বাস করে না, যে ভবিষ্যৎ প্রমাণ করে আমরা ছিলাম অবসন্ন, ক্লান্ত, কাপুরুষ; এক বদ্ধ প্রক্রিয়ার কাছে সম্পূর্ণ আনুগত্যের কারণ গাভীতে পরিণত...। যে জমানাই আসুক, শুধু হিংসাই অবশিষ্ট রইল সেই ছাত্রদের জন্য যারা এখনও তাদের পিতৃদেবের দেওয়া সিস্টেমে প্রবেশ করেনি।'

২২ মার্চ ছাত্র আন্দোলনের নেতা দানিয়েল কোন্-বাঁদির সঙ্গে দেখা করেন সার্ত্র ও বোভোয়ার। ১০ ও ১১ মে রাত্রির ব্যারিকেড, ১৩ মে-র হরতালে পুলিশি নির্যাতন, নাঁত-এর কারখানা দখল ফ্রান্সে এক নতুন বাতাস বইয়ে দিল। মরিস ক্লাভেল প্রতিবাদ করলেন 'হাজার বছর পরে সরবোনে খোচর (flic) ঢোকার।' শুরু হল রেমঁ আরঁ আর সার্ত্র-এর বিতর্ক। ২০ মে সরবোনে

নতুন করে খোলা বিশাল অ্যাম্ফিথিয়েটারে উপস্থিত হয়ে প্রশ্নবাণবিদ্ধ সার্ত্র জানালেন, 'পূর্ণ গণতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল এক নতুন সমাজ-ধারণার জন্ম হচ্ছে যা সমাজবাদ ও মুক্তির সঙ্গে সংপৃক্ত।' আরঁ-র সমঝোতামুখিনতার প্রত্যুত্তরে ১৯ জুন সার্ত্র তাঁকে 'অধ্যাপক নামের অযোগ্য' বলে ঘোষণা করেন, পরে একটি পুস্তিকাও লেখেন যার নাম 'কমিউনিস্টরা বিপ্লবকে ভয় পায়।' ক্লাভেল ঘোষণা করলেন, 'এটা ঠিক নয় যে বৌদ্ধিকভাবে মার্ক্সবাদ পিছিয়ে পড়েছে, কিন্তু ইতিহাস মার্ক্সবাদকে অতিক্রম করে গেছে, স্টেশনে দ্রুতগতি ট্রেনের মতো।... তার ঐতিহাসিক সুযোগ শেষ হয়ে গেছে।' তবু ১৯৬৮-র বিস্ফোরণের পর ফ্রান্স এক মুগ্ধ বামপন্থায় বাস করেছিল, সে যেন এক স্বপ্নের উড়াল। প্যারিসের রাস্তায় সার্ত্র-এর মাওপন্থী কাগজ 'লা কোজ দ্যু পপ্‌ল্' ফেরি করা সেই আশ্চর্য উড়ালের অঙ্গ। ভিনক জানাচ্ছেন মাওবাদের সূত্রপাত 'তেল-কেল' প্রকাশিত মারিয়া-আন্তোনিয়েত্তা মাকিওচির 'চিন থেকে' নামক বই। ১৯৭৬ পর্যন্ত মাওবাদী চালে কথা বলার চেষ্টা করে সোলেরস্-এর পত্রিকা। মার্ক্সবাদ ও ফ্রয়েডকে, আলত্যুসার ও লাকাঁকে এক অন্য মার্ক্সবাদে মিলিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছিল। ১৯৭৪-এ সোলেরস্ স্ত্রী জ্যুলিয়া ত্রিস্তেভা, রলাঁ বার্ত ও ফ্রাঁসোয়া ভাল সহযোগে চিন ভ্রমণে যান। ফরাসি ঐতিহ্য অনুযায়ী, বার্ত ও সোলের্‌সের মতৈক্য হয়নি।

সত্তরের দশকে দৃশ্যের সম্মুখভাগে উঠে আসেন ফুকো। তার আগের বছরগুলিতে 'লে তাঁ মদেরন্' তাঁর 'ধারাবাহিকতা-রহিত পজিটিভিজম'-কে বিদ্রূপ করেছিল। ফুকো ভ্যাঁসান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করার পর ও পরে কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ নির্বাচিত হওয়ার পর সব বদলে যায়। তাঁর প্রথম বক্তৃতা ছিল 'লর্দ দ্যু দিসকুর'। সংগ্রাম (lutte) কথাটির তাৎপর্য হয়ে উঠল 'plural', যা জীবনের সর্বক্ষেত্রে—ইস্কুলে, কয়েদখানায়, মানসিক হাসপাতালে, বিচারশালায়—ছড়িয়ে গেল। সার্ত্র-এর সময় ফুরোল। এক কালের সার্ত্র-ভক্ত দেরিদার প্রকাশ্য সার্ত্র-বিরোধিতা ('তিনি বাড়াবাড়ি করেছিলেন') তাই এত তাৎপর্যময়।

তবু মৃত্যুর কয়েক দিন আগে সার্ত্র 'নুভেল অবসেরভাতর' প্রতিক্রিয়ায় এক বিতর্কিত সাক্ষাৎকারে বলেন, এই 'খারাপ, কুৎসিত ও আশাহীন' পৃথিবীতে—যেখানে দক্ষিণপন্থীরা 'হারামজাদা' ও বামপন্থী পার্টিগুলো 'বিপ্লবের সবচেয়ে বড় শত্রু'—তিনি আশায় ভর করে আছেন মানুষের এক

নতুন অভ্যুত্থানের জন্য। ১৯৮০-র এপ্রিলে তাঁর মৃত্যুর পর শবানুগমনে ছুটে এল লক্ষাধিক মানুষ, প্রায় একশো বছর আগে ভিক্তর য়্যুগোর মৃত্যুর পর যা ঘটেছিল। 'লিবারেসিয়ঁ' পত্রিকা লিখেছিল, 'বিরাট (immense) সার্ত্র এই শতাব্দীকে ভরে রেখেছিলেন যেভাবে ভলতের ও য়্যুগো তাঁদের শতাব্দীকে।' লক্ষণীয় যে রলাঁ বার্ত, রেমঁ আরঁ, মিশেল ফুকো ও দেরিদার মৃত্যুর সময় ফ্রান্স প্রায় উদাসীন ছিল।

ওঁরা নিজেদের গলায় কথা বলতে চেয়েছিলেন, অন্যের গলায় নয়। ওঁদের নকল করে বা যত্রতত্র উদ্ধৃতি দিয়ে যখন কেউ আস্ফালন করেছে, অশ্রদ্ধায় বেঁকে গেছে ওঁদের ঠোঁট। ওঁরা ভলতের-কথিত 'লিখিয়ে ইতর' (canaille écrivante) হতে চাননি।

এক উচ্ছন্ন সময়ে আয়না ভাঙতে ভাঙতে ওঁদের যাত্রা।

২০০৩

সার্ত্র: নিখাদ জীবনের খোঁজে

উনিশশো আশি সালে মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে ফ্রান্সের 'ল্য নুভেল অবসেরভাতর' পত্রিকায় এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে চূর্ণ্যমান শতাব্দীর অন্যতম শেষ আলোকস্তম্ভ জাঁ-পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০) বলেছিলেন, 'আমাকে আবার গ্রাস করছে নৈরাশ্য। ভয় হচ্ছে এই দুর্গতির অবসান হবে না, কোনও লক্ষ্য নেই, শুধু রয়েছে ছোট ছোট উদ্দেশ্য... এমন কিছু নেই যা মানুষকে আগ্রহী করতে পারে, শুধু আছে বিশৃঙ্খলা।' সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্ব ইউরোপে মূলগত পরিবর্তনের এক দশক আগে, ইতিহাসের এক বিশেষ স্থানাঙ্কে দাঁড়িয়ে সার্ত্র আরও বলেছিলেন, 'চতুর্দিকে আজ দক্ষিণপন্থার জয়।... এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অসম্ভব নয়, বিশেষত এমন সব কারণের জন্য যা সবই খারাপ, যা সবই কুচিন্তার ফল।' তাঁর মনে হয়েছিল, 'এই বামপন্থা, যা সব কিছুই ছেড়ে দিয়েছে, যা আজ বিধ্বস্ত, এক হতচ্ছাড়া দক্ষিণপন্থাকে জয়ী হতে দিচ্ছে।... এই বাম— হয় সে মরবে আর সেই মুহূর্তে মানুষও মরবে, নয় তার জন্য আবার একটা নীতি খুঁজে বের করতে হবে।' আমাদের চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হয় না যে এই সেই বশ্যতামুক্ত স্বাধীন জঙ্গি দার্শনিক ও লেখক যিনি সমস্ত আত্মপ্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে যুযুধান, উদ্বেগ ও ব্যর্থতা অতিক্রম করে যিনি সত্তার মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ।

এই খোলামেলা ও খরশান কথোপকথনের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা শনাক্ত করতে পারি সার্ত্র-এর সবচেয়ে শক্তিশালী সেই অস্ত্রটিকে, যা দিয়ে তিনি ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছেন তাঁর সমসাময়িক সামাজিক বচনের সবরকম মিথ্যা ও কাপট্য, লোভ ও প্রবঞ্চনার মুখোশ : কথা, বয়ান। বুলি নয়, বয়ান। 'Parler, c'est agir' (কথা বলা মানে 'কাজ' করা), বলেছিলেন তিনি, এবং এই কথা বা বয়ান, speech অর্থে, হয়ে উঠেছে সত্তার উৎকণ্ঠাকে অতিক্রম করে স্বাধীন সিদ্ধান্ত প্রকাশের দীর্ঘ লড়াইয়ে তাঁর হাতিয়ার। যা দিয়ে মুছে দেওয়া যায়, অন্তত সেই রকম বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন তিনি, মিথ্যে আয়নার মধ্যে মিথ্যে প্রতিবিম্বের মিথ্যে প্রতিফলনের সারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বচনের এই বিশেষ ব্যবহার আমাদের ১৯৮৩ সালে, অর্থাৎ সার্ত্র-এর মৃত্যুর তিন বছর পর, মিশেল ফুকো-আলোচিত সেই কথন-ক্রিয়ার ঐতিহ্য মনে করিয়ে দেয় যাকে প্রাচীন গ্রিসের মানুষ নাম দিয়েছিল parrhesia [παρ-ρησια]। ফুকো দেখিয়েছেন, এই গ্রিক শব্দটি সর্বপ্রথম খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এউরিপিদেসের (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪-৪০৭) নাটকে প্রযুক্ত হয়। অতঃপর তা পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর ধরে নানাভাবে ফিরে আসে ও নানা বিতর্কের সূত্রপাত করে। 'পারেজিয়া' শব্দটির ইংরেজি ভাষান্তর 'free speech', ফরাসিতে যা দাঁড়ায় 'franc-parler' ও জার্মানে 'freimüthigkeit'। 'পারেজিয়া' বিশেষ্যটির ক্রিয়াপদ হল parrhesiazomai বা parrhesiazesthai, যার অর্থ 'সব কিছু বলা'— যা এসেছে pan [παν] সবকিছু এবং rhema [ρημα] (যা বলা হয়েছে) থেকে। যিনি 'পারেজিয়া' প্রয়োগ করেন তিনি parrhesiastes, অর্থাৎ যিনি সত্যি কথা বলেন।

ফুকো দেখিয়েছেন, পারেজিয়াস্ত যা সত্যি বলে মনে করেন তা বলতে দ্বিধা করেন না। তিনি কিছু লুকোন না, তাঁর অকপট কথার মধ্যে দিয়ে তিনি অন্যের কাছে তাঁর অন্তরতম ভাবনাচিন্তাকে উন্মুক্ত করে দেন। এটা খুব স্পষ্ট যে তাঁর কথা তাঁর নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে তৈরি এবং অভিমত প্রকাশ করার জন্য তিনি rhetoric বা বাগবৈদগ্ধ্যের সাহায্য নেন না। স্পষ্টবাদিতা ও বাকচাতুরি পরস্পরের বিরোধী। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, পারেজিয়াস্ত নিজেকেও মতামতের বাইরে রাখেন না, এবং গ্রিক বিতর্ক থেকে এটাও খুব পরিষ্কার যে তিনি বিপজ্জনকভাবে বাঁচেন, কারণ নিজের প্রতি অসৎ থেকে বেঁচে থাকতে তিনি অপারগ। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনতাকে বেছে নিয়েছেন, মিথ্যে বা নীরবতার চেয়ে স্পষ্টবাদিতা তার কাছে কাম্য, তোষামোদের চেয়ে সমালোচনা, শান্তির চেয়ে অনিশ্চয়তা ও মৃত্যু-সম্ভাবনা, নিজ স্বার্থের চেয়ে কর্তব্য। হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত গ্রিক শব্দের এই হল সদর্থক মানে, যদিও তার একটি অন্য নঙর্থক মানেও ছিল, যেটি হল 'অজ্ঞ অতিকথন' বা বাচালতা। গ্রিক পণ্ডিতেরা মনে করতেন, 'পারেজিয়া' সমাজের চূড়ান্ত ক্ষতি করতে পারে, যদি তাতে mathesis বা প্রজ্ঞা না থাকে।

ফুকো দেখিয়েছেন 'পারেজিয়া'-র প্রধান ও স্বাভাবিক মাধ্যম হল সংলাপ। নির্ভীক বচনের এই বিশেষ পরম্পরার কথা শুনতে শুনতে ভলতেরের (১৬৯৪-১৭৭৮) কথা মনে আসতে পারে। সর্বত্রই তাঁর বীজমন্ত্র ছিল

'Ecrasons l'infâme' : 'জঘন্যকে নিষ্পেষিত করো'। 'জঘন্য' মানে অবিচার, কুসংস্কার, কাপট্য, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। রাজা চতুর্দশ লুই সম্পর্কে তাঁর নির্মম স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁকে বাস্তিই-র কারাগারে বন্দি থাকতে হয়। সমাজের শেকড় ধরে টান দেওয়া ওই পারেজিয়াস্তের মৃতদেহ প্যারিসে সমাধিস্থ করতে দেওয়া হয়নি, মৃত্যুর পর তাঁর নামোল্লেখও নিষিদ্ধ করেন ষোড়শ লুই। অবশ্য ফরাসি বিপ্লবের পর তাঁর দেহাবশেষকে সসম্মানে প্যারিসের পাঁতেয়ঁতে সমাধিস্থ করা হয়। আধুনিক ফ্রান্সের আর এক স্পষ্টবক্তা নিশ্চয়ই ভিক্তর য়্যুগো (১৮০২-১৮৮৫), যিনি ১৮৪৮ সালের ব্যারিকেডের পর পেয়েছিলেন এক নতুন জীবন। তিনি ওই সময় মারা গেলে এক বড় কবি হিসেবে লোকে তাঁকে মনে রাখত, কিন্তু শুধুই বড় কবি, হয়তো সুবিচার, প্রগতি ও স্বাধীনতার নির্ভীক প্রবক্তা হিসেবে নয়। কে ভুলতে পারবে তাঁর শেষ উক্তি : 'জীবনটা হল দিন আর রাত্রি, আলো আর অন্ধকারের লড়াই।'

অন্য অক্লান্ত মুক্তবক্তা নিশ্চয়ই রম্যাঁ রলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪)। হিংসা ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বই 'ওদ্-স্যু দ্য লা মেলে' (ডামাডোলের ঊর্ধ্বে) ১৯১৫ সালের নোবেল পুরস্কারবিজয়ীর সাহিত্যজীবন প্রায় ধ্বংস করে দেয়, তিনি এক মুহূর্তে স্বদেশের মানুষের কাছে হয়ে যান 'বিক্রি হয়ে যাওয়া' 'ভোলবদলানো' এক 'বিশ্বাসঘাতক' (vendu, traître, renégat)। ১৯৪৪ সালে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ওই অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। এমনকী আজও নয়। ১৯২৮ সালে কালিদাস নাগকে লেখা এক চিঠিতে রলাঁ লেখেন : 'একটু চুপ করে থাকলেই আমি ফ্রান্সে শিল্পীর অহমিকা যা প্রত্যাশা তা হস্তগত করতে পারতাম...। একটু নিচু হলেই হাতে উঠে আসত ঐশ্বর্য। কিন্তু নিজের বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী কথা বলে আমি সব কিছু ধ্বংস করে ফেললাম— আমার গোটা অতীত, আমার ভবিষ্যৎ। আমি জানতাম আমাকে অপমানিত, কর্দমাক্ত হতে হবে, আমাকে অস্বীকার করা হবে, আমাকে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হতে হবে।— আর ঠিক তাই হল। কিন্তু আমি তার জন্য এতটুকু অনুতাপ করি না।' ('দ্য টাওয়ার অ্যান্ড দ্য সী : রম্যাঁ রলাঁ-কালিদাস নাগ করেসপন্ডেন্স', প্যাপিরাস, পৃ. ২৩৮।)

তবু সমকালে কথার বিস্ফোরক ক্ষমতার সেরা উদাহরণ নিশ্চয়ই সার্ত্র যা দিয়ে তিনি যাবতীয় কপটাচার ও 'কু-বিশ্বাসের' (mauvaise foi) বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছেন। আমাদের মনে পড়বে তাঁর দার্শনিক রচনায়,

উপন্যাসে, নাটকে, জীবনীতে, আত্মজীবনীতে, প্রবন্ধে ও সাক্ষাৎকারে স্বাধীনতার তাৎপর্যময় প্রয়োগের দিকে এক অপ্রতিরোধ্য সার্বিক যাত্রা। ফুকো এউরিপিদেসের 'আয়ন' ও 'অরেস্তেস' নাটককে পারেজিয়ার উদাহরণ হিসেবে গণ্য করেছেন, এবং এটি আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যে সার্ত্র তাঁর প্রথম নাটক 'মাছিরা'তে এই অরেস্তেসের মিথকেই প্রয়োগ করেছেন স্বাধীন মানুষের কর্মের ভিত্তিভূমি হিসেবে, যে এক নিখাদ জীবনের সন্ধানে কর্মের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, মনুষ্যত্বের সংজ্ঞার দিকে পৌঁছতে চায়।

দার্শনিক সার্ত্র-এর কাছে 'অস্তিত্ব' 'সারবত্তা'-র চেয়ে আগে। উদ্বেগ ও নিঃসঙ্গতা সত্ত্বেও মানুষ যা অথবা এতদিন যা ছিল তার চেয়ে আলাদা হওয়ার স্বাধীনতা তার আছে, এবং সে তার সেই স্বাধীন সিদ্ধান্তের জন্য সম্পূর্ণত দায়ী। শ্রোতার সঙ্গে সংযোগস্থাপনের জন্য সার্ত্র 'স্বাধীনতার পথগুলি' নামে উপন্যাস লিখেছেন এবং তিনটি খণ্ড লেখার পর উপন্যাস-মাধ্যমকে পথের মাঝখানে প্রত্যাখ্যান করেছেন কারণ ওভাবে সত্যি সত্যিই স্বাধীনতার পথে পৌঁছনো যাচ্ছিল না। অতঃপর তিনি কাহিনিকথকের উপস্থিতিকে মুছে দিয়ে নাটকের প্রত্যক্ষ সংলাপে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেছেন। এখানে আমাদের আবার 'রেটরিক' ও 'পারেজিয়া'র ফুকো-কথিত বিরোধিতার কথা মনে পড়বে। শেষ পর্যন্ত থিয়েটারকেও পরিহার করে সার্ত্র-এর আত্মজীবনী রচনার সিদ্ধান্তের সঙ্গে বস্তুজগতের মধ্যস্থতাকে প্রত্যাখ্যান করার দর্শন একেবারে খাপে খাপে মিলে যায়। কারণ সেই মধ্যস্থতার দাবিগুলি সম্পূর্ণ ক্ষমাহীন এবং সেগুলি স্বাধীনতাকে বারবার 'পথভ্রষ্ট' করে দেয়, নাকচ করে ফেলে। মিথ্যে আত্মক্রীড়া ও আত্মগরিমায়নের দুর্দমনীয় মায়াবী আকর্ষণের বিরুদ্ধে সার্ত্র-এর এ এক বিরাট যুদ্ধ ঘোষণা এবং আধুনিক সময়ে নির্ভীক বচনের এ এক চূড়ান্ত উদাহরণ।

আমার মতে, সার্ত্র-এর নির্মম আত্মসমীক্ষা তাঁকে নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার চার ফরাসি নায়ক ভলতের, ভিক্তর য়্যুগো, এমিল জোলা ও রম্যাঁ রলাঁর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। কারণ তাঁরা কেউই নিজেকে, নিজের অতীতকে সার্ত্র-এর মতো করে সর্বসমক্ষে পা দিয়ে মাড়াতে পারেননি। সম্ভবত সার্ত্রই আধুনিক কালের একমাত্র 'বুদ্ধিজীবী' যাঁর স্পষ্টবাদিতা নিজেকেও রেহাই দেয়নি, যিনি নিজেই হয়ে উঠেছেন পারেজিয়ার লক্ষ্য, অর্থাৎ নিজের

ক্ষমাহীন আক্রমণের শিকার। সার্ত্র-এর সমগ্র জীবন ও কর্মকাণ্ড— সাহিত্য অবশ্যই যার একটি প্রধান উপাদান— যেন এক ধারাবাহিক আত্মসমীক্ষার ইতিহাস। তাঁর ছেলেবেলার আত্মজীবনী 'শব্দেরা' (১৯৬৪)-তে রয়েছে : 'আমি দু'রকম জীবন কাটাচ্ছিলাম। প্রকাশ্যে, আমি একজন প্রতারক, বিখ্যাত শার্ল শোয়াইৎজারের নবাবজাদা নাতি। আর ভেতরে ভেতরে আমি এক কাল্পনিক বিষণ্ণতার মধ্যে সেঁধানো একটি লোক। আমার মিথ্যে গৌরবকে আমি এক ছদ্মবেশ দিয়ে শুধরে নিচ্ছিলাম। এক ভূমিকা থেকে অন্য এক ভূমিকায় হড়কে যেতে আমার কোনও অসুবিধে হত না।'

এই বইয়ের জন্য ১৯৬৪ সালে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান অনিবার্য ছিল। প্রত্যাখ্যানের সময় সার্ত্র বলেন : 'আমার বিদ্রোহকে আমি "প্রাতিষ্ঠানিক" করে তুলতে চাই না ('Je ne veux pas institutionaliser ma révolte')।' অনেকের মনে পড়বে ১৯৩৩ সালে রম্যাঁ রলাঁর হিটলার-প্রদত্ত গ্যোয়েটে স্মারক সম্মান প্রত্যাখ্যানের কথা। পুরস্কার নামক উপঢৌকন প্রত্যাখ্যানের আরও কিছু কাহিনি আমাদের জানা। তবে বিংশ শতাব্দীতে সার্ত্র-এর মতো করে প্রাতিষ্ঠানিকতার গালে থাপ্পড় আর কেউ করেনি।

কাম্যু-সার্ত্র-এর দুঃখজনক বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদের যে ব্যক্তিগত কারণই থাকুক না কেন, কাম্যুকে লেখা বিখ্যাত চিঠিটিতে সার্ত্র-এর বক্তব্য বন্ধুত্বের ধারণা সম্পর্কে তাঁর স্পষ্টবাদিতার একটি অসাধারণ নমুনা হয়ে আছে : 'আমাদের বন্ধুত্ব সহজ ছিল না, কিন্তু আজ আমি তার অভাব বুঝতে পারছি। তুমি যদি আজ তা শেষ করে দিতে চাও, নিশ্চয়ই তার শেষ হওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল।... বন্ধুত্বও স্বৈরাচারী হতে চায়। সে দাবি করে সম্পূর্ণ বশ্যতা, অথবা সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ।... আমি এত দূর গিয়েছি যে চারদিকে শুধু দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতাকে ইতিমধ্যেই দাসত্বে পরিণত করা হয়েছে, স্বাধীনতা সেই অন্তর্গত দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে চায়... তুমি জিগ্যেস করেছ, ইতিহাসের কি কোনও মানে আছে, লক্ষ্য আছে? আমার মতে, এই প্রশ্নগুলিরই কোনও মানে নেই।... সমস্যাটা লক্ষ্য কী সেটা জানা নয়, সমস্যাটা হল লক্ষ্য তৈরি করা।' ('লে তাঁ মর্দের্ন' পত্রিকা, আগস্ট ১৯৫২; কাম্যুর 'সম্পাদককে লেখা চিঠি'-র উত্তরে একই সংখ্যায় প্রকাশিত।)

আলজেরীয় যুদ্ধের সময় সার্ত্র-এর প্রবন্ধ 'আমরা সবাই হত্যাকারী', অথবা ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী মৃত্যুপথযাত্রী মনস্তাত্ত্বিক ফ্রাঁৎস ফানঁ-র সঙ্গে সারা

দিনরাতব্যাপী আলোচনা, ফানঁ-র 'পৃথিবীর অভিশপ্তেরা' বা পল নিজাঁ-র 'আদেন আরাবি' গ্রন্থের ভূমিকা লেখা, নিজের অস্তিত্ববাদী দর্শনের দ্বান্দ্বিক পুনর্লিখন, প্রকাশ্যে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী 'দেশদ্রোহী' ফ্রাঁসিস জাঁসঁ-কে সমর্থন, অথবা রাষ্ট্রপতি দ্য গলের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে 'গত শতাব্দীর কোনও দক্ষিণ আমেরিকান একনায়কতন্ত্রে পরিণত করার' অভিযোগ, বার্ট্রান্ড রাসেলের উদ্যোগে গঠিত আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালে যোগদান ও প্যারিস অধিবেশনে সভাপতিত্ব, আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিয়েতনামে 'জাতিবিনাশের' প্রচেষ্টার অভিযোগ, অথবা পরে মাওপন্থীদের সমর্থন, এগুলি সবই যেন এক নিরবচ্ছিন্ন উন্মোচন-অভিযানের অঙ্গ। ১৯৬০ সালে যেমন তিনি সরকারী নির্দেশ অমান্য করে আলজেরীয়দের পাশে দাঁড়ানোর আবেদনে স্বাক্ষর দেন, অথবা এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে তিনি আলজেরীয়দের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমর্থক ফ্রাঁসিস জাঁস-এর সুটকেস বহন করে দিতে প্রস্তুত, তেমনি ১৯৬৮ সালে ছাত্র-আন্দোলনের সময় সার্ত্র তাঁর অবিস্মরণীয় বেতার-আবেদনে জানান : 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রদের একমাত্র যে সম্পর্ক থাকতে পারে, তা হল এটাকে ভাঙার, এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙার একমাত্র উপায় হল রাস্তায় নেমে পড়া।' ('সার্ত্র ও তাঁর শেষ সংলাপ', পৃ. ৮৪) ১৯৭২ সালে প্যারিসের উপকণ্ঠে বুলন-বিয়াঁকুরে র‍্যানো মোটর কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সার্ত্র বলেন : 'সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবী বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। তাদের মিলিত হওয়ার সময় এসে গেছে। বুদ্ধিজীবীরা মানুষকে উপদেশ দেবে বলে নয়, জনতা এক নতুন রূপ (une forme neuve) পরিগ্রহ করবে বলে।' ওই কারখানার শ্রমিক পিয়ের ওভেরনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলে সার্ত্র তার অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেন, এবং হত্যাকাণ্ডের তদন্তে অংশ গ্রহণ করেন। (পৃ. ৮৫) কে ভুলতে পারবে প্যারিসের রাস্তায় সেই অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্যটি যখন বৃদ্ধ সার্ত্র ও সিমোন দ্য বোভোয়ার তরুণদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নিষিদ্ধ কাগজ 'লা কোজ দ্যু প্যপল' (মানুষের জন্য) ফিরি করছেন? বলেছিলেন, 'আমি বেআইনি কাজে বিশ্বাসী।' যে পিপের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন সেটি হয়ে উঠেছে সাহিত্য ও দর্শনের বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে জীবনের বৃহত্তর পরিসরে পৌঁছনোর প্রতীক।

সমস্ত শিল্পমাধ্যম পরিহার করে শেষ পর্যন্ত জীবনের কাছে পৌঁছনোর জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বিশেষ করে নিজেকে বোঝার জন্য বন্ধু ও সহযোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকে বেছে নিয়েছিলেন সার্ত্র। শুধু তাঁর ক্রমবর্ধমান দৃষ্টিহীনতাই এর জন্য দায়ী ভাবলে ভুল হবে। ফুকো-কথিত সংলাপমুখী পারেজিয়ার এ এক অসাধারণ উদাহরণ। ফুকোর কি 'নির্ভীক বচন'-সংক্রান্ত বক্তৃতামালার (সার্ত্র-এর মৃত্যুর তিন বছর পর, ১৯৮৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলি) সময় আগের যুগের নায়ক সদ্য-প্রয়াত সার্ত্র-এর কথাই মনে হয়েছিল? সিমোন দ্য বোভোয়ার তাঁর 'লা সেরেমোনি দে জাদিও' (বিদায় অনুষ্ঠান) বইতে লিখেছেন (মূল ফরাসি সং, গালিমার, পৃ. ১৫৮) ফুকো গভীর স্নেহে ও শ্রদ্ধায় তাঁর নিজস্ব ফ্ল্যাটে বৃদ্ধ সার্ত্রকে থাকতে দিয়েছিলেন।

সার্ত্র-এর সাক্ষাৎকার যে স্পষ্টবাদিতার কোন স্তরে পৌঁছতে পারে তা মৃত্যুর আগের মাসে প্রকাশিত তাঁর এই শেষ সংলাপে খোদাই হয়ে আছে। এমনকী সারা জীবনের সঙ্গিনী সিমোন দ্য বোভোয়ার পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যান। ধাপে ধাপে সার্ত্র তাঁর সমস্ত পোশাক খুলে ফেলতে চেয়েছেন, যা মনে পড়ায় পঞ্চাশ বছর আগে লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বিবমিষা'র (১৯৩৮) দুটি অবিস্মরণীয় সংলাপ : 'শুধু হারামজাদারা (salauds) ভাবে তারা জিতেছে।' আর 'যদি কোনও কিছু বুঝতে চাও, উলঙ্গ হয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াও।'

তরুণ সহযোগী ও শিষ্য, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পিয়ের ভিকতর ওরফে বেনি লেভিকে এই খোলামেলা সাক্ষাৎকারে আহ্বান করার সময় সার্ত্র বলেন : 'হয় আমি একটা বুড়োহাবড়া গর্দভ যে তোমায় ব্যবহার করতে চায়, নয়তো আমি একটা বিরাট লোক তুমি যার কাছ থেকে চিন্তার খোরাক জোগাড় করতে চাও। কিন্তু একটি তৃতীয় সম্ভাবনাও রয়েছে যেটাই শ্রেষ্ঠ : সেটা হল আমরা সমানে সমানে কথা বলব।' (লিবেরাসিয়ঁ) 'আমার অনুধ্যানের মধ্যে তোমাকে নেওয়া দরকার।... এই পদ্ধতিতে আমরা চিন্তাকে আকার দেব একত্রে।' ('শেষ সংলাপ', পৃ. ১৪) ১৯৮০ সালের ১০, ১৭ ও ২৪ মার্চ 'ল্য নুভেল অবসেরভাতর' (নতুন পর্যবেক্ষক) পত্রিকায় প্রকাশিত বহুল-বিতর্কিত ওই আত্মোন্মোচনের মুহূর্তে সার্ত্র বলেন (৪০ ঘণ্টার টেপে ওইটুকুই দেখে যেতে পেরেছিলেন তিনি; এ তথ্যটুকু অবশ্য এই বাংলা অনুবাদে নেই) প্যারিসের কোনও রেস্তোরাঁর মালিক, একজন নেতা, একজন মাতাল বা একজন মার্কসবাদী বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর মিল হল তাঁদের মতো তিনিও সফল

হতে পারেননি। (পৃ. ১৯) তিনি 'চাঞ্চল্যকর কোনও সৃজনকর্ম করেননি, শেক্সপিয়ার বা হেগেলের মতো,' সুতরাং 'তুলনা করলে এটা একটা ব্যর্থতা।' (পৃ. ২৩) এক অবিশ্বাস্য সাহসী স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেন, উদ্বেগ তাঁর দর্শনের এক প্রধান ভিত্তিভূমি হলেও সেটা একটা 'ধাপ্পা', কারণ তিনি নিজে তা 'কখনও বোধ করেননি'। যে প্রসঙ্গগুলি তুলেছেন সেগুলি হল হিংসা, আশা-নিরাশা ও নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর সংশোধিত ভাবনা, গণতন্ত্র ও নির্বাচনবাদ, র‍্যাডিকালিজম, সামাজিক ও জাতিগত সম্পর্ক, ইহুদি প্রশ্ন, বামপন্থার অবক্ষয়, সাধারণ মানুষের দুর্দশা ও বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা। ক্রমশ 'সোসিয়ালিস্‌ম্‌ লিবেরতের' (মুক্ত সমাজবাদ)-এ বিশ্বাসী সার্ত্র-এর এই বামপন্থা বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক : 'আমার বরাবরই মনে হয়েছে' বাম মনোভাবের এক মূল উপাদান হল র‍্যাডিকালিজ্‌ম্‌। আমরা যদি র‍্যাডিকালিজ্‌ম্‌কে পরিত্যাগ করি, তা হলে বামের মৃত্যু ঘটাতে অনেকখানি সাহায্য করা হয়।' (পৃ ৪৪)

'বামবাদের যে বিদ্রোহের দিকটি ছিল তা অদৃশ্য হয়েছে।... দুর্ভাগা বামকে যদি মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচানোর জন্য কিছু করার ইচ্ছে থাকে তা হলে তার মূল নীতিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করতে হবে, জানতে হবে প্রকৃতিতে তা কী ছিল এবং আজ কীভাবে নতুন করে তা রূপায়িত হবে পারে।' (পৃ. ৪০, ৪১)

সার্ত্র-এর মুদ্রিত শেষ অক্ষরগুলি ছিল (২৪ মার্চ ১৯৮০) এই রকম : 'পৃথিবী আজ মনে হচ্ছে কুশ্রী, খারাপ ও আশাহীন। এ এক মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের শান্ত নৈরাশ্য। কিন্তু আমি প্রতিরোধ করছি ('Je résiste') এবং আমি জানি আমি আশা নিয়েই মরব, কিন্তু এই আশাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

একথা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে হবে কেন এখনকার এই বীভৎস পৃথিবী দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে শুধু একটা মুহূর্তমাত্র; ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে হবে কীভাবে আশা বরাবর বিপ্লব ও বিদ্রোহের এক প্রধান চালিকাশক্তি এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার ধারণাকে আমি কেমনভাবে এখনও অনুভব করি।'

সাক্ষাৎকারের এই শেষ কিস্তি প্রকাশিত হওয়ার সময় সার্ত্র ব্রুসে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সার্ত্র-এর মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট সাপ্তাহিক 'রেভল্যুসিয়ঁ'তে এক তরুণ প্রবন্ধকার লেখেন, 'যুক্তিহীন বিশ্বাস আর স্বীকৃত বিগ্রহের প্রতি সমান বিমুখ এক স্বাধীন, বশ্যতামুক্ত চিন্তার মধ্যে যা-কিছু

সবচেয়ে জঙ্গি, সবচেয়ে স্বচ্ছ, সবচেয়ে সম্মার্জক অর্থাৎ সবচেয়ে নবীন তারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি সারা জীবন। আজ অকুণ্ঠভাবে একথা স্বীকার করতে পারা উচিত : যে-সব দর্শন এবং রচনা মনকে স্বাধীন করতে, সংস্কারমুক্ত করতে, মানুষকে অপরিহার্য সংগ্রামে ও আবশ্যকীয় অস্বীকৃতিতে সমবেত করতে কখনও নিরস্ত হয়নি, তাঁর দর্শন এবং রচনা তাদেরই অন্যতম।'

ফরাসি থেকে কবি অরুণ মিত্রের অসাধারণ বাংলা অনুবাদে সার্ত্র-এর এই শেষ সংলাপ ('সার্ত্র ও তাঁর শেষ সংলাপ', ভাষ্য ভাষান্তর : অরুণ মিত্র) বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর। এটির ভূমিকা ও জীবনপঞ্জি সার্ত্রকে যেভাবে মেলে ধরেছে তা ইংরেজিতেও সহজলভ্য নয়। তা ছাড়া এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল মূল সাক্ষাৎকারটি ইংরেজিতে অনূদিত হওয়ার আগে। ইংরেজি অনুবাদটিও জাতীয় গ্রন্থাগার ছাড়া অন্য কোথাও দেখিনি।

মনুষ্যত্বের ধারণায় অবিশ্বাসী কোনও পিছল উত্তর-আধুনিকের পক্ষে এই স্থির বিশ্বাসের জগৎকে ছোঁয়া সহজ নয়। আগুনে পোড়া এই দীপ্ত ও নিঃশঙ্ক অক্ষরমালার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়।

২০০৬

বরফে ঢাকা আগ্নেয়গিরি

রম্যাঁ রলাঁর (১৮৬৬-১৯৪৪) মৃত্যুর ৬০ বছর পূর্ণ হতে চলল। সদ্য-সমাপ্ত শতাব্দীর এই মহান ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সংগীতবিদ, প্রাবন্ধিক ও অন্যতম শেষ ক্লাসিক বুদ্ধিজীবীর মুখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। যিনি হাজার কাজের মধ্যে ভারতবর্ষকে নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন; হয়তো বুঝেও ছিলেন সবচেয়ে বেশি, তাঁকেই আমরা ছদ্ম-উত্তরঔপনিবেশিকেরা জাহান্নামে পাঠিয়েছি সবার আগে।

অন্যদিকে, ফ্রান্সের অবস্থা একেবারে প্রথম পর্বের কোনওদিনই তেমন অনুকূল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যাঁদের বলেছিলেন 'Rolland and his small band of colleagues', তাঁরা প্রায় চিরকালই ছিলেন পার্শ্বরেখায়। সম্প্রতি বিশ্ব জুড়ে জাতীয়তাবাদ ও মূল্যের সংকট নর্দমার স্তরে নেমে যাওয়ায়, ৫টি উপন্যাস, ১৭টি নাটক, ১০টি জীবনী, ৭টি আত্মকথাধর্মী রচনা, ৫৪ খণ্ড চিঠিপত্র, ১৫টি রাজনীতি সংগীত ও ইতিহাসধর্মী গ্রন্থের রচয়িতা রলাঁকে নিয়ে নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে। এর শ্রেষ্ঠ নমুনা মার্তিন লিয়েজোয়া সম্পাদিত রলাঁ-বিষয়ক পত্রিকা 'কাইয়ে দ্য ব্রেভ' এবং অধ্যাপক বেরনার দ্যুশাৎলে রচিত এই নতুন জীবনীটি, যা পূর্ব-নির্ধারিত অবস্থান-বিন্দু থেকে দেখা কল্পব্যাখ্যার জট ছাড়িয়ে খোলা মনে রক্তমাংসের মানুষটিকে বোঝার চেষ্টা করেছে। তাঁর একটি বড় সহায় ছিল রলাঁর জার্নাল। ফলে পাউল জাইপেল থেকে রিচার্ড ফ্রান্সিস পর্যন্ত জীবনীকারেরা যা পারেননি, বা আংশিকভাবে পেরেছিলেন, দ্যুশাৎলে আমাদের সেই অমোঘ কেন্দ্রে নিয়ে আসেন: যেখানে সমুদ্রঘূর্ণি আর হাঙরের ঢেউ।

রলাঁ যেন এক তীব্র রাসায়নিক উপাদান যা সমস্ত দ্বিচারিতা ও কাপট্যকে উন্মোচিত করে। আপসহীন নির্ভীকতার দিক থেকে সম্ভবত তাঁর একমাত্র উত্তরসূরি সার্ত্র: গত জ্বলন্ত শতাব্দীতে তাঁরা প্রবল দুঃসাহসে ও গভীর এষণায় গুরুত্বপূর্ণ মানবিক অবস্থান নিয়েছিলেন। এটা নিছক সমাপতন নয় যে ১৯৮০ সালে সার্ত্রের মৃত্যুর অব্যবহিত আগে এক সাক্ষাৎকারে সার্ত্রের ছাত্র বেনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেভি তাঁকে রলাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এবং সার্ত্র অনিবার্যভাবে রলাঁকে ছোট করেন।

রলাঁ সম্পর্কে ফরাসিদের প্রবল উদাসীনতার কারণ প্রধানত দুটি; সঙ্গে একটি উপকারণের খঞ্জ অজুহাতও আছে, সেটি রলাঁর 'শৈলীর অভাব'! রলাঁ তাঁর 'জাঁ-ক্রিস্তফ' লিখে যখন সাহিত্যে পাকাপাকি আসন তৈরি করতে বসেছেন, আকাদেমি ফ্রাঁসেজ থেকে আহ্বান আসছে, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফেটে পড়ে। এবং 'নিজের হাতে সাহিত্যিক ভবিষ্যৎকে চুরমার করে' রলাঁ জাতীয়তাবাদ, ঘৃণা ও মারদাঙ্গার ঊর্ধ্বে ওঠার আহ্বান জানিয়ে এক মহা-পুস্তিকা লেখেন: 'ওদ্-স্যু দ্য লা মেলে'। সেটি আপাত-আন্তর্জাতিকতার আড়ালে ফরাসি জাতীয়তাবাদের অন্তর্লীন মনস্তত্ত্বকে ফাঁস করে দেয়। রলাঁ রাতারাতি হয়ে ওঠেন 'বিশ্বাসঘাতক'। জাঁ-ক্রিস্তফের নায়ক কেন জার্মান এমন উদ্ভট প্রশ্নও তোলা হয়। রলাঁর ফরাসিত্ব নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এই হুক্কাহুয়ায় যোগ দেননি এমন ফরাসির সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। অনমনীয় রলাঁ শেষ পর্যন্ত দেড় দশকের জন্য ফ্রান্স পরিত্যাগ করায় ফ্রান্সে তিনি বহুলাংশে ব্রাত্য হয়ে যান।

এই কারণটির কথা অনেকেই জানেন। ফ্রান্সে তাঁর সম্পর্কে অবজ্ঞার দ্বিতীয় কারণটি বৈপরীত্যময়। সেটি তিরিশের দশক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি 'পক্ষপাতিত্ব'। ফলে রলাঁ সাধারণভাবে ফরাসি দেশের পরিসর থেকে মুছে যেতে থাকেন। এক বিবেকী (বিবেকী বলে মানলেন তা হলে) বুদ্ধিজীবীর আত্মবিক্রয়ের উদাহরণ হিসেবে ব্যাপারটিকে উপস্থাপিত করা হয়। যেহেতু ১৯৩৪ সালে মারিয়া কুদাশেভাকে বিয়ে করার পরই তাঁর মতাদর্শগত সহানুভূতি স্পষ্টতর হয়, রলাঁর এই দ্বিতীয় স্ত্রীকে সোভিয়েত গুপ্তচর বলে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চলে।

যাঁরা মনে করেন রলাঁ সম্পর্কে এই ফরাসি পাঠটি ভুল, তিনি কখনওই তাঁর স্বাধীনচেতা মনকে হারাননি, বরঞ্চ তাঁর ক্ষুধার্ত অন্বেষণ শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, অধ্যাপক দ্যুশাৎলে তাঁদের একজন। রলাঁর প্রত্যাবর্তনের যে পরিসর কিছুদিন যাবৎ তৈরি হচ্ছে, তার পিছনে এই নবমূল্যায়ন কাজ করেছে। রলাঁ যে মস্কো বিচার ও সোভিয়েত-জার্মান চুক্তিতে মর্মাহত হন, এবং তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়, এমন তথ্য তাঁর পুনরুত্থানে সাহায্য করেছে।

রলাঁ যে এক রক্তমাংসের মানুষ এই বোধটিকে মূলধন করে এগিয়েছেন

বলে দ্যুশাৎলের বইটি আমাদের দীপিত করে। স্তুতিপত্র বা হ্যাজিওগ্রাফি না লিখে জাঁ-ক্রিস্তফের স্রষ্টাকে জাঁ-ক্রিস্তফের মতো সাংগীতিক আয়তনে ধরার চেষ্টা করেছেন এই নতুন জীবনীকার।

একোল নরমাল স্যুপেরিয়রে তাঁর সম্পর্কে বলা হত: 'এক বরফে ঢাকা আগ্নেয়গিরি', 'এক জ্বলন্ত শীতলতা' (froideur brûlante)। আপাত কোমলতার আড়ালে জ্বলছে এক আত্মা, ভয়ংকর আবেগে যা ফেটে পড়ে, মুক্ত করে সংগীতের দেবতাকে। পিয়ানোতে রলাঁ এক অন্য মানুষ। তাঁর চোয়াল সংকুচিত হয়, সর্বশক্তি দিয়ে তিনি নিঃসরণ করেন এক অদম্য শক্তি যা তাঁকে উত্থিত করে।

দীর্ঘদেহী, রোগা, ভঙ্গুর, ১৯১০ সালের দুর্ঘটনার পর থেকে ঝুঁকে পড়া, গাঢ় রঙের পোশাক-পরিহিত মানুষটিকে কোনও প্রোটেস্ট্যান্ট পাদ্রির মতো দেখতে। নিচু গলায় কথা বলেন, অপরকে বোঝাতে ও বিশ্বাস করাতে পারেন, কণ্ঠস্বর শ্রোতাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। কখনও ঠোঁট চেপে রাখেন, বিরক্তিতে কেঁপে ওঠেন। ১৯১৩-র অক্টোবরে তাঁকে দেখার পর লুইজ ক্রুপ্পির মনে হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে এক উজ্জ্বল, প্রায় অতি-প্রাকৃত প্রশান্তি নির্গত হচ্ছে। অবশ্য বিরোধীদের কারও কারও মতে তাঁকে দেখতে শুধু রুটি আর জল খাওয়া কোনও কয়েদির মতো!

তিনি খুঁজেছিলেন 'অনন্ত অস্থিরতার কেন্দ্রে এক শান্তি' (ল্য ভোয়াইয়াজ অ্যাতেরিয়র)। 'কেউই ছোটবেলা থেকে আমার মতো করে বোঝেনি এই মৃত্যুকে যার ওপর জীবন দাঁড়িয়ে আছে, যার ওপর জীবন করছে তার নির্মাণ।... যদি জীবন সত্যিই এক স্বপ্ন হয়, আমি সেই স্বপ্নের জালের নীচে আবৃত এক মাকড়সা, যে প্রাণপণে ধ্বংসের ওপরে জাল টাঙাতে চায়...।' এক বছরেরও কম বয়সে পরিচারিকা তাঁকে ভুল করে বরফ ও শীতের মধ্যে বারান্দায় ফেলে যায়, সেদিন থেকে ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিসের সূত্রপাত। মৃতা ছোট বোনের জন্য মায়ের কষ্ট, তার মৃত্যুদিনে ক্লামসির সাইপ্রাস-ঘেরা কবরখানায় যাওয়া। আর নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে ভয় আর উৎকণ্ঠা! ঘুম থেকে শিশুটি হঠাৎ জেগে উঠে বলে: 'আমি মরতে চাই না।' রলাঁর মনে হয় তিনি সুতো দিয়ে মৃত্যুর ওপর ঝুলে আছেন। ছোট বাচ্চারা সমুদ্রসৈকতে তাঁকে ধাক্কা দেয়, সহপাঠীরা অত্যাচার করে। তিনি এসব ভুলতে স্বপ্নে ডুবে থাকেন। বাড়ির পিছনে বাগানের শেষে খালের ওপর ধীরগতি নৌকোর দিকে তাকিয়ে

কেটে যায় তাঁর বেলা। 'শেক্সপিয়ারের নারীরা' বলে একটি বই মুগ্ধ করে রাখে তাঁকে। তিনি চলে যান সংগীতের জগতে, পাঁচ বছরেরও আগে থেকে মা'র কাছে পিয়ানো শেখেন। মোৎসার্টের ভক্ত ছেলেটি হঠাৎ একদিন এক দম বন্ধ করা ছোট্ট থিয়েটারে বেটোফেনের হাত ধরে বিশ্বজগতের অন্তরে প্রবেশ করেন! বেটোফেন ও ভাগনার এক দ্বিখণ্ডিত জগৎ। একদিকে বাস্তব জগৎ যা মৃত্যুময়, অন্যদিকে এক জগৎ, যেখানে তিনি পৌঁছোতে চান, যাকে সত্য বলে মনে হয় না। চিন্তায় আচ্ছন্ন রলাঁ ১৮৮৬ সালে একোল নরমাল স্যুপেরিয়রের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। লিসে লুই-ল্য-গ্রাঁতে ফের পড়া তৈরি করতে করতে প্রবেশ করেন শেক্সপিয়ার, শোপেনহাওয়ার, ভিক্তর য়্যুগো আর স্পিনোজার জগতে। য়্যুগোর ৮৩-তম জন্মদিনে ও মৃত্যুর পর শেষকৃত্যে অংশ নেন রলাঁ। ক্লাস পালিয়ে কবির বাড়ি যান, তাঁর বই পড়েন ও নোট লেখেন। ফলে সাড়ে উনিশ বছর বয়সে আবার পরীক্ষায় ফেল। অথচ য়্যুগো নন, তাঁকে উদ্ভাসিত করেন স্পিনোজা। তিনি পৌঁছোলেন অন্তঃসত্তার বিশালতায় ('l'immensité de son être intérieur')। জাঁ-ক্রিস্তফেও আছে: 'আবরণ গেল ঘুচে। ঝলসে উঠল আলো। বিদ্যুৎ-ঝলকে সে দেখতে পেল অন্ধকারের গভীর পর্যন্ত। সে দেখল—সে হয়ে উঠল ঈশ্বর। ঈশ্বর তার মধ্যে বিরাজমান।'

অন্য বড় প্রভাবটি হল 'হ্যামলেট'। বেরনার দ্যুশাৎলে হ্যামলেট ও হোরেসিও সম্পর্কে রলাঁর অনুভূতিগুলিকে জড়ো করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। 'যুদ্ধ ও শান্তি' পড়ে বুঝতে পারেন, ব্যক্তি ও ইতিহাসের পিছনে লুকিয়ে থাকে এক ভবিতব্য। এর্নেস্ত র‍্যনাঁ তাঁকে শেখান মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার এক অমোঘ আইন। স্কুল-কলেজের 'বিস্বাদ' প্রক্রিয়া থেকে তিনি কিছুই শেখেননি, যা শিখেছেন বই পড়ে ও সংগীত শুনে।

মাকে চুরমার করে দিয়ে রলাঁ ১৮৮৯-এর নভেম্বরে প্যারিস ছেড়ে চলে গেলেন ইতালি, যা দ্যুশাৎলেকে মনে করিয়ে দিয়েছে 'জাঁ-ক্রিস্তফ'-এর 'বিদ্রোহ' নামক অধ্যায়কে। মালভিদা ফন মেজেনবুগকে লিখেছিলেন, 'আমার হৃদয় চাইছে অনাচার, এক স্বৈরাচারীকে ডাকছি, এক অনন্য আবেগ যা সব কিছুকে মুছে দেবে।'

এ বইকে তীব্রতা দিয়েছে রলাঁর নারীরা। যাঁরা তাঁর এক ভ্রান্ত ছবি

এঁকেছিলেন তাঁরা এতে দুঃখ পাবেন। তাঁর মা, তাঁর মৃত বোন, মালভিদা ছাড়াও তাঁর প্রথম স্ত্রী ক্লোতিল্‌দ্‌, তাঁর প্রেমিকারা...

ক্লোতিল্‌দ্‌ যেন এক ছায়া, যে থেকেও নেই। জাঁ-ক্রিস্তফের অনেক আগেই সে মুছে গেছে। সেই গভীর গোপন বেদনার কথা রলাঁ কাউকে বলতে চাননি। এবার সব ভুল ধারণার অবসান হল। এই প্রেম, দাম্পত্য, সহযোগিতা ও সংঘাতের কাহিনি রলাঁকে বোঝার পক্ষে অপরিহার্য। কলেজ দ্য ফ্রাঁসের তুলনামূলক ব্যাকরণের অধ্যাপক মিশেল ব্রেয়ালের বাড়ি নৈশভোজ খেতে গিয়ে প্রথম দর্শনেই রলাঁ ও অধ্যাপক-কন্যার প্রেম। যে-বন্ধুটি সঙ্গে গিয়েছিল, সে ছিল ক্লোতিল্‌দের পাণিপ্রার্থী, সে পত্রপাঠ বাতিল হয়ে যায়। এরপর লুকসাঁবুর বাগানে দেখা। ওঁরা ভাগনারের কথা বলেন, ত্রিস্তাঁ ও ইসোল্‌দ্‌কে নিয়ে পাগল হন। বাগদানের দিন দু'জনে একসঙ্গে হান্ডেল বাজান, ক্লোতিল্‌দ্‌ বাজান 'পারসিফাল'। রলাঁর মা ও বান্ধবী মালভিদার আপত্তি ও মিশেল ব্রেয়ালের সঙ্গে মতানৈক্য ও তাঁদের মনের নানা গরমিল সত্ত্বেও, তাঁদের বোঝাপড়া মোটামুটি অব্যাহত ছিল ১৯০১ সালে বিচ্ছেদ পর্যন্ত।

১৯০২ থেকে ১৯০৬ আধা ডাচ ও ক্রেয়োল আগাত ল্যুকারদি ও ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত কোজেৎ পাদুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও পত্রালাপ চলে। অতঃপর জার্মান ঔপন্যাসিকা এলসা ভোল্‌ফের সঙ্গে। দুই সংগীতজ্ঞ এসতের মারশাঁ ও লুইজ ক্রুপ্পির সঙ্গে সংযোগ বেশিদিন বজায় ছিল, ক্রুপ্পির সঙ্গে বন্ধুত্ব তাঁর জীবনের সেরা সম্পর্কগুলির মধ্যে পড়ে। এক দশক পরে জান মরতিয়ে নামে এক তরুণী পাঠিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব। অতঃপর অলগা নামে এক বেলজিয়ান তরুণীর সঙ্গে এক অসম্ভব প্রেমের আগুনে জ্বলেপুড়ে যান রলাঁ। সে এক বিধ্বংসী ভালবাসা। ক্লোতিল্‌দের ক্ষেত্রে যা করেননি এবার তা করেন: অলগার সমস্ত তীব্রতাকে মেনে নেন্‌। রলাঁর ভাষায়, 'অপূর্ব এই আগুন যা জ্বলছে!' এসব রলাঁ সম্পর্কে আমাদের পূর্বনির্ধারিত মিথ্যে ধারণাগুলিকে ভেঙে দেয়।

রলাঁর জীবনে আর এক আকস্মিক অনুপ্রবেশ হেলেনা নামে তেইশ বছর বয়সী এক উচ্ছল, প্রাণবন্ত, শিশুসুলভ আত্মবিশ্বাসী মার্কিন অভিনেত্রীর, যার নাম দিয়েছিলেন 'তালি' (Thalie)। কয়েকটি চিঠিপত্র বিনিময়ের পর ১৯১৪-র জানুয়ারিতে মেয়েটি রলাঁর বাড়ি এসে উপস্থিত। রলাঁ দেখলেন এত বয়সেও তাঁর হৃদয় ফুলে ফুলে ভরে উঠছে, তাঁকে ঢেকে ফেলছে প্রেমের

উত্তপ্ত ঢেউ ('la chaude vague de l'amour')। রলাঁ 'আগুনের মধ্যে নৃত্যরত'; ইতালীয় বান্ধবী সোফিয়াকে লিখছেন 'জীবনের এক নতুন সংকট' পার হচ্ছেন তিনি, 'সুখের সংকট'। 'পরে কোনওদিন যখন একসঙ্গে হব, বলব... চিঠিতে বলা অসম্ভব।' ওঁরা একসঙ্গে হাঁটেন, পরস্পরের কাছে যান, একসঙ্গে রাত কাটান। (পৃ. ১৬৬) তালি চিঠিতে নাম সই করে 'রমিনেৎ' বলে, রলাঁ তাঁর 'রমিনে'। তালি বিয়ে করতে চায়, রলাঁ তাঁর বয়স ও স্বাস্থ্যের কথা বলে নিরস্ত করেন। ১৯১৭ পর্যন্ত টিঁকে থাকে সেই সম্পর্ক।

রলাঁর চেয়ে তিরিশ বছরের ছোট, ভবিষ্যৎ বধূ, অজানা রাশিয়ান পিতা ও ফরাসি মায়ের সন্তান (অবৈধ বলে ঘোষিত) মারিয়া পাভলোভনা তাঁর স্বামী প্রিন্স কুদাশেভার মৃত্যুর পর মস্কোতে আসেন। তাঁর গুণগ্রাহীদের মধ্যে ছিলেন আইভানভ, বরিস পাস্তেরনাক ও ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ। বলশেভিক কর্মী, কমিটার্নের সদস্য, অধ্যাপক কোগানের সেক্রেটারি ও বান্ধবী মারি ১৯২২ সালে রলাঁকে চিঠি লিখে উত্তর পাননি। তিনি কিছুদিন ফরাসি কবি দ্যুয়ামেলের পিছনেও ছোটেন। রলাঁকে তাঁর কবিতা পাঠালে ও নানান প্রেম-কাহিনির কথা লিখলে রলাঁ তাঁকে একটি কড়া চিঠি লিখে শান্ত করতে চান। কিন্তু দ্যুশাৎলের ভাষায়, মারি 'জাল বোনেন', রলাঁ তাতে ধরা পড়েন। অলগা ও তালির মতো ওই তরুণীকেও 'দাদার মতো' বাঁচাতে চান তিনি। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে 'মায়া প্রিয়া'-কে বের করার জন্য রলাঁকে গোর্কির শরণাপন্ন হতে হয়। শেষে এক বিদঘুটে পরিস্থিতি: মারি যখন ভিলন্যভে পৌঁছোলেন, তখন বান্ধবী সোফিয়া ও জান মরতিয়েও সেখানে উপস্থিত! যাই হোক, ১৯২৯ সালে তিন সপ্তাহ কাটে প্রবল আবেগে। রলাঁর বয়স ৬৩, মারির ৩৪। যা ঘটতে থাকে, তা দ্যুয়ামেলের মতে, রলাঁকে মস্কোর জালে বেঁধে ফেলা। শেষ পর্যন্ত, ১৯৩৪ সালের ২৮ এপ্রিল ভিলন্যভে তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়। জার্নালে লিখেছেন তাঁর বোন মাদলেন ও প্রিয় 'মাশা'-র মধ্যে ব্যবধান বাড়ে। মারি রলাঁই ক্রমশ হয়ে ওঠেন রলাঁর বিপুল সৃষ্টির রক্ষক। রলাঁর মৃত্যুর পর প্রধানত তাঁরই জন্য রলাঁ-চর্চা সম্ভব হয়েছে।

দ্রেফ্যুস-সমস্যা যেমন জাতীয়তাদের লুকোনো চেহারাকে উদ্‌ঘাটিত করেছিল, তেমনই রলাঁর 'ওদ্‌-স্যু দ্য লা মেলে,' যা সমস্ত লৌহ-শলাকাকে নির্গত করে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বিতর্কের কেন্দ্রীয় সমস্যাটি হল সোভিয়েত প্রশ্নে তাঁর অবস্থান। মনে রাখতে হবে আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের

সুহৃদ হয়েছিলেন তিনি। তারপর বিশের দশকের গোড়ায় শুরু হয় প্রায় দেড় দশক-ব্যাপী ভারত-পর্ব, যা স্তিমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে (অনেকের মতে, হয়নি) সোভিয়েত-সহমর্মিতার শুরু। 'ক্যাঁজ আঁ দ্য কঁবা' (পনেরো বছরের সংগ্রাম) গ্রন্থে সেই বিখ্যাত উক্তি: 'Si l'URSS est menacée, quels que soient ses ennemis, je me range à ses côtés.' সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত হলে যেই তার শত্রু হোক তিনি তার পাশে থাকবেন। তাঁর ভক্তেরা এর মধ্যে খুঁজে পান আপসহীন মানবতা; সমালোচকেরা পান স্ববিরোধ। যিনি একসময় সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছিলেন, তিনি কী করে অন্য এক 'স্বৈরাচারের' কাছে আত্মসমর্পণ করলেন? মুস্‌সোলিনি ও হিটলারকে প্রত্যাখ্যান করে শেষে স্ট্যালিনকে আলিঙ্গন?

অধ্যাপক দ্যুশাৎলে এই তির-তীক্ষ্ণ বিতর্কের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে কোনও একমাত্রিক উপসংহারের সন্ধান না করে রলাঁকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। ফলে 'কালান্তরের পথিক'-এর ছকে আমরা যে খণ্ডিত রলাঁকে দেখতে অভ্যস্ত, ইচ্ছাপূরণের সেই ছক ভেঙে যায়। স্টেফান ৎসোয়াইগ ও রজে ভিলদ্রাকের কাছে সোভিয়েতদের সাফল্য ও সমস্যার নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা শুনেছিলেন রলাঁ। তাঁর মনে হয়েছিল পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া সমাজের পতন অনিবার্য, তার বদলে এক নতুন পৃথিবীর প্রয়োজন সোভিয়েত দেশের নির্মাণ যার 'খসড়া'। 'আমাদের ভূমিকা ও কর্তব্য হল ওই খসড়াটিকে বাঁচানো, যাতে তা এক ধ্বংসায়মান পৃথিবীর নীচে সমাহিত না হয়।' ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ওই খসড়াটিকে বাঁচাতে তিনি জিদ ও মালরোর মতো তার পাশে দাঁড়ান। ফলে ১৯৩৪-এর মধ্যেই দুটি বই: 'পনেরো বছরের সংগ্রাম' ও 'বিপ্লবের পথে শান্তি'। বন্ধু মার্সেল মার্তিনে-র মতে 'পথদ্রষ্টার ভ্রান্তি', আঁদ্রে স্যুয়ারেসের মতে 'মারাত্মক ভুল'। ১৯৩৪-এর নভেম্বরে রলাঁ স্ট্যালিনকে দেখতে চেয়ে গোর্কিকে লেখেন। ১৯৩৫ সালে সে দেশে পৌঁছে তাঁর জন্য প্রচুর সুব্যবস্থা। কিন্তু সর্বদা তাঁকে আগলে রাখা হচ্ছে, বন্ধু গোর্কিকে একা পাচ্ছেন না। স্ট্যালিনের সঙ্গে দু' ঘণ্টা কথাবার্তা ও সরকারি সত্য যে শেষ কথা নয়, রলাঁ তা জানতেন। অন্য ছবিগুলি, যেমন কিরভ-হত্যার পর লেনিনগ্রাদের সন্ত্রাস, মেলে ধরেন এলসি হারটখ, স্ত্রীর শাশুড়ি ও পুত্র এবং গোর্কির প্রথম স্ত্রী। তবু প্রকাশ্যে কথা না বলার জন্য কি দায়ী 'ল্যুমানিতে' পত্রিকার ভাষায় 'discipline révolutionnaire'? (পৃ.

৩২৯) আঁদ্রে জিদ যখন 'সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে' (১৯৩৬) বইতে প্রকাশ্য প্রতি-আক্রমণ করলেন, 'ক্লার্তে' পত্রিকা রলাঁকে বিতর্কে অংশ নিতে আহ্বান জানায়। রলাঁ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু অনবধানতাবশত একটি চিঠিতে লিখে ফেলেন (যা সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়) যে বইটি খারাপ, অগভীর ও স্ববিরোধিতাপূর্ণ। (পৃ. ৩৩০) প্রতিক্রিয়ায় জিদ লিখলেন তাঁর 'কষ্টের' কথা: 'আমার বিশ্বাস 'হট্টগোলের ঊর্ধ্বে'র লেখক বৃদ্ধ রলাঁকে নির্মমভাবে বিচার করবেন। ঈগলটি এখন নীড় খুঁজে পেয়েছে: সে বিশ্রাম নিচ্ছে।' (পৃ. ৩৩১)

ঈগল অবশ্য নীড় খুঁজে পায়নি। স্পেনে ফরাসি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে যেমন লেয়ঁ ব্লুমকে চিঠি লিখতে কুণ্ঠিত হননি, তেমনই মস্কো বিচারের সময় স্ট্যালিনকে। স্ট্যালিন উত্তর দেননি। গোর্কির পরিণতি দেখে ছবিটা স্পষ্ট হচ্ছিল। আঁরি গিলবো যখন 'লা ফ্যাঁ দে সোভিয়েত' গ্রন্থের একটি গোটা অধ্যায়ে রলাঁকে 'ক্রেমলিনের বন্দি' বলে অভিযুক্ত করলেন, এবং স্ত্রী মারিকে গুপ্তচর, 'কাপুরুষতায় স্তম্ভিত' রলাঁ সেটিকে 'স্থূল ভুলে ভরা, উন্মাদ আবিষ্কার আর সচেতন অনৃতভাষণে ঠাসা এক নিম্নমানের গোয়েন্দা-কাহিনি' বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু বিশ্ব ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধবিরোধী সমিতির সভাপতি হিসেবে রস্‌সেলি ভ্রাতৃদ্বয়ের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানালেও মস্কো বিচার চলাকালীন মার্শাল তুকাচেভস্কি ও ষোলোজন জেনারালের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে যে তিনি ক্রোধে ফেটে পড়েছেন তাঁর জার্নালে। (পৃ. ৩৩২) তিনি কি তবে মারির ছেলের প্রাণরক্ষার কথা ভাবছিলেন? এই প্রশ্নার্ত সময়ে তিনি হাত দিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'রবেসপিয়ের'-এ।

কী প্রশ্ন তুললেন সেই নাটকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তক? মানুষকে 'ভুলে গিয়ে' রুশ বিপ্লব যেদিকে মোড় নিল, ফরাসি বিপ্লবের সূত্র ধরে কি তারই বিচার করলেন না রলাঁ? রবেসপিয়ের সেই অবস্থাটা মানতে প্রস্তুত নন যেখানে ষড়যন্ত্র সত্যের ওপরে জয় ঘোষণা করে, যেখানে বিচার একটি মিথ্যে, যেখানে মানবজাতির স্বার্থের পরিবর্তে রয়েছে কতগুলি নগ্ন আবেগ। স্ট্যালিনের ৬০ বছরের জন্মদিনের উৎসবে রলাঁর শুভেচ্ছাবাণী চাওয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ততদিনে স্ট্যালিন, হিটলার ও মুস্‌সোলিনি এক হয়ে গেছে। (পৃ. ৩৩৯) পোল্যান্ড অধিকারের পর জার্নালে

লেখেন: 'আমরা লেনিনের কাজকে বিশ্বাস করেছিলাম। তাঁর উত্তরসূরিরা তাঁকে পা দিয়ে দলেছে।' (পৃ. ৩৫০)

দ্যুশাৎলে জানাচ্ছেন (পৃ. ৩৫১) জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি লিখতে চাইছিলেন আর একটি 'ওদ্-স্যু দ্য লা মেলে', আরও শক্তিশালী ও তীব্র, যা প্রকাশ করবে এক ঘৃণার ঝড়কে। যেখানে তিনি সব কিছু বলবেন, সমস্ত কিছুকে প্রত্যাখ্যান করবেন, যার মধ্যে প্রধান সেভিয়েত সরকারের 'ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা এবং অবমাননাকর ও অমানবিক সিনিসিজ্‌ম্'। (পৃ. ৩৫১) 'ওখানে আন্দোলনের মতো চিন্তাও থেমে গেছে।' (ওই) কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্ত্রী ও তার পুত্র সের্গেইয়ের জন্য তা লেখা হয়নি।

জীবনের শেষ দিনগুলিতে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নিজস্ব স্বার্থে তাঁর তোষামোদ শুরু করেন। আবার তিনি পার্টির সদস্য হওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন: 'আমাকে ঘিরে দুটি চক্র—ক্যাথলিকেরা ও কমিউনিস্টেরা, যারা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে।' কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ন্যস্ত ছিল পাথরে, এক অনমনীয় পাথরে। তিনি মানুষের আত্মায় খুঁজেছিলেন সেই ধাতু যা বিরাট আগুনকে প্রতিহত করে শূন্যতাকে অতিক্রম করার শক্তি জোগায়।

২০০৪

রম্যাঁ রলাঁ ও ভারতবর্ষ: বিস্মৃত এক সংলাপ

নতুন শতাব্দীতে যখন খসে পড়ছে সরল বিশ্বাসের পলেস্তরা, ভেঙে চুরমার হতে বসেছে মানব-ভাবনার ভিত, তখন মুক্ত-মনের অতন্দ্র প্রহরী রম্যাঁ রলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪)-র সঙ্গে ভারতীয় নবজন্মের কয়েক জন সন্তানের এক হারিয়ে-যাওয়া সংলাপের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমাদের। এঁরা গভীর আবেগে বানিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন দুই মহাদেশের মধ্যে এক রূপকথার সেতু, যা আমাদের মতো স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্মের মানুষদের অবাক করে দেয়। কারণ আমরা তো সেতু বানাতে উৎসাহী নই, আমরা শুধু দ্বীপ বানাতেই অভ্যস্ত।

এ এক অপূর্ব সৃজনশীল কথোপকথন, আগুন পোহানো সংলাপ, দুটি চিন্তাধারার, দুটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বচনের এক অন্তর্বয়ন। এ এক যৌথ ভাবনার মঞ্চ, যা নতুন শতাব্দীতে আমাদের আয়ত্তের বাইরে। ভারতের নতুন প্রজন্মের প্রগতিশীলরা পাশ্চাত্যের সাম্প্রতিক তত্ত্বাদির কূটকচাল নিয়ে ব্যস্ত, রম্যাঁ রলাঁর মতো ভাবুক মানবতাবাদীকে নিয়ে ভাবার সময় কোথায় তাঁদের? আর ফ্রান্সের অতীতহীন তরুণেরা প্রায়ই এই মূর্খ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন: 'কে এই রম্যাঁ রলাঁ?'

ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ, জীবনীকার, সাংস্কৃতিক কর্মী রম্যাঁ রলাঁর জন্ম মধ্য-ফ্রান্সের বুরগ্যনের নিয়েভ্র্-এর ক্লামসি শহরে— ১৮৬৬ সালের ২৯ জানুয়ারি, রবীন্দ্রনাথের জন্মের পাঁচ বছর পরে, গাঁধীর জন্মের ও সুয়েজ খালের উদ্‌বোধনের তিন বছর আগে, ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের চার বছর ও ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর আগে। ১৯১৫ সালের নোবেল-বিজয়ী (যিনি পুরস্কারের টাকা রেড-ক্রস ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে গোপনে দান করে দেন), আকাদেমি ফ্রাঁসেজের সর্বোচ্চ সাহিত্য-পুরস্কার বিজেতা, আধুনিক লিরিক নাটকের উৎপত্তি ও অপেরার ইতিহাস বিষয়ে দুটি ডক্টরাল থিসিসের রচয়িতা, একোল ফ্রাঁসেজ দ্য রোমের সদস্য, একোল নরমাল স্যুপেরিয়্যরের শিল্প-ইতিহাসের অধ্যাপক, একোল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রাঁসেজ দ্য রোমের সদস্য, একোল দে ওত্ জেত্যুদে সংগীতের অধ্যাপক, আকাদেমি ফ্রাঁসেজের সম্ভাব্য সদস্য, গত শতাব্দীর অন্যতম বহুল-পঠিত ফরাসি উপন্যাস 'জাঁ-ক্রিস্তফ'-এর লেখক... হঠাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি বই 'ডামাডোলের উর্ধ্বে' লিখে তিনি অধিকাংশ ফরাসি বুদ্ধিজীবীর আক্রোশের শিকার হয়ে পড়লেন। সেখানে তিনি স্বদেশবাসীকে সংকীর্ণ জাতীয়তার উর্ধ্বে উঠে যুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানালেন, এবং মুহূর্তের মধ্যে চিহ্নিত হয়ে গেলেন 'বিক্রি হয়ে যাওয়া, ভোলবদলানো বিশ্বাসঘাতক' বলে। রলাঁ লিখেছেন, 'একটু চুপ করে থাকলেই লেখকের অহমিকা যা প্রত্যাশা করে, ফ্রান্সে তার সবই আমি হাতে পেয়ে যেতুম। শুধু একটু নিচু হলেই সমস্ত ফসল আমার হাতে চলে আসত।— কিন্তু আমি শুনলাম আমার বিবেকের বাণী, আর এক লহমায় সবকিছু ধ্বংস করে ফেললাম আমার গোটা অতীত, আমার গোটা ভবিষ্যৎ। আমি জানতাম আমার গায়ে কালি লেপন করা হবে, আমায় ছোট করা হবে, অস্বীকার করা হবে, প্রত্যাখ্যান করা হবে।— আর ঠিক তাই হল। কিন্তু আমি আফসোস করি না।' ফরাসিরা তাঁকে দেশদ্রোহী বানালেও সারা পৃথিবী রলাঁকে কুর্নিশ করল এক মহান মুক্তমনা মানবতাবাদী বলে। সুহৃদ হিসেবে পেলেন রবীন্দ্রনাথ, গাঁধী, গোর্কি, হেরমান হেসসে, স্টেফান ৎসোয়াইগ, আইনস্টাইন, বার্নার্ড শ, ফ্রয়েড এবং ক্রমশ ফ্রান্সে পিয়ের জাঁ-জুভ, জর্জ দ্যুয়ামেল, রজে মারত্যাঁ দ্যু গার, লুই আরাগঁ ও আঁদ্রে মালরোকে। কিছুদিনের মধ্যেই রলাঁ তীব্র বিতৃষ্ণায় প্যারিস ছেড়ে সুইজারল্যান্ডের ভিলন্যভে চলে যাবেন, 'লোকজনের ভিড় থেকে মানুষের হৃদয়ের মাঝখানে' (রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি)।

কেমন ছিলেন রলাঁ? ফরাসি কবি পিয়ের জাঁ-জুভ তাঁর ১৯১৯ সালে রচিত জীবনীতে এইরকম বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর: 'রম্যাঁ রলাঁ দীর্ঘকায়, কৃশ, ১৯১০ সালের দুর্ঘটনার পর থেকে কিছুটা ঝুঁকে পড়েছেন। পরনে কালো, সুরুচিপূর্ণ, অনাড়ম্বর পোশাক, তিনি বসে আছেন বই-বোঝাই এক ছোট্ট ঘরের ছোট টেবিলে, আর লিখছেন সেইসব শব্দ যা ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়। কখনও তিনি আরামকেদারায় বসে, পা-দুটি ভাঁজ করা, একটি অস্থিসারপূর্ণ হাত চিবুকের নীচে রাখা। কথা বলেন নরম, অনুরণনময়, যুক্তিপূর্ণ স্বরে।' জুভের ভাষায়, 'কথা বলে কম, কারণ তিনি দেখতে জানেন।' তাঁর মুখটি চিত্তাকর্ষক ও কমনীয়, 'আমাদের ফরাসি আকাশের'র মতো, যা

জুভকে ১৬২৩ সালে লন্ডনের হ্যাগার্ড ও ব্লাউন্ট প্রকাশিত শেকসপিয়রীয় সংস্করণের পোর্ট্রেটটির কথা মনে করিয়ে দেয়। অথবা র‍্যাফায়েলের আঁকা এক রোমান কার্ডিন্যালের ছবির কথা, যার ঈগল-পাখির মতো তীক্ষ্ণ, গম্ভীর ও বিশুদ্ধ সমুদ্র-নীল চোখ। স্টেফান ৎসোয়াইগ তাঁর ১৯২১ সালে রচিত জীবনীতে 'শীর্ণ, দীর্ঘকায় মানুষটির ফ্যাকাসে, হলদে মুখের ইস্পাতের ঝলকানির মতো দৃষ্টি'র কথা বলেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কা তাঁকে শক্তি ও আলোর সন্ধানে টেনে আনল ভারতীয় আকাশে। তাঁর দুই আদর্শ বেঠোফেন ও গ্যোয়েটের মতো, তিনিও ভারতের বিষয়ে কৌতূহলী, 'তার প্রাচীন মনের মৌচাকে, তার স্বর্গীয় বহুধ্বনিময়তায়'। একোল নর্মাল সুপেরিয়্যরের দিনগুলি'তে তিনি পড়েছিলেন 'গীতা— এক আগ্নেয়গিরি', ভগবৎ পুরাণ-এর কয়েকটি পংক্তি তিনি তাঁর 'দাঁতঁ' নাটকের পাণ্ডুলিপিতে টুকে রেখেছিলেন। আর স্পিনোজাকে তাঁর মনে হয়েছিল 'আমাদের ইওরোপীয় কৃষ্ণ'।

'বুদ্ধ সিদ্ধার্থ' সম্পর্কে তাঁর পঠনপাঠন তিনি একটি নোটবইতে লিখে রাখতেন। ভিদাল দ্য লা ব্লাঁশ-এর ক্লাসঘরে বন্ধুদের সঙ্গে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ভারতবর্ষের মানচিত্র। মারি লোর-প্রেভো লিখেছেন রলাঁ স্বয়ং শিল্পসংগ্রাহক গিমের সঙ্গে এশীয় শিল্পের বিখ্যাত সংগ্রহটি দেখতে গিয়েছিলেন, এবং 'মানবমনের ঐক্য' তাঁকে বিস্মিত করেছিল। ১৮৯৫ সালে লিসে লুই ল্য গ্রাঁ-তে প্রাচ্যশিল্প বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন রলাঁ। ১৮৯৬ সালে 'আয়ের' নামে একটি নাট্যপ্রকল্পে ভারতভাবনার কথা ছিল। ১৮৯৭ সালে 'শকুন্তলা'-র অনুপ্রেরণায় একটি কাব্যনাট্য লেখার কথাও ভাবেন।

১৯০৮ সালে তিনি বান্ধবী কোজেৎ পাদু-কে লিখেছিলেন, 'ভারতের মাটি, জল, আকাশকে বোলো: রম্যাঁ রলাঁ তাদের অভিবাদন জানাচ্ছে। হয়তো আমি সেখানে যাব, এ-জীবনে অথবা অন্য এক জীবনে।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়ই তাঁকে স্পষ্টত নিয়ে এল 'ভারতবর্ষ— আমার মা'-র দিকে (কালিদাস নাগকে লেখা চিঠি, ১২ নভেম্বর ১৯২২)। রলাঁর ডায়েরিতে ভারতের প্রথম উল্লেখ পাই ১৯১৫ সালে, যেখানে তিনি ২৪ ডিসেম্বর ১৯১৪-তে প্রকাশিত *The New Age*-এ রলাঁকে উৎসর্গীকৃত আনন্দ কুমারস্বামীর নিবন্ধ 'ভারতের বিশ্বরাজনীতি'র থেকে উদ্ধৃতি লিখে রেখেছেন। তাঁরা কয়েকবার পত্রবিনিময় করেন, এবং ১২ ফেব্রুয়ারি কুমারস্বামী তাঁকে

'ভগবদ্‌গীতা'-র একটি কপি পাঠান। সঙ্গে আর একটি বই, 'ভারত ও সিংহলে শিল্প ও হস্তশিল্প'। রলাঁ উত্তরে লেখেন, 'কী ঐশ্বর্যময় ওই জগৎ, কী পরিপূর্ণ! মনে হচ্ছে আমার বুক ফেটে যাবে, এত কিছু ধরার পক্ষে তা যে কত ছোট!' ওই 'সুউচ্চ দিগন্ত'কে আবিষ্কার করার আগে তিনি মরে যেতে রাজি নন। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতের বাগানের চাবিটি তাঁর হাতে এসে গেছে।

রলাঁ আগেই রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পড়েছিলেন, আঁদ্রে জিদের ফরাসি তর্জমা তাঁর ভাল লাগেনি। অন্যদিকে, আরও অনেক ভারতীয়ের মতো, রবীন্দ্রনাথও 'জাঁ-ক্রিস্তফ' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু রলাঁ ও ভারতবর্ষের মূল সংলাপের সূচনা হল অক্টোবর ১৯১৬-তে, যখন রবীন্দ্রনাথ টোকিয়ো-র ইমপেরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে তাঁর সেই বিখ্যাত জাতীয়তা-বিরোধী বক্তৃতা দেন। রলাঁর মতে সেটি ছিল 'un tournant dans l'histoire du monde' ('পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বাঁক')। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন, 'এশীয়রা আজ ইউরোপের অধঃপতনের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে'। খুব শিগগিরই তিনি *Christian Science Monitor*-এ 'Race Unity'-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের অংশ টুকে রাখেন তাঁর ডায়েরিতে। আধুনিক সভ্যতা যেভাবে ধীশক্তি ও আবেগকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে তার নিন্দে করে রবীন্দ্রনাথ এটিকে এক বিরাট যুগপরিবর্তনকাল বলে অভিহিত করেন। যুদ্ধ সত্ত্বেও তিনি নিরাশ হননি। এ যেন এক অস্পষ্ট ঊষা, যেখান থেকে উঠে আসবে একতা, শান্তি ও আলো। ১৯১৭-র মার্চে অমিয় চক্রবর্তী রলাঁকে লিখলেন জাঁ-ক্রিস্তফ কীভাবে তাঁর অন্তরকে দীপিত করেছে।

কিছুদিনের মধ্যেই বার্ট্রান্ড রাসেল, বেনেদিত্তো ক্রোচে, আঁরি বারব্যুস, স্টেফান ৎসোয়াইগ ও অন্যান্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁ 'স্বাধীন মনের ঘোষণাপত্র'-এ সই করলেন। কিছু আগেই রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর নাইটহুড প্রত্যর্পণ করে সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি সেই বিরল শিল্পী যাঁর একটি মেরুদণ্ড আছে। অবশেষে রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের দেখা হল ১৯২১ সালের ১৯ ও ২১ এপ্রিল, প্রথমে প্যারিসে রলাঁর মোপারনাঁসের ছোট্ট ফ্ল্যাটে, পরে বুল্যন-স্যুর-সেনে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন, যেখানে তিনি এশিয়ার সংস্কৃতিগুলির মেলবন্ধনের স্বপ্ন দেখছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের সময়, গাঁধী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টলস্টয়-প্রসঙ্গ ছাড়াও, তাঁরা পরস্পরের গভীর সংগীত-প্রীতির কথা বললেন, রবীন্দ্রনাথ গাইলেন তাঁর গান। এক বছরের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ তরুণ ঐতিহাসিক কালিদাস নাগকে লিখলেন:

> আমি জেনে খুব খুশি হয়েছি যে রম্যাঁ রলাঁর অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সংস্পর্শে তোমার আসার সৌভাগ্য হয়েছে। পশ্চিমে যাঁদের সঙ্গে আমি মুখোমুখি হয়েছি, তাঁদের সকলের চেয়ে রলাঁকেই আমার হৃদয়ের নিকটতম এবং আমার ভাবনার সবচেয়ে সগোত্র মনে হয়েছে।... রলাঁর মতো মানুষেরা সামগ্রিকভাবে মানবতার কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় তপস্যার জীবনকে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কাছে দেশ এবং জগতের মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। আর এইজন্যেই দেশপ্রেম ও জাতীয়বাদের ধ্বজাধারীরা তাঁদের তাড়া করে ফিরেছে। কিন্তু আমার পূর্ণ সহানুভূতি রলাঁ এবং তাঁর সহকর্মীদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রতি। চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই, কারণ আমরা সত্যের পক্ষে, যার মধ্যে সত্যকার স্বাধীনতা এবং সত্যকার মুক্তি।

আর রলাঁ লিখলেন তাঁর নতুন বন্ধু কালিদাসকে:

> আমি ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে গ্রিস বা আবহমান ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনের মিল দেখে অবাক ও মুগ্ধ হয়েছি। পার্থক্যটা শুধু এই যে ভারতীয় দর্শন আরও সারবান। তাঁরাও একই কথা ভেবেছেন, কিন্তু ভারতীয়দের ছিল আরও বেশি গভীরতা ও পরিপূর্ণতা, তা ছাড়া তাঁদের আঙ্গিকও অপরূপ। গভীরতা ও ব্যাপ্তি ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমরাও যে একই কথা ভেবেছিলাম। এটা তো *আমাদের* ভাবনা।

১৯২৪ সালের ভিতরই কালিদাস নাগের সাহায্যে তিনি লিখে ফেললেন গাঁধীর প্রতি তাঁর অর্ঘ্য, যা তাঁর নতুন ঈশ্বর ও নতুন মানবতার আবিষ্কার-অভিযানের অঙ্গ। 'সময়টা হিংস্র ও নিষ্ঠুর, বিপর্যস্ত কিন্তু শক্তিশালী। যা ধ্বংস করে, আবার নতুন করে গড়ে তোলে। প্রাচীন আদর্শের বিরুদ্ধে, মৃত দেবতাদের বিরুদ্ধে, লক্ষ লক্ষ অন্ধ মনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। আমাদের নতুন দেবতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, নতুন মানবতা

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এমন মনে করার কোনও কারণই নেই যে নতুন মানুষকে ইউরোপীয়ই হতে হবে। আমি ভারত ও চিনে ঢের বেশি উঁচুদরের নতুন মানুষ দেখেছি।' রবীন্দ্রনাথ, গাঁধী এবং বিশের দশকের শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো ভারতীয়ের প্রতি রম্যাঁ রলাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্যকে, ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে, মৃত দেবতা ও খুনেদের প্রতি বিতৃষ্ণার থেকে আলাদা করা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধী সম্পর্কে ১৯২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে রলাঁ লেখেন:

> আমি ওই সন্ত ও ওই ঋষিকে দেখে আরও বেশি মুগ্ধ না হয়ে পারি না। ভারতের কী সৌভাগ্য যে সেখানে এমন দুজন মহামানবের সহাবস্থান, যাঁরা উচ্চতম সত্যের এক-একটি দিককে তুলে ধরেন। নায়কদের গ্যালারিতে গাঁধীর কাছাকাছি আসার মতো কেউ নেই। ইউরোপে তো একজনও নেই। গাঁধীর কোনো কোনো মতামত সম্পর্কে আপত্তি ও শিষ্যদের হাতে বিপজ্জনক বিকৃতি সত্ত্বেও আমি তাঁর গুণমুগ্ধ, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।

১৯২৪-এর ফেব্রুয়ারিতে কারামুক্তির পর আনন্দোচ্ছল রলাঁ ও বোন মাদলেন সবরমতীতে গাঁধীকে লিখলেন: 'আমরা দুজনে আপনাকে আমাদের ভালবাসা ও মুগ্ধতার বাণী পাঠাচ্ছি। কারাগারের মহান ছায়ার পর যুদ্ধক্ষেত্রের সূর্যরশ্মির সামনে আপনি আবার মুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। ভারত যেন এবার আপনার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে। ইউরোপ যেন এবার তার অরণ্যের ভিতর আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়'। এই আবিষ্কার ও বিস্ময় ভারতীয় মাটিতে রম্যাঁ রলাঁর মননগত-ভাবগত অনুসন্ধানের অঙ্গ। অথচ কখনও তিনি যৌক্তিকতা ও কাণ্ডজ্ঞান হারাননি। মাদ্‌লেন স্লাদ্‌কে (মীরা) লিখেছেন, 'আমি খ্রিস্টান নই, আমি গান্ধিবাদী নই, আমি কোনো প্রতীত ধর্মে বিশ্বাস করি না। আমি পশ্চিমের মানুষ, ভালোবাসায় আন্তরিকতায় আমি সত্যের অনুগামী'।

ধীরে ধীরে অনিবার্যভাবে, সুইজারল্যান্ডের ভিলন্যভে রলাঁর বাড়ি 'ভিলা অলগা' হয়ে উঠল ভারতীয়দের কাছে এক তীর্থস্থান: লালা লাজপত রায়, রবীন্দ্রনাথ, গাঁধী, নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, দিলীপকুমার রায়... ব্যক্তিগত কথোপকথনে এঁরা অনেকেই তাঁর কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছেন (এমনকী স্বয়ং জওহরলালও গাঁধীর তীব্র সমালোচনা করেছেন নিপীড়িতদের জন্য সতিকারের কিছু না করার জন্য, শ্রেণিসংগ্রাম ব্যাপারটা না বোঝার জন্য। 'ভারতবর্ষ দিনপঞ্জি', ১ মে ১৯২৭)। ভারতের সঙ্গে রলাঁর এই বহুমাত্রিক সংলাপ সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এঁদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপে। এইসব চিঠিপত্র ঐশ্বর্যে, গভীরতায়, ঘনত্বে, বৈচিত্র্যে যেন এক সিম্ফনির মতো, কিংবা কখনও এক বেদনার্ত ভারতীয় রাগিণীর মতো... যেমন, ১৯২৫ সালে শেষ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের ভিলন্যভে যাওয়ার পরিকল্পনা নাকচ করে দেওয়ায় যেন সরোদের তার ছিঁড়ে গেছে। চিঠিগুলির অধিকাংশেই উষ্ণ ভালবাসার ছোঁয়া। কখনও কখনও সূক্ষ্ম হাস্যরস, দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু নির্দোষ পরচর্চার (যেমন রথীন্দ্রনাথ বা দিলীপকুমার রায় সম্পর্কে) রং লেগেছে সেখানে। কখনও কথোপকথন হয়ে উঠেছে নীরব, যখন রলাঁ হঠাৎ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁর পাঁজর। ইউরোপের অন্যতম শক্তিধর মানুষটির কোমলতা প্রবাহিত হয়েছে ঝরনার মতো। এই পত্রবিনিময়ে আরও খোদাই হয়ে আছে এক ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্বপ্নের প্রকল্প, 'বিশ্বগ্রন্থাগার' (weltbibliothek)-এর ছবি। এই 'বিশ্বগ্রন্থাগার' হয়ে উঠতে পারত 'শান্তিনিকেতনের এক ইউরোপীয় আত্মজ', যা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

যে-বিরাট ধাক্কায় রবীন্দ্র-রলাঁ বন্ধুত্ব আলোড়িত হয়েছিল তা হল রবীন্দ্রনাথ-মুস্‌সোলিনি বিতর্ক। মুস্‌সোলিনি ও তাঁর প্রশাসনের ছলচাতুরিতে বিভ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর নাটকের ভয়ানক ও নিষ্ঠুর রাজার সঙ্গে তুলনা করে থাকবেন। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের সামনে ফ্যাসিবাদের প্রকৃত চেহারা মেলে ধরার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছেন রলাঁ। ১৯২৬-এ তাঁর কুখ্যাত ইতালি সফরের শেষে রবীন্দ্রনাথ ভিলন্যভে এলে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনের সময় ও পরে ১১ নভেম্বর লিখিত চিঠির শেষে রলাঁ মুস্‌সোলিনির অপরাধ ও কাপট্যের রাজনীতিকে উদ্‌ঘাটিত করেন। ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে রলাঁ রবীন্দ্রনাথ ও ফ্যাসিবাদের শিকারদের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিয়ে দেন। রলাঁই রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় চিঠি লিখিয়ে মুস্‌সোলিনির শাসনের সমর্থনের অভিযোগ অস্বীকার করান। রলাঁ লিখেছেন, 'যারা ফ্যাসিবাদের ইতালীয় শিকার, তারা নিজেরাই রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলে দেয়। ইতালীয় ফ্যাসিবাদের সাক্ষী ও শহিদদের ছাড়া

আমাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেত।' পুরো সমস্যাটিকে আর একবার বুঝে নেওয়ার জন্য ১৯২৬-এর ৩০ সেপ্টেম্বর কালিদাস নাগকে লেখা রলাঁর চিঠির বাংলা অনুবাদ পড়ে নেব আমরা:

রবীন্দ্রনাথ-মুস্‌সোলিনির ব্যাপারটা অবশ্যই এক বিপর্যয়। কোনওরকমে একটা সমাধানের রাস্তা বের করা গেলেও, সেটা কাউকেই খুশি করতে পারেনি। ব্রিটেনের কাগজপত্রে আমি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ফ্যাসিবাদী বন্ধুদের নিয়ে চলমান বিতর্কের খবর পড়ি— সেখানে নজরে পড়ার মতো কোনও সুফল দেখিনি। 'মডার্ন রিভিয়ু' পড়ে বুঝতে পারছি (...) ভারতে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধুরাও কতটা অবাক হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। মুস্‌সোলিনির আতিথেয়তা উপভোগ করার পর তাঁর পক্ষে মুস্‌সোলিনির ইতালিকে প্রকাশ্যে বিচার করা কঠিন। তাঁর সমালোচনাও— তা যতই সংযত হোক না কেন— ইতালির কাগজপত্রে অকৃতজ্ঞতা ও অসৌজন্যের অভিযোগ এনেছে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ফরমিকির মতো বন্ধুদের, যাদের তিনি খাতির করতেন, দুঃখ দিতে কষ্ট পাচ্ছেন। ফলে তিনি তাঁর বিচারকে সংযত রাখছেন, অথবা সমালোচনায় ভারসাম্য আনার চেষ্টা করছেন প্রশংসা দিয়ে।

অন্যদিকে, ফ্রান্স ও জার্মানির ফ্যাসিবিরোধীদেরও তিনি মোটেই খুশি করতে পারেননি। আমার বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া থেকেই সেটা বুঝতে পারছি। সত্যি, রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতায় মুক্ত বিবেকের পূজারিদের মনটা শান্ত হয়েছে, কিন্তু ওই দুর্ঘটনার ছায়া এখনও তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কী করে কেউ ভুলবে যে রবীন্দ্রনাথ মুস্‌সোলিনির মতো একটা খুনির সঙ্গে করমর্দন করেছেন, তাঁর স্তুতি করেছেন, এবং শেষপর্যন্ত (তত্ত্বগতভাবে) ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে প্রবল আপত্তি জানালেও ইতালীয় ফ্যাসিবাদের মূর্তিমান অপরাধীদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

তোমাকে আমার মনের কথা খুলে বলব? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি অনুভব করতে পারছিলাম মুস্‌সোলিনি সম্পর্কে তাঁর এক প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি।

আমায় শুনতে হল— তিনি স্পষ্ট করে বললেন— যে মুস্‌সোলিনির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিত্ব তাঁর শিল্পীমনকে এক হিসেবে মুগ্ধ করেছে। আমি বুঝতে পারছি! নিরোকে আমার বেশ লাগে, তবু ঈশ্বরের দোহাই, আমি নিরোর সময় বেঁচে থাকলে আমার শৈল্পিক কৌতূহলকে দুহাতে চেপে হত্যা করতাম, আর নিরোকে চিহ্নিত করতাম এক ভয়ানক দৈত্য বলে, যে মানবতাকে লাঞ্ছিত করেছে। এইসব কাণ্ডকারখানার সামনে (ইতালিতে যে রক্তপাত ও যন্ত্রণাময় কাণ্ডকারখানা চলছে) শিল্পবৈভবকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। যন্ত্রণা ও রক্তপাত তো ছেলেখেলা নয়!

দেখলাম ফরমিকির শেষ চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তিনি নাকি মুস্‌সোলিনিকে দেখার আগেই এটা জেনে খুশি ছিলেন যে ইউরোপে এমন এক ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছেন যিনি যে-সংস্থাগুলি রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পদদলিত করতে সক্ষম!—'যন্ত্রে'র প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণার ব্যাপারটা আমি ভালই বুঝি— তাঁর সৃজনকর্মে ওটা একটা অন্তঃসূত্রের মতো। আমিও তো নৈতিক ও শৈল্পিক স্তরে যান্ত্রিকতাকে ঘৃণা করি (যদিও মানুষের বিবর্তনে এটা এক অনিবার্য ও প্রয়োজনীয় ধাপ বলে আমি মনে করি, যার মোকাবিলা করা শক্ত, কিন্তু যাকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার)। কিন্তু শুধুমাত্র আমরা কয়েকটি বিরাট রাষ্ট্রের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ যান্ত্রিকীকরণকে ঘৃণা করি বলে আমাদের কি রাজনৈতিকভাবেও সমস্ত ধরনের স্বৈরাচারকে সমর্থন করে যেতে হবে? রবীন্দ্রনাথ প্লেটো পড়েছেন, তিনি জানেন— তাঁর জানা উচিত— যে, যে-প্লেটো গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করতেন না, তিনি নিপীড়নের প্রতি আরও গভীর ঘৃণা পোষণ করেছেন! প্লেটোর কাছে নিপীড়ন হল সামাজিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে জঘন্য রূপ। রবীন্দ্রনাথের মতো মুক্তির মহান পুরোহিতের কি ওই জমানার প্রতি দাক্ষিণ্য দেখানো উচিত, যে-জমানা এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য সব রকম স্বাধীনতাকে বলি দিচ্ছে?— আর সেই ব্যক্তিটিকেই কিনা তিনি বানিয়ে তুললেন এক মহৎ প্রতিভা!

আমি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুটি নীতির—দুটি পৃথক মানুষের— সংঘাত দেখতে পাচ্ছি: একদিকে যাঁর কাছে পৃথিবীটা একটা 'I'altissimo poeta', যাঁর কাছে পৃথিবীটা একটা খেলা, যেখানে কবি নদীতে ভাসতে ভাসতে আবহমানের বন্দনা করেন, যেমন গঙ্গার উপরে রবীন্দ্রনাথ। অন্যদিকে, অবিচারে আহত, বিদ্রোহে স্পন্দিত এক হৃদয়, যা ট্রাজেডির কোনও

কোনও মুহূর্তে অত্যাচারীর প্রতি তাঁর প্রবল ঘৃণা ব্যক্ত করে এবং শান্তির জন্য আবেদন করে।

এ-দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টিই ইউরোপীয় তরুণদের হৃদয়কে রোমাঞ্চিত করেছে। আবার এই মুহূর্তে এই দ্বিতীয়টিকে নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এরা পরস্পরবিরোধী, বেশি দিনের জন্য এদের মেলানো যায় না।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হত সংঘাতকে এড়িয়ে চলা, নিজেকে জোর করে রাজনীতির বাইরে রাখা, কারণ রাজনীতিতে অগভীরতার কোনও স্থান নেই। ওটা তাঁকে মানায়ও না। তিনি রাজনীতির যথেষ্ট খবর রাখেন না, জানতেও চান না।— রাজনীতি নিয়ে তাঁর প্রায় কোনো কৌতূহলই নেই। সবকিছুর আগে তিনি কবি, এই মুহূর্তে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি। কাজেই তাঁর নিশ্চয়ই অধিকার আছে বিবদমান মানুষদের ঊর্ধ্বে উঠে অলিম্পাস পর্বতে অবসর নেওয়ার।— তবে কেন তিনি ফ্যাশনদুরস্ত সরকারি মহলকে এড়িয়ে চলেন না?...

পাঁচ বছর আগে যখন প্যারিসে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন তাঁর কোনো সরকারি স্তুতি বা ঠেকার প্রয়োজন নেই। বলেছিলেন, 'আমি এক মুক্তচেতা ভবঘুরে, আমি সেইরকমই থাকতে চাই'। তারায় ভরা অনন্ত আকাশের ভবঘুরে...বেশ। তবে তিনি সেখানেই থাকুন না কেন!

এইরকম তীব্র ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের পাশাপাশি রলাঁর মতো মানুষই লিখতে পারেন:

সুইজারল্যান্ডে আমাদের এই ছোট্ট বাড়িটা ওই বিরাট বন্ধুটিকে কয়েক দিনের জন্য পেয়ে ধন্য হয়েছে। তিনি চলে যাওয়ামাত্র আকাশ কালো হয়ে এল, ভিলন্যভে আছড়ে পড়ল ঝড়, আর সেই থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। তবু হৃদয়ের মধ্যে ওই আলো আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি।

১৯২৬ সালের অক্টোবরে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় থেকে যে-কৌতূহলের সূত্রপাত তার পূর্ণ রূপ ১৯২৯ সালে প্রকাশিত রলাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীতে। রলাঁর ভাষায়, 'আমি এই পবিত্র জলের সামান্য

একটু সংগ্রহ করেছি যাতে পৃথিবীর বিরাট তৃষ্ণার উপশম করা যায়।' ভারতবর্ষে একবারও না এসে রলাঁর মতো এক সদাব্যস্ত সৃজনশীল প্রতিভা কী করে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ওইরকম শল্যচিকিৎসকসদৃশ জীবনী লেখার সময় পেলেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ১৯২২ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত লেখা হচ্ছিল তাঁর দ্বিতীয় মহান উপন্যাস 'বিমুগ্ধ আত্মা'; 'প্রেম ও মৃত্যুর জুয়াখেলা'-র মতো নাটক ও বেটোফেনের জীবনী (১৯২৮—১৯৪৩)। রলাঁ লিখেছেন, যিশুখ্রিস্টের মতো শ্রীরামকৃষ্ণও 'একটি পূর্ণ মুহূর্তের জাদু-ফসল'। 'আমার কর্তব্য হল ইউরোপে রামকৃষ্ণের সিম্ফনির বাণীকে পৌঁছে দেওয়া'। তিনি সংহত ও সমন্বিত করেছেন অতীতের শত শত সাংগীতিক উপাদান— যেমন বেটোফেন ও ভাগনার, রাফায়েল ও মোৎসার্ট।

ভারতের মাটিতে রলাঁর অনুসন্ধানকে কিছুতেই সারা পৃথিবীর ঘটনা-পরম্পরা থেকে আলাদা করা যাবে না। রলাঁ তাঁর জার্নালে লিখেছেন, 'যে-ভাবনা কর্মে রূপান্তরিত হয় না, তা গর্ভপাত ও বিশ্বাসঘাতকতার সামিল'। দক্ষিণ আমেরিকা, ইতালি ও জার্মানিতে স্বৈরাচার বিষদাঁত বের করলে রম্যাঁ রলাঁ স্তম্ভিত হয়ে গেছেন বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকায়— সেইসব বুদ্ধিজীবীরা যারা 'ক্ষমতার দাস', যারা ' কানে আঙুল দিয়ে উটপাখির মতো মাথা ঢেকে রাখে,' যারা 'প্রভুর সোনার চেনে বাঁধা কুকুরের মতো।' ফ্রান্সে এসব নিজের চোখে দেখেছেন তিনি, বুদ্ধিজীবীদের মুখোশের আড়ালের মুখ তাঁর অতিপরিচিত। 'মাঝে মাঝে অন্ধকারের ভিতর আমি চিৎকার করে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে উঠি, যা হাওয়ায় হারিয়ে যায়।... যখন আমি মরে যাব, ওই প্রহরীদুর্গ পরিত্যক্ত হয়ে যাবে...শুধু শোনা যাবে ঝড়ের গর্জন...'।

ফ্রান্সে তাঁর প্রতি বিদ্বেষের একটি কারণ— অন্যটি অবশ্যই তাঁর জাতীয়তাবাদবিরোধী মনোভাব— সঙ্গে সোভিয়েত দেশের ক্রমবর্ধমান নৈকট্য। কিন্তু এতটাই স্বাধীনচেতা তাঁর মন যে স্বয়ং লেনিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন (দ্র. আঁরি গিলবো রচিত *La Fin des Soviets*, ১৯৩৭)। অন্যদিকে, ১৯৩৩-এ রলাঁ হিটলারি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জার্মানির গ্যোয়েটে-মেডেল প্রত্যাখ্যান করেন, যদিও চার বছর আগে ফ্রয়েড তা গ্রহণ করেছিলেন। রলাঁ তিরিশের দশকে বিশ্ব ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সমিতির সভাপতি হন। নাৎসিরা প্রকাশ্যে রলাঁর বই পোড়ায়, ছাপাখানার ধাতুর প্লেট নষ্ট করে ফেলে। স্বয়ং আঁদ্রে মালরো ও আঁদ্রে

জিদ রলাঁকে টেলিগ্রাম করে জানান প্যারিসে তাঁকে ভীষণ প্রয়োজন। ১৯৩৬ সালে স্টেফান ৎসোয়াইগ তাঁকে অভিহিত করেন 'প্রভু, নেতা, পথপ্রদর্শক, বন্ধু ও কবি' বলে, 'যিনি নিরন্তর আমাদের ঐশ্বর্যবান করে চলেছেন।'

এ-কথা ঠিক যে তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে তিনি ধীরে ধীরে (বিশেষত মারিয়া কুদাশেভার সঙ্গে বিবাহের পর) অন্য এক আকাশে সরে যেতে থাকেন, যে-আকাশ সোভিয়েত ইউনিয়নের। গোর্কির আমন্ত্রণে রলাঁ মস্কো পৌঁছলে তাঁকে নায়কোচিত অভ্যর্থনা জানান হয়, যদিও বেরনার দ্যুশাৎলে তাঁর 'রম্যাঁ রলাঁ: শেষ দরজার চৌকাঠে' গ্রন্থে দেখিয়েছেন রলাঁ একদিনের জন্যও বিবেকের দায় অস্বীকার করেননি। মস্কো বিচার তাঁকে হতবাক করে দেয়, সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি তাঁকে স্তম্ভিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতে তিনি রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছিলেন, বুঝতে পারছিলেন তা অনিবার্যভাবে ভবিতব্যের দিকে চলেছে। ওই সময় তিনি শেষ করেন তাঁর মহত্তম নাটক 'রবেসপিয়ের'। ১৯৩৯ সালে তিনি হিটলারের চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণের প্রতিবাদ করেন এবং 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুদল' থেকে পদত্যাগ করেন।

তবু এ-কথা বললে ভুল হবে যে রম্যাঁ রলাঁ তিরিশের দশকে (বরদাস ফরাসি সাহিত্য-অভিধান যেমন লিখেছে) ভারত সম্পর্কে নিরাশ ('deçu par l'Inde') হয়েছিলেন। ১৯৩৬-এর জানুয়ারিতে যখন প্যারিসের লাতিন কোয়ার্টারের ম্যুত্যুয়ালিতের বিরাট হলঘরে রলাঁর ৭০তম জন্মদিন পালন করা হচ্ছে, তিনি দ্রুতবেগে পাঠালেন ভারতের জন্য এই শুভেচ্ছা-বাণী:

> আমার ভারতের বন্ধুদের প্রতি, আমার ভ্রাতৃ-শুভেচ্ছা! ভারত-প্রতিভার সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রতিভার হোক পরিণয়। আমি দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতের সেই দেবশিশুদের যারা ওই আশীর্বাদ-ধন্য মিলন থেকে জন্ম নেবে। আজকের এই অস্পষ্ট সকালে, আমি সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের দীপ্ত দুপুরকে অভিবাদন জানাই।

১৯৩৮ সালে সুইটজারল্যান্ড ছেড়ে দীর্ঘ পনেরো বছর পরে ফ্রান্সের ভেজ্‌লে-তে ফিরে আসার মুহূর্তে রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'ইন্ডিয়ান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের বুলেটিন মাঝে মাঝে আমার হাতে আসে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে আমি সর্বদাই মুক্তি ও সুবিচারের জন্য সংগ্রামের তালিকায় সবার উপরে আপনার মহান নামটি দেখতে পাই। আশা ও আনন্দের কথা, ফরাসি দেশ জেগে উঠছে, তার একতা, শক্তি, মানবিক কর্তব্য সম্পর্কে সে সজাগ হয়ে উঠছে। কিন্তু ফ্রান্সে যদি ভিক্তর য়্যুগোর মতো এক মহান কবি থাকত, অথবা আপনার মতো!'

হয়তো পুরো ছবিটি না পাওয়ার জন্য, রলাঁ সুভাষচন্দ্র বসু (যাঁর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা ১৯৩৫-এর এপ্রিলে) ও ইউরোপে যুদ্ধের বিনিময়ে তাঁর ভারতীয় বিজয়ের স্বপ্ন সম্পর্কে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁর 'ভারতবর্ষ দিনপঞ্জি' শেষ হচ্ছে সুভাষের খামখেয়ালিপনার নিন্দা করে, যদিও এক সময় তাঁর আন্তরিকতা রলাঁর ভাল লেগেছিল। 'চন্দ্র বোস বার্লিনে হিটলারের সঙ্গে দেখা করেছেন।—আরও একবার তিনি ঝাঁপ দিলেন। এই দক্ষিণে, এই বামে। মস্কো, বার্লিন, টোকিয়ো...এই উগ্রস্বভাব আবেগপ্রবণ বাঙালিদের কখনও যুক্তির রাজনীতি ছিল না। এদের রোষ, এদের ঈর্ষার দমক, এদের অহমিকা এদের জ্বালা করা ক্ষতে দপ করে জ্বলে ওঠে।' (মে ১৯৪২, *ভারতবর্ষ*, অনু. অবন্তীকুমার সান্যাল, র‍্যাডিকাল, ১৯৭৬, পৃ. ৫০৪)।

১৯৪৩-এ জীবনের অন্তিম লগ্নে ভারতীয়দের সম্পর্কে রলাঁর শেষ মন্তব্যের তিক্ততা মুছে ফেলা যাবে না: 'তাঁদের উদ্‌বেগ শুধু তাঁদের স্বদেশের জন্যই। আর তাকে স্বাধীন করার জন্য সমস্ত পন্থাই তাদের কাছে সৎ, এমনকী অপরকে শৃঙ্খলিত করাও।' (ওই, পৃ. ৫০৪)।

১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রথম চিঠির একুশ বছর বাদে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে তোলপাড় করে দিচ্ছে, রলাঁ তাঁকে লিখলেন:

> বিছানা থেকে বহু দূরে আমি দেখতে পাচ্ছি সূর্য উঠছে।
> যুদ্ধ কী একা করে দেয় আমাদের!

১৯৪০-এর ১০ এপ্রিল লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষ চিঠি রলাঁর হাতে পৌঁছোয়নি। নাকি সেটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়? ফ্রান্সে জার্মান অধিকারের ভয়ংকর অন্ধকার দিনগুলিতে কী ভাবছিলেন রলাঁ? ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবর তিনি পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর দিনপঞ্জিতে এর কোনও উল্লেখ নেই।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবিংশ শতাব্দীর ভাঙাচোরা মানচিত্রে রম্যাঁ রলাঁর নিজস্ব কোনও ঘর নেই, ফ্রান্সে তো নেই-ই। এর কারণ কি তিনি ফরাসির চেয়েও বেশি 'বিশ্বনাগরিক' (যা অনেক বড় বড় ফরাসি সাহিত্যেকের ক্ষেত্রে বলা যাবে না)? আঁদ্রে মালরোর ভাষায়, 'ভিক্তর য়্যুগোকে বাদ দিলে রম্যাঁ রলাঁকে কল্পনা করা যাবে না। তিনি যে প্রশংসা ও নিন্দে প্ররোচিত করেছিলেন তা আমরা কোনোদিনও বুঝতে পারব না, যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারছি যে তিনি ছিলেন মহান ফরাসি রোম্যান্টিকদের শেষ প্রতিনিধি'।

রলাঁ ও ভারতবর্ষের এই সংলাপ এক পুরাণ-প্রাচ্যের সঙ্গে এক পুরাণ-পাশ্চাত্যের মিলন নয়। এক ধোঁয়াটে 'অন্যে'র সঙ্গে ছদ্ম-কথোপকথন নয়। ভারতের প্রতি রলাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তাঁকে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদীর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। সঈদ-কথিত 'প্রাচ্যবাদী' বচনের 'আকাঙ্ক্ষা ও পুরাণীকরণ' অনেক পশ্চিমির রচনাকে নষ্ট করে দিয়েছে, একপেশে করেছে মানব-ইতিহাসকে।

এ এক আকস্মিক, কৃত্রিম আলাপচারি নয়। এই আর্তিময় সংলাপের খাঁজে খাঁজে নির্ভেজাল অশ্রুবিন্দু খাঁটি মুক্তোর মতো লেগে আছে।

২০০২

ভালবাসার সেতু: রম্যাঁ রলাঁ-কালিদাস নাগ চিঠিপত্র

একবিংশ শতাব্দীর উৎসমুখে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা একশো বছরের হিসেব-নিকেশ করতে বসলে রম্যাঁ রল্যাঁর সঙ্গে এক বিস্মৃতপ্রায় ভারতীয় চিন্তকের সংলাপের কথা মনে পড়ে যায়। দেয়ালছাদ ভেঙে পড়া এক শ্রদ্ধাহীন শিশ্নোদরতন্ত্রী পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসই হতে চায় না, সমস্ত ঐতিহাসিক ও মানসিক বাধা অতিক্রম করে দুই পৃথিবীর দুই ভাবনাধারার মধ্যে এমন এক ভালবাসার সেতু তৈরি করা যায়!

জলপাতালের ঢেউয়ে কি ভেসে গেল সেই সেতু?

রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীজির সঙ্গে রলাঁর অন্য দুই বিখ্যাত বন্ধুত্বের চেয়ে এ যেন অনেক আলাদা। এখানে খুলে গেছে আগল।

আসলে, ভাষা কোনও বাদ সাধেনি রলাঁ ও কালিদাস নাগের মধ্যে, যদিও তা কখনও কখনও ব্যাহত করেছে রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন। 'আমরা যেন দুটি বধির লোক, যারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না', রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে রলাঁ লিখেছিলেন ১৯৩০ সালের ডায়েরিতে (*Inde*, আলব্যাঁ মিশেল, পৃ. ২৭৭)।

রল্যাঁ-কালিদাসে দেখা হয়েছিল ১৯২২ সালের ৪ এপ্রিল প্যারিসে, কী জানি কী মহালগনে! ১৯২২ সাল টি এস এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড', হেরমান হেস্‌সের 'সিদ্ধার্থ', জেম্‌স্ জয়েসের 'ইউলিসিস'-এর প্রকাশনার বছর। আবার বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠারও বছর। রলাঁর ভারত-পর্যায় তার কয়েক বছর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

প্যারিসে গবেষণা করতে আসা ফরাসি-জানা তরুণ ঐতিহাসিক কালিদাস নাগের বয়স তখন ৩১। ভারতবিদ্ সিলভ্যাঁ লেভির তত্ত্বাবধানে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কূটনীতি-তত্ত্ব' (*Les théories diplomatiques de L'Inde ancienne et L'arthaçastra*)। আর রম্যাঁ রলাঁর বয়স ৫৬। ১৯১৫ সালের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও জীবনীকার রাতারাতি হয়ে উঠেছেন স্বদেশে ঘৃণিত। 'ওদ্ স্যু দ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লা মেলে' (ডামাডোলের উর্ধ্বে) গ্রন্থে স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ মেনে নিতে না পেরে ফরাসি দেশের জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে বানিয়েছে 'রেনিগেড'। এই সেই সংকটময় বছর যখন কালিদাস নাগ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: 'It was one of those critical years when Mahatma Gandhi took the lead in national politics and Tagore began sounding the clarion call of prophecy.' (*Memoirs*, ২য় খণ্ড, রাইটার্স ওয়ার্কশপ, পৃ. ৯) কালিদাস লিখেছেন তিনি কেমন করে দুরু দুরু বক্ষে প্যারিসের লাভ্ন্যু দ্য লব্‌সেরভাতোয়ারে রলাঁর সঙ্গে তাঁর 'বোনের বাসায়' দেখা করতে যান, এবং তাঁকে সনাতন ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রণাম করেন। রলাঁ তাঁর বিরাট সহৃদয় হাত দিয়ে উষ্ণ আলিঙ্গন করে তাঁকে ভেতরে নিয়ে যান। ঘরে ফিরে শিহরিত কালিদাস রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন।

৭ এপ্রিল ১৯২২ মাদ্‌লেন রলাঁকে লেখা কালিদাস নাগের চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে মাদ্‌লেনই ওই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। তিনিই ছিলেন দোভাষী। একটি ভাষ্যে (অরুণকুমার বিশ্বাস, উদ্বোধন, অক্টোবর ১৯৯১) একোল দে লাঁগ জরিয়াঁতাল-এর জ্যুল ব্লকই কালিদাস নাগকে রলাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কালিদাস অবশ্য লিখেছেন তাঁদের আলাপ করিয়ে দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আমার ধারণা, রবীন্দ্রনাথের নামটি তিনি রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন। ফ্রান্সে তাঁর সঙ্গে ছিল কবির একটি ভিজিটিং কার্ড, যা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিত্বের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথই যে কালিদাস নাগের পঠনপাঠনের কেন্দ্র হিসেবে প্যারিসের কথা ভাবেন, তিনিই যে তাঁকে 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর নিজস্ব কপিটি পড়তে দেন, এসব আমরা কালিদাসের স্মৃতিকথার ১ম খণ্ড থেকে জেনেছি।

ভারতীয় ছাত্রটির সঙ্গে প্রথম দর্শনের কথা রলাঁ লিখে রেখেছিলেন তাঁর দিনপঞ্জিতে। তাঁর মনে হয়েছিল কালিদাস 'বুদ্ধিমান, মেধাবী, প্রাণশক্তি আর উদ্দীপনায় ভরপুর' ('ভারতবর্ষ দিনপঞ্জি', অনু. অবন্তীকুমার সান্যাল, ১৯৭৬, ১৯৮৯ সং, পৃ ৩৩)। আর কালিদাসের মনে হয়েছিল তিনি সেই প্রথম এক 'সত্যিকারের মহৎ ইউরোপীয়'-র দেখা পেলেন যিনি 'গ্যোয়েটের প্রত্যাশা পূরণ করেন।' ইস্টার রবিবারে লেখা রলাঁর প্রথম চিঠি থেকে জানতে পারছি, মোঁপারনাসের কাছে রল্যাঁর ৩, রু্য বোয়াসনাদের ফ্ল্যাটে তাঁদের আবার দেখা হবে ১৫ এপ্রিল। রলাঁর বন্ধু এদুয়ার মনো-হেরজেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন,

রলাঁর বোন মাদ্‌লেনও। তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা অচিরেই এক সুরভিত বন্ধুত্বের রূপ নেয়।

১৯২২ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত দু'টি জ্বলন্ত দশকে দুই মহাদেশের দু'টি মানুষ পরস্পরকে অন্তত দেড়শো চিঠি লিখেছেন, যার মধ্যে ১৩৪টির হদিশ পাওয়া গেছে। প্রথম বছরগুলিতে তাঁরা নিয়মিত লিখতেন, এমনকী একই দিনেও লিখেছেন। বিশ দশকের শেষে অথবা তিরিশের দশকের গোড়ায় চিঠির সংখ্যা কমে আসে, অনেক চিঠি, বিশেষ করে রলাঁর, হারিয়ে যায়। চল্লিশের দশকে ফ্রান্সে জার্মান অবস্থানের অন্ধকার সময়ে তাঁরা যোগাযোগ রাখতে পেরেছিলেন কিনা বলা যায় না। যে জার্মানিকে এত ভালবেসেছিলেন রলাঁ তারই পদানত স্বদেশভূমিতে বৃদ্ধ বয়সে কেমন আছেন তিনি, সেই খবর রাখবেন না ভ্রাতৃপ্রতিম কালিদাস, একি হতে পারে? রাখলেও সেই চিঠিপত্রের কোনও চিহ্ন আজ আর নেই।

রলাঁ লিখতেন ফরাসিতে, সযত্নে ১১"/৭-১/২" কাগজ দু'ভাঁজ করে নিয়ে, আর কালিদাস বড় প্যাডের কাগজে, প্রথমে কিছুদিন উচ্ছ্বাসময় ফরাসিতে, পরে ১৯২৩-এর নভেম্বরে কলকাতায় ফিরে এসে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে ইংরেজিতে। কালিদাস নাগ হঠাৎ কেন ফরাসিতে লেখা বন্ধ করলেন খুব স্পষ্ট হয়নি আমার কাছে। হয়তো কলকাতায় ফিরে ফরাসিতে লেখার বাড়তি চেষ্টা করতে ইচ্ছে হয়নি তাঁর। তাছাড়া তিনি জানতেন যে মাদ্‌লেন তাঁর চিঠিগুলি মুখে মুখে তর্জমা করে দেবেন। মাদ্‌লেনও তত দিনে হয়ে উঠেছেন তাঁর সুহৃদ। কালিদাস নাগ ও মাদ্‌লেনের নিভৃত পত্রালাপ এখনও অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে। রম্যাঁ রলাঁ প্রথম দিকে কালিদাস নাগকে 'Cher Monsieur Kalidas Nag' (প্রিয় কালিদাস নাগ মহাশয়) বলে সম্বোধন করলেনও তরুণ বাঙালি ঐতিহাসিকটি অবিলম্বে 'Cher ami' (প্রিয় বন্ধু), 'Mon bien cher ami' (আমার অতি প্রিয় বন্ধু), 'Mon cher et fraternel Ami' (আমার প্রিয় ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু), এমনকী 'Frère Nag' (ভাই নাগ) ও 'কালিদাস'! আর কালিদাস তাঁকে সম্বোধন করেছেন 'Mon Maître' ('গুরুদেব') বলে। 'নাগ' মানে সাপ, জানতেন রলাঁ। কখনও আদর করে সম্বোধন করেছেন 'le petit serpent', ছোট্ট সাপ।

দেখা হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর প্রথম দীর্ঘ চিঠিতে (ইস্টার রবিবার, ১৯২২) রলাঁ ভারতীয় তরুণটিকে লিখেছিলেন, 'আমি আশা করি আমাদের

পরিচয় ইউরোপীয় ও এশীয় ভাবনার মিলনে সাহায্য করবে, যা আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক আদর্শ। আমি সেই কর্তব্যে দৃঢ়সংকল্প। তোমাকে ভারতবর্ষের ভবিতব্যে আস্থা রাখতে হবে। তার মহান আত্মা একদিন সারা বিশ্বকে আলোড়িত করবে! ভারতের দুর্ভাগ্য যে সে প্রথমে নিজেকে হারিয়ে ফেলল, আর তারপর সংস্পর্শে এল তাদের যারা ইউরোপের সবচেয়ে সংকীর্ণমনা, যারা এক বদ্ধ ও প্রভাবমুক্ত খোলসের মধ্যে বাস করে, যাদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সবচেয়ে কম। অন্যদিকে, লাতিন, জার্মানীয় ও স্লাভীয় ইউরোপ ভারতপ্রতিভাকে বুঝতে ও ভালবাসতে অনেক বেশি প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তার সে সুযোগ হয়নি।' তাঁর দুই গুরু বেটোফেন ও গ্যোয়েটের মতো, রম্যাঁ রলাঁও ভারতের 'প্রাচীন মনের মৌচাক ও স্বর্গীয় বহুমাত্রিকতা' সম্পর্কে গভীরভাবে কৌতূহলী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় একোল নরমাল স্যুপেরিয়রের দিনগুলিতে ব্যুরনুফের অনুবাদে তিনি পড়েছিলেন গীতা, যেটিকে তাঁর মনে হয়েছিল একটি 'আগ্নেয়গিরির' মতো। তার কিছু অংশ তিনি লিখে রেখেছিলেন নিজের 'দাঁতঁ' নাটকের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার পেছনে ('রম্যাঁ রলাঁ', জাঁ-বেরত্রাঁ বারের, ১৯৭৮, পৃ. ১৩৩)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি যখন দেখলেন 'ইউরোপ খসে পড়ছে পাথরের টুকরোর মতো' ('Europe tombe comme une pierre'), তখন ভারতবর্ষের দিকে মনের খোরাকের জন্য, আলোর জন্য হাত বাড়ালেন তিনি। কালিদাস নাগকে লেখা এক অবিস্মরণীয় চিঠিতে রলাঁ মধ্যযুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় ও ইউরোপীয় অধ্যাত্মবাদের সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন: 'আশ্চর্য হওয়ার মতো এই সাদৃশ্য। আমি অবাক হয়ে দেখেছি এদের পরস্পরকে ঈর্ষা করার কিছু নেই। যোগের সমস্ত রূপ এবং জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম, সবই এখানে ছিল।' (২২ জানুয়ারি ১৯২৯)

ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে, যখন পশ্চিম তাঁকে হতাশ করেছিল আর পুব ছিল প্রকৃত অভিগম্যতার অতীত, রলাঁর মনে হয়েছিল কালিদাস সেই সংস্কৃতিকর্মী যিনি তাঁর জাতের গুণগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্যসুলভ ক্ষিপ্রতা, নিপুণতা ও যথাযথতাকে মিলিয়ে নিতে পেরেছেন— যা যৌথ কর্মের ক্ষেত্রে এত প্রয়োজনীয় (রলাঁর চিঠি, ১৮ আগস্ট ১৯২৫)। রলাঁ কালিদাসের মধ্যে দেখেছিলেন 'ইউরোপের চিন্তা-শৃঙ্খলা ও এশীয় গভীরতার মিশ্রণ' (১৮ ডিসেম্বর ১৯২৪)। রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, কালিদাস এক 'ভারতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হার্মিস', 'আমাদের শ্রেষ্ঠ বার্তাদূত।' কার্লোস আমেরিকো আমাইয়াকে লিখেছিলেন (২৪ জুলাই ১৯২৪) কালিদাস নাগ হলেন 'এক Weltbürger, বিশ্বপথিক, ভারতের উদারতম আত্মাদের একজন।' সিকদারবাগানের মতিলাল নাগের ছেলে কালিদাসকে রলাঁ সনাক্ত করবেন তাঁর 'প্রতিনিধি', 'বৌদ্ধিক সেনাপতি' (Lieutenant intellectuel) এবং 'চিরকালীন বন্ধু' হিসেবে (*Inde*, ২০ জুন ১৯৩০)। এ এক বিরল প্রশংসা, সেই মহৎ ও অগ্রণী চিন্তকের কাছ থেকে যিনি সমকালের প্রায় সমস্ত ভাবুকের সঙ্গে চিন্তা বিনিময় করেছিলেন: টলস্টয়, গাঁধীজি, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, অ্যালবার্ট শোয়াইটজার, ম্যাক্সিম গোর্কি, বার্নার্ড শ, পল ক্লোদেল, জগদীশচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, মঁতেরলাঁ, শার্ল পেগি ও বার্ট্রান্ড রাসেল। এঁদের সকলের মধ্যে আলাদা আসন পাতা রইল কালিদাসের জন্য।

এমনই এক মানুষকে খুঁজছিলেন রলাঁ— যিনি কান পেতে থাকেন, যিনি পরিণামের কথা ভেবে কুঁকড়ে না গিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ হতে চান। যাঁর সততা ও আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করা যায়; যিনি খোলা মনে জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিশ্লেষণ করতে জানেন। অথবা গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্বকে বুঝতে চান, তাঁদের অসম্মান না করে । সবচেয়ে বড় কথা, তিনি রলাঁকে রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে পারেন চোখে ঠুলি না-পরে: 'আমায় রবীন্দ্রনাথের কথা লিখো। তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যা লিখবে তাই আমার কাছে মূল্যবান।' (রলাঁর চিঠি, ১২ নভেম্বর ১৯২২)

রলাঁ-কালিদাসের পত্রাবলিতে লুকিয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রদ্ধার পাশাপাশি তীব্র ও নির্মোহ বিশ্লেষণ, যেমন ৫/৭ জুলাই ও ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬-এ লেখা রলাঁর চিঠি (পাঠকের সুবিধার্থে প্রথমটির ফরাসি থেকে বাংলা অনুবাদ সংযোজন করেছি এই নিবন্ধের শেষে) এবং কালিদাসের উত্তর, বিশেষত ৪ আগস্ট ও ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৬। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মোটা দাগের সাদা-কালো বিতর্ক এ নয়, 'পৃথিবীর মহত্তম এক কবির' (রলাঁর ভাষায়) প্রতি ভালবাসা এই সমালোচনাকে সুদৃঢ় করেছে। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ইতালি-ভ্রমণকে প্রবলভাবে আক্রমণ করার অব্যবহিত পরে একমাত্র রম্যাঁ রলাঁই লিখতে পারেন: 'আমাদের সুইজারল্যান্ডের বাড়ির পক্ষে এ এক আশীর্বাদ যে আমাদের মহান বন্ধু কয়েকটি দিন এখানে কাটিয়ে গেলেন।' (৫/৭ জুলাই ১৯২৬)

রল্যাঁ-কালিদাস পত্রাবলির মধ্যে বারুদের মতো লুকিয়ে আছে রবীন্দ্র-মুস্‌সোলিনি বিতর্ক, ১৫ মার্চ ১৯২৬-এ লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের ইতালি-যাত্রা ঠেকানোর চেষ্টা থেকে শুরু করে কেলেঙ্কারির পরবর্তী সমস্যা পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ-মুস্‌সোলিনি বিতর্ক সম্পর্কে নানা পরস্পরবিরোধী ভাষ্য থেকে যা বোঝা যায়নি, রলাঁ-কালিদাসের পত্র-সংলাপ থেকে তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়। ব্যাপারটা যে ভুল বোঝাবুঝির বেশি কিছু ছিল, রলাঁ তা বুঝেছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কম কষ্ট পাননি। এত সূক্ষ্ম (delicate অর্থে) ও শক্ত ভাবে তিনি সমস্যাটির সমাধান করেন যে যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালির তাঁর কাছে ঋণের শেষ নেই। রবীন্দ্রজীবনীগুলিতে অবশ্য রলাঁর ভূমিকার পূর্ণ স্বীকৃতি চোখে পড়ে না। কঠিন বাস্তবকে জানার জন্য (রবীন্দ্রনাথ ইতালিতে পাকাপাকিভাবে বাস করবেন এমন কুৎসিত গুজবও ছিল) রলাঁ-কালিদাস চিঠিপত্র পড়া প্রয়োজন। ('দ্য টাওয়ার অ্যান্ড দ্য সী: রম্যাঁ রলাঁ-কালিদাস নাগ করেসপন্ডেন্স', প্যাপিরাস, দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট ১।)

কালিদাস-রলাঁর যৌথ উদ্যোগের সেরা উদাহরণ 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোর'-এর অশোভন পশ্চাৎপট, রবীন্দ্র-পারিষদদের দায়িত্বহীনতা, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান ধৈর্যচ্যুতি (রলাঁর চিঠি, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৩), বাংলার নবজাগরণ, বিশেষত রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে রলাঁর যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, গাঁধীজি, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আলোচনা রলাঁ-কালিদাস পত্র-সংলাপকে এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য দিয়েছে। আমরা দেখি, কালিদাস নাগ কীভাবে রলাঁকে ভারতের সমস্যাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করছেন। শান্তিনিকেতনের মূল্য-বিশৃঙ্খলার কথা খোলা মনে জানিয়ে দিচ্ছেন (যেমন, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৫, ১ অক্টোবর ১৯২৫ ও ৪ অগাস্ট ১৯২৬ তারিখে কালিদাস নাগের চিঠি), সাহায্য করছেন গাঁধীজি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তিনটি যুগান্তকারী বই লিখতে। অথবা মাদ্‌লেনকে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' অনুবাদে সাহায্য করতে।

এই আশ্চর্য সংলাপে কালিদাস নাগ নিজে সর্বদা থেকেছেন দ্বিতীয় কথক। তিনি যেন এক স্বপ্নের সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারী, যিনি জানেন কী করে নানা উপায়ে আসল কথাটি টেনে বের করা যায়। এই দুর্লভ গুণের সম্ভবত শ্রেষ্ঠ নমুনা ১০ জুলাই ১৯২৮ তারিখে লেখা তাঁর চিঠি। বেটোফেনের ডায়েরি অথবা স্কেচবুক সম্পর্কে রলাঁ কালিদাসকে যা লিখেছেন তা কালিদাস নাগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের চিঠিগুলি সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য:

এক সৃজনশীল মনের অবচেতনে প্রবেশ করার জন্য এখানে ছড়ানো হয়েছে অনন্য সম্ভার। আমরা দেখতে পাচ্ছি কীভাবে এক মহৎ শিল্পের জন্ম হচ্ছে এবং তা গাছের মতো বেড়ে উঠছে। (১৫ জুন ১৯২৭)

কোনও এক গভীর গোপন মুহূর্তে খুলে গেছে সব দুয়ার। রলাঁ এক তরুণ ভারতীয়কে বলেছেন সেই কথা যা তিনি মালভিদা ফন মেজেনবুগ ও লুইজ ক্রুপ্পির পর আর কারুর কাছে বলেননি।

আমি কোনও আদর্শ নই! আমি এক জীবন্ত মানুষ— যে অত্যন্ত সজীব, অত্যন্ত স্বাধীন এবং অত্যন্ত জটিল! সকলে আমাকে বুঝবে না। (৩০ ডিসেম্বর ১৯২২)

আমি একা— একা— একা! আমার শুধু দুটি বন্ধু ছিল (দুজনেই নারী)। একজন মারা গেছে, অন্য জন তার চেয়েও খারাপ... (অন্য জন স্ত্রী, বিচ্ছেদের পর ১৯০৩-এর জুনে আবার বিয়ে করে।) (ব্যক্তিগত কাগজপত্র)

ভারতবর্ষে তোমার ঠিকানা জানাতে ভুলো না। (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৩)

কালিদাস বেশিদিন চিঠি না লিখলে যেন ছিঁড়ে গেছে যন্ত্রের তার!

একটা পোস্টকার্ডে অন্তত কয়েকটা লাইন লিখে আমাকে আশ্বস্ত কোরো।

তারপর এক ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে গভীর সহানুভূতিতে কালিদাসের আর্থিক সংকটের সময় সাহায্য করতে চাইছেন সেই রলাঁ যাঁর নিজের অসচ্ছলতার

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা আমাদের সকলের জানা (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫); অথবা ভায়ের মৃত্যুর পর সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাঁকে (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫)। এই বন্ধুত্ব এক চরমবিন্দুতে পৌঁছয় যখন কালিদাস নাগ তাঁর বুকে মাথা রেখে কাঁদেন (*Inde*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩০)। এ যেন এক অপরূপ, প্রকাশাতীত মুহূর্তের কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ যখন অবশেষে এসে পৌঁছলেন ভিলন্যভে ১৯২৬-এর জুন, সেই মুগ্ধতার মুহূর্তে পাখির কূজন আর গোলাপের রাশির মধ্যে রলাঁর মনে পড়েছে কালিদাস ও শান্তার কথা। রলাঁ যখন জেনেছেন কালিদাস-শান্তার নবজাত কন্যার কথা তিনি শিহরিত হয়েছেন, বুঝতে পারেননি কী নাম দেবেন মেয়েটির— ল্যুস, ফ্রাঁস, ফ্রাঁসিন না মাদ্‌লেন! (রলাঁর চিঠি, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬)

দু'জনের বোঝাপড়া এমন এক গভীরতায় পৌঁছেছিল যে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝিকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন তাঁরা। যেমন ধরা যাক, রলাঁর বোন 'গোরা' উপন্যাস ফরাসিতে অনুবাদ করতে মনস্থ করার পর কালিদাস হঠাৎ ওই একই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় রলাঁর ক্রোধ (২ মার্চ ১৯২৩); অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কালিদাস নাগের শ্লেষোক্তির পর আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মতো রলাঁর যুক্তিঋদ্ধ আক্রমণ (১৫ মে ১৯২৮)। যতটা খোলা তাঁদের মন, ততটা আত্মমর্যাদাময় তার প্রকাশ।

রলাঁ-কালিদাসের পত্রাবলিতে ধরা আছে কয়েকটি বিস্ফোরক প্রশ্নের উত্তর: রলাঁ ভারতবর্ষকে তাঁর সত্যিকারের দেশ মনে করলেও ('এই জন্মে আমি ভুল বাড়িতে জন্মেছি') কেন কোনও দিন এলেন না এখানে, অথবা সুইজারল্যান্ডে সুদীর্ঘ ১৭ বছরের স্বেচ্ছানির্বাসন শেষে কেন তাঁকে ফিরে যেতে হল ফ্রান্সে ১৯৩৭ সালে। খবর দুটি সারা বিশ্বের ছড়িয়ে থাকা রলাঁ-অনুরাগীদের অনেকেরই অজানা। এই ফরাসি চিঠিগুলিতে বন্দি হয়ে আছে 'ইয়াংকি ঔপনিবেশিকতাবাদ'-এর দ্রুত বিস্তার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের 'অনিবার্য ভবিতব্য' সম্পর্কে রলাঁর ভয়, ফরাসি লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের কাপট্য ও নিজের প্রিয়তম মাধ্যম থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর মতামত। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোধহয় তাঁর আত্মপক্ষ-সমর্থন (১২ জুলাই ১৯২৮), যা তাঁর জীবনী-লেখকদের কাছে অপরিহার্য হবে।

যখন একনায়কত্ব ও স্বৈরাচার বিষদাঁত বের করল পেরু, ইতালি, জার্মানিতে... রলাঁ কালিদাসকে লিখলেন অমেরুদণ্ডী বুদ্ধিজীবীদের,

'ক্ষমতার দাস' (les laquais du pouvoir)-দের (১ ডিসেম্বর ১৯২৭) প্রতি তাঁর সীমাহীন ঘৃণার কথা। যাঁরা তাদের 'কান ঢেকে রাখেন উটপাখির মতো' আর রলাঁ পালন করে চলেন তাঁর ধন্যবাদহীন প্রহরীর ভূমিকা:

> মাঝে মাঝে গভীর রাতে মাঠের মধ্যে আমি চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর আমার চিৎকার ভেসে যাচ্ছে হাওয়ায়... যখন আমি আর থাকব না, এই প্রহরীদুর্গ পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। শুধু শোনা যাবে ঝড়ের গর্জন... (১ ডিসেম্বর ১৯২৭)

একদিকে যেমন ট্র্যাজেডির সব উপাদানই আছে তাঁদের সংলাপে, তেমনই আছে সংগ্রামের কথা:

> আমাদের স্বপ্ন কোনও দিন সফল হবে না । সর্বদাই তা থেকে যাবে আয়ত্তের বাইরে। আর তাই হবে আমাদের বেঁচে থাকার কারণ— যাতে আমরা আরও দূরে যেতে পারি। উঠতে পারি আরও ওপরে, বেড়ে উঠতে দিতে পারি জীবনের গাছকে। (রলাঁর চিঠি, বড়দিন ১৯৩৫)

> আমরা হলাম 'গীতা'-র ধনুর্বীরদের মতো। আমরা নিজেদের জন্য যুদ্ধ করছি না। আমরা যুদ্ধ করছি আগামী প্রজন্মগুলির সুখ ও মুক্তির জন্য। (রলাঁর চিঠি, ২৯ মে ১৯৩৭)

রলাঁ তাঁর জার্নালে লিখেছিলেন, 'Toute pensée qui n'agit point est un avortement on une trahison.' (যে চিন্তা ফলবান হয় না তা এক গর্ভরোধ বা বিশ্বাসঘাতকতা।) (জার্নাল, ২৯ জানুয়ারি ১৯৩৬)

প্যারিসে গবেষণা করার সময় কালিদাস নাগের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আঁরি বের্গসন ও আঁদ্রে জিদের, বন্ধুত্ব হয়েছিল হেরমান হেসসের (যাঁর সঙ্গে ১৯২২ সালে আলাপ করিয়ে দেন স্বয়ং রলাঁ) সঙ্গে, গবেষণা করেছিলেন সিলভ্যাঁ লেভি ও জ্যুল ব্লকের তত্ত্বাবধানে, কাজ করেছেন কবি পিয়ের জাঁ-জুভের সঙ্গে ('বলাকা'-র যৌথ অনুবাদক), কিন্তু কালিদাসের কাছে রলাঁর মতো বিশিষ্ট আসন পেলেন না তাঁরা কেউ। রলাঁর প্রভাব ছাপ ফেলেছে

কালিদাসের বিশ্ববীক্ষায়: 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' (১৯৩২-৩৪) , 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক ওয়ার্ল্ড' (১৯৪২) , 'টলস্টয় অ্যান্ড গান্ধী' (১৯৫৪) , 'ডিসকভারি অফ এশিয়া' (১৯৫৭) 'গ্রেটার ইন্ডিয়া' (১৯৬০)-র পাতায় পাতায়, এক বৃহত্তর আকাশের সন্ধানে।

রলাঁ আর কোন অনুরাগীকে কী দিয়েছিলেন আমরা জানি না, কিন্তু ওই তরুণ বিদ্যুৎময় বাঙালিকে তিনি দিয়েছিলেন বিরল সব দলিল: জাঁ-ক্রিস্তফের ব্যক্তিগত নোট, আত্মকথা 'ক্রেডো কুইয়া ভেরম'-এর কপি, টলস্টয়-রলাঁর মূল চিঠিপত্র, শেক্‌স্‌পিয়ার-বিষয়ক একটি অজানা নিবন্ধ, জীবনীকারদের (স্টেফান ৎসোয়াইগ, পিয়ের জাঁ-জুভ বা ইদানীংকালের বেরনার দ্যুশাৎলে) অজানা একটি অতি-ব্যক্তিগত জীবনলিপি এবং তাঁর জীবনের সারাৎসার 'অন্তর্যাত্রা': 'ল্য ভোয়াইয়াজ এ্যাঁতেরিয়র'-এর একটি অধ্যায়ের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি। কালিদাস তাঁর 'গুরু'-কে বারবার কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখবেন, কিন্তু সম্ভবত সময়াভাবে সেই কাজ করে উঠতে পারেন নি। রলাঁ তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন, দুঃখ পেলেও ক্ষমা করতে বাধেনি।

তিরিশের দশকে মারিয়া কুদাশেভার সঙ্গে বিবাহ ও সোভিয়েত-ভ্রমণের পর ভিন্নতর ক্রিয়াকর্মে জড়িয়ে পড়েন রলাঁ। কিন্তু তার মধ্যেও কালিদাস নাগকে লিখেছেন:

> আমি তোমায় এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি। মাঝে মাঝে আমি তোমার সঙ্গে মনে মনে কথা বলি। আমার শরীরকে ক্ষয় করছে ভেতরের শত্রু। তবু তত দিন আমি বেঁচে থাকতে চাই, যতদিন না তুমি আমার চৌকাঠে পা রাখবে আবার। (২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৩)

কালিদাসকে লেখা শেষ চিঠিতে যেমন রবীন্দ্রনাথের কথা লিখেছেন রলাঁ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে লেখা শেষ দুটি চিঠিতেও তেমন (৫ ডিসেম্বর ১৯৩৭ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০) কালিদাস নাগের কথা জানতে চেয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা রলাঁর অন্তিম বাক্যগুলি ছিল এইরকম:

> বহুদিন আমাদের দু'জনের যৌথ বন্ধু কালিদাস নাগের কোনও খবর পাই না, আমরা উৎকণ্ঠার মধ্যে আছি ।

মাত্র কয়েক দশক আগে লেখা রম্যাঁ রলাঁ-কালিদাস নাগের চিঠিপত্র পড়তে পড়তে মনে হবে, এই সময়ের সমস্ত তাত্ত্বিক চতুরালি ও কৃত্রিমতা অতিক্রম করে এক অন্য তরঙ্গদ্রাঘিমায় পৌঁছে যাচ্ছি আমরা। কথা এত বদলে গিয়েছে গত কয়েক দশকে, এত কঠিন ও শুকনো হয়ে গেছে কথা যে শম্পের মতো গহন এই চিঠিগুলির উচ্ছ্বাস ও সরলতা আমাদের অস্বস্তিতে ফেলবে। এই মেরু-অতিক্রান্ত কণ্ঠস্বর দুটি শুনতে শুনতে মনে হবে খুব কম সময়ের ভেতর কতকিছুই যে আমাদের মুঠো থেকে হারিয়ে গেছে!

১৯৯৬

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট ১

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কালিদাস নাগকে লেখা রম্যাঁ রলাঁর একটি ব্যক্তিগত চিঠি

ভিলন্যভ (ভো), ভিলা অলগা[১]
সোমবার ৫ই ও বুধবার ৭ই জুলাই ১৯২৬

প্রিয় বন্ধু,

গতকাল বিকেল পাঁচটায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে জুরিখ (২ দিন) ও ভিয়েনা রওনা হয়ে গেছেন। প্রায় দু সপ্তাহের মতো তাঁর সঙ্গলাভের আনন্দ পেয়েছিলাম আমরা।[২] এক দীর্ঘ ও কষ্টকর যাত্রায় তাঁকে রওনা হয়ে যেতে দেখে— যা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে না জানি কতটা ক্ষতিকারক হতে চলেছে— আমাদের মন ভারাক্রান্ত।

মঙ্গলবার ২২শে জুন তিনি যখন তুরিণ থেকে এসে পৌঁছলেন, ভীষণ অবসন্ন দেখাচ্ছিল তাঁকে। তিনি বদলে গেছেন মনে হচ্ছিল। ইতালিতে তাঁকে ব্যবহার করা হয়েছিল (সর্বার্থে: পরে বলছি কীভাবে তাঁকে ব্যবহার করা হয়েছে)। তাঁর হৃদয় ক্লান্ত, কথা বলতে পারছিলেন না, বিশ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিন্তু আমাদের এই ছোট্ট দেশ সুইজারল্যান্ডের শান্তির আবহ, প্রায় জনশূন্য গ্র্যান্ড হোটেল, জানলা পর্যন্ত ছড়ানো সমুদ্রের মতো হ্রদটি... এসব তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলল। গোড়ার কটা দিন তিনি নৈঃশব্দ্য আর বাতাস, অজস্র ফুলের রাশি আর পাখির কূজনকে উপভোগ করেছেন মনে হল। (শুধু গোলাপ আর পর্ণরাজি! যে পনেরোটা দিন তিনি এখানে ছিলেন সেটাই ছিল এ বছরের সেরা সময়। ভাই রবিকে অভ্যর্থনা জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সূর্য।) রবীন্দ্রনাথ এই অপরূপ সুন্দর জায়গাটিকে কিছুটা ঈর্ষান্বিতভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করলেন। শরীর সারানোর জন্য এখানে এক মাস বা তার বেশি থাকতেও রাজী ছিলেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু দিন আষ্টেক যেতে না যেতেই বাংলাদেশের জন্য মন কেমন করতে লাগল তাঁর।— পথে নামার গোপন উত্তাল আকাঙ্ক্ষা, এক দীর্ঘ যাত্রার পরিকল্পনা, যার কোনো কথাই ছিল না। (তিনি জানিয়েছিলেন ইতিমধ্যেই ১৫ই সেপ্টেম্বরের জাহাজে রিজার্ভেশন হয়ে গিয়েছিল তাঁর।) তিনি ভাবতে শুরু করলেন ভিয়েনা, প্রাগ, প্যারিস, লন্ডনের পর আমেরিকা যাওয়ার কথা... প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে জাপানে পৌঁছনোর কথা, ভারতবর্ষে ফেরাটা আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়ে।... আমি তোমার কাছে লুকোব না যে পরিকল্পনাটা আমার অস্বস্তিকর লেগেছিল । ঐরকম বিশ্রী মরশুমে ছ থেকে আট মাসের নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তি, আমেরিকা আর জাপানের শীত— এসব সহ্য করতে হলে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন! কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীসাথীদের ভেতর কেউই মুখ খুলতে সাহস পেলেন না। তাঁরা সবকিছু ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, আর সেটা সবচেয়ে বিপজ্জনক!

আমার এই চিঠি *একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয়,* আমি তোমায় আর কল্যাণীয়া শান্তাকে অনুরোধ করব কঠোরভাবে এর গোপনীয়তা রক্ষা করতে।

আট দিনে এমন কী ঘটে থাকতে পারে যার ফলে কবির দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে গেল? সন্দেহ নেই, তাঁর মনের গভীরে ছেয়ে আছে এক প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ, যা তাঁর হৃদরোগের একটি লক্ষণ হতে পারে— যা তাঁকে একটুও স্থির থাকতে দেয় না, এখানে ওখানে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। হয়তো সেই সঙ্গে তাঁর সামাজিক প্রকৃতির কাছে ভিলন্যভ একটু বেশি নির্জন ঠেকে থাকতে পারে (তিনি স্বীকার করলেন একা থাকলে তিনি এক গভীর উদ্বেগে ভোগেন)। কিন্তু আমার অনুমান, এর পেছনে আরো অন্য কারণ রয়েছে: সেটা হল তাঁর ইতালি-ভ্রমণকে কেন্দ্র করে ইউরোপের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সম্পর্কে সূক্ষ্ম একটা সচেতনতা।

আজ আমি তোমায় প্রথমে সেইটে নিয়েই কিছু বলতে চাই। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ইউরোপে যে জ্যোতির্বলয় তা তাঁর সুন্দর কাব্যকৃতির জন্য ততটা নয় (সংখ্যায় অত্যন্ত কম ও বিশ্রীভাবে অনূদিত, বিশেষত ফ্রান্সে[৩]) যতটা তাঁর কথার ভাববাদী উচ্চতার জন্য, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়কার কিছু বক্তৃতায়, যখন তিনি পাশ্চাত্যসভ্যতার দোষত্রুটি ও অপরাধগুলির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন! তাঁর সেই কথা

পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে স্বচ্ছদৃষ্টি মানুষজনের অন্তরতম অনুভূতিকে স্পর্শ করেছিল।[৪] আর দূর থেকে, উঁচু থেকে আসা সেইসব কথার সে যে কী প্রতিধ্বনি জেগেছিল তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। সেই থেকে ইউরোপের এলিট তাঁকে ধ্রুবতারা হিসেবে— সুবিচার ও মুক্তির প্রতিমূর্তি হিসেবে— স্বাগত জানিয়েছে। এঁদের চূড়ান্ত হতবুদ্ধি অবস্থার কথা একবার ভাবো যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে রবীন্দ্রনাথ এমন একজনের রাষ্ট্রীয় অতিথি হতে রাজি হয়েছেন যে ইউরোপে সবচেয়ে নিপীড়নকারী, বর্বর, মারাত্মক স্বৈরাচারের প্রতীক— আমেনদোলা[৫] ও মাত্তেয়ত্তির[৬] হত্যাকারী— মুস্‌সোলিনি... আমি মহলানবিশের কাছে শুনেছি কীরকম ধূর্তভাবে পুরো পরিকল্পনাটা তৈরি করা হয়েছিল কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর সহায়তায় (ফ্রান্সেও যে কিছু অন্যরকম হত তা নয়, বুদ্ধিজীবীরা সর্বত্র একরকম)— ইতালিতে যারা নিজেদের ক্ষমতার দাসে পরিণত হয়েছিল। আমি জেনেছি কীভাবে ভারতবর্ষ ছাড়ার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সঙ্গীসাথীদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়,— ইতালিতে পৌঁছে তিনি জানতেই পারেন নি তিনি কার অতিথি। আমি আরো জেনেছি যে সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর পক্ষে এমন একটি লোকের সঙ্গেও দেখা করা সম্ভব হয়নি যে ফ্যাসিবাদের তাঁবেদার নয়। অধ্যাপক ফরমিকি[৭] কবিকে মরিয়া হয়ে আগলে রেখেছিলেন এমনকী ডিউক স্কত্তির[৮] মতো বন্ধুদের থেকেও, যাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ যদি জেদ করে (ভাগ্যের জোরেও, পরে আসছি সেকথায়) রোম রওনা হওয়ার দিন সকালে বেনেদিত্তো ক্রোচের[৯] সঙ্গে দেখা করতে পেরে থাকেন, ভীতু ও সাবধানী ক্রোচে সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বলার সাহসই পাননি। এর ফল কী হতে পারে অনুমান করা কঠিন নয়। ইতালির ফ্যাসিস্ট প্রেস (অন্য কাগজপত্রের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল) সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিস্ট বানিয়ে তুলল, তাঁর মুখে নানা কথা আরোপ করা হল, বলা হল রবীন্দ্রনাথ মুস্‌সোলিনিকেই ইতালির মহনীয়তার কারণ বলে মনে করেন। দু-এক সপ্তাহের আগে রবীন্দ্রনাথ এসবের কিছুই জানতে পারেন নি।...

ইউরোপে এর কী প্রতিক্রিয়া হল বুঝতে পারছ! আমি ইতালির ফ্যাসিবাদ বিরোধী তরুণ ছাত্রদের কাছ থেকে উদ্বিগ্ন চিঠিপত্র পেয়েছি, অনেকে আমার সঙ্গে দেখাও করেছেন... প্যারিসে *L'Humanité*-র মতো কাগজ রবীন্দ্রনাথের

মুখে আরোপিত কথাগুলি— যেন সেসব সত্যি— নতুন করে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথকে কড়াভাবে নিন্দে করার উদ্দেশ্যে তারা সেগুলিকে টেক্সট্ হিসেবে ব্যবহার করে।

তক্ষুনি এর একটা বিহিত করা দরকার ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন জানতে পারলেন কীভাবে ইতালীয় প্রেস তাঁর মুখে কথা বসাচ্ছে, তিনি নিজেই এর উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন তিনি (ফ্রান্স ও ইংলন্ডের) কাগজে একটি সাক্ষাৎকার দিতে চান যেখানে তিনি ফ্যাসিবাদ বিষয়ে সরাসরি তাঁর অভিমত জানানোর সুযোগ পাবেন।

আমি জর্জ দ্যুয়ামেলকে[১০] তার করি। ফ্রান্সে আমার পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে (যাদের বয়স চল্লিশ) তাঁর নামই সবচেয়ে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, বৃহত্তর মানবজাতির মুক্ত চিন্তার প্রতিনিধি তিনি। তাছাড়া তিনি মধ্যপন্থী, বাম বা দক্ষিণ কোনো রাজনীতিই করেন না। রবীন্দ্রচিন্তা বোঝা ও বোঝানোর জন্য তিনিই যোগ্য লোক। দ্যুয়ামেল পত্রপাঠ উপস্থিত হলেন, ঠিক হল তিনি একটি প্রশ্নমালা তৈরি করবেন এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে রবীন্দ্রনাথ লিখিতভাবে সেটির উত্তর দেবেন। সেই রকমই হল। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আমন্ত্রণ করলেন তাঁর উত্তর শোনানোর জন্য— মাদ্‌লেন যা আমাদের অনুবাদ করে দেবে।

তিনি যা বললেন তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সত্যি কথা, রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের এক তাত্ত্বিক ও কিছুটা প্লেটোনিক সমালোচনা করেননি তা নয় (ওটা তিনি এক ফ্যাসিবাদী তাত্ত্বিকের সঙ্গে আলোচনা হিসেবে সাজিয়েছিলেন, যার নাম তিনি দেননি), কিন্তু তাঁর ইতালি-ভ্রমণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে ফ্যাসিবাদের নিয়মশৃঙ্খলা সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, এবং তা নিয়ে তিনি তর্কে যেতে রাজি ছিলেন না। লেখাটির শেষে ছিল মুস্‌সোলিনির এক প্রশস্তিমূলক ছবি (যা তার সাথে দুটি সাক্ষাতের স্মৃতির ভিত্তিতে রচিত)। মুস্‌সোলিনিকে তিনি তুলনা করলেন নেপোলিয়ন ও আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেটের সঙ্গে, যদিও সেইসঙ্গে কর্মবীরদের চেয়ে চিন্তানায়কদের প্রতি তাঁর নিজের পক্ষপাতের কথাও জানাতে ভুললেন না। তিনি বললেন, 'আমি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না কারণ আমি আর কিছুই দেখিনি।' সত্যি বলতে কি, ফ্যাসিবাদের ভণ্ডামি ছাড়া তাঁকে কিছুই দেখার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

আমাদের খারাপ লাগছিল, কারণ ফ্যাসিবাদী প্রতারকেরা ঠিক এটাই চেয়েছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়ে কিছু তাত্ত্বিক আপত্তি সত্ত্বেও এরকম একটি লেখা ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে তুলতে একেবারেই সহায়ক ছিল না।

দ্যুয়ামেল সেটা ধরতে পেরেছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথকে তাঁর হতাশার কথা স্পষ্ট ভাষায় শুনিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। দ্যুয়ামেল সোজা লোক, কিন্তু সূক্ষ্মতার বড় অভাব। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার চেষ্টাই করলেন না, এবং রবীন্দ্র-মানসিকতা সম্পর্কে (অথবা যাকে তিনি সাত তাড়াতাড়ি রবীন্দ্র-মানসিকতা বলে ধরে নিলেন) এমন এক অনমনীয় কঠোরতা দেখালেন যা তাঁর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। আমার খারাপ লাগছিল কিন্তু দু'পক্ষের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে দেওয়ার পক্ষে তখন খুব বেশি দেরী হয়ে গেছে। আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটা কথাই আদায় করে নিতে পারলাম— সেটা হল লেখাটি প্রকাশ করার আগে ইতালির কয়েকজন নির্যাতিত ও নির্বাসিত প্রতিনিধির সঙ্গে আমরা দেখা করব। আমি এরকম বেশ কয়েকজনকে চিঠি লিখেছি বা তার করেছি, যাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুস্‌সোলিনি-বিরোধী প্রবল ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সালভেমিনি।[১১] এখন তিনি লন্ডন-নিবাসী, *Manchester Guardian*-য়ে লেখেন। আশা করছি তিনি কবির সঙ্গে দেখা করবেন।

বুঝতে পারছ কবির কথায় দ্যুয়ামেলের প্রতিক্রিয়া তাঁর চরিত্রের সঙ্গে কীরকম খাপ খেয়ে যাচ্ছে! দ্যুয়ামেলের মতামত আমার চেয়ে অনেক কম উদার, অথচ তাঁকেই ফ্রান্সের সুস্থ, অনুভূতিশীল পরিমিতিবোধের প্রতিনিধি ঠাহর করা হয়।— কিন্তু এসব থেকে খুবই পরিষ্কার, কবির ওই ইতালি-ভ্রমণ কতখানি বিরক্তির উদ্রেক করেছে!

যারা এর বন্দোবস্ত করেছে, বা এমন ব্যাপার ঘটতে দিয়েছে, তারা জাহান্নামে যাক!

আমি তাঁর সাথে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি, যদিও তাতে একটি বিকেল ও সন্ধ্যার বেশি সময় লাগেনি। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটা খুবই কষ্টের যে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের মিল হল না!— অথচ ঈশ্বর জানেন তাঁর প্রতি কতখানি ভালবাসা আমার! তাঁকে অসম্মান করার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না! আমি তাঁকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি, তিনি

তিনি বলেই আমি তাঁকে ভালবাসি!— দোষ তাদেরই যারা ইতালি-ভ্রমণের সময় তাঁকে ব্যবহার করে সেটার একটা অন্য চেহারা দিয়েছে! এবং আমার কোনো সন্দেহই নেই যে এত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও কবি তা বানচাল করতে সমর্থ হবেন, এবং সঠিক সময়ে মহৎ ও অজেয় সত্যকে প্রকাশ করতে উঠে দাঁড়াবেন।

রাজনীতির কথা বাদ দিলে, কবির সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা ছিল স্নিগ্ধ ও মনোরম! আমার কেবল একটাই অনুতাপ রয়ে গেল: ইংরেজি বোঝা বা বলতে না পারার দোষে ওঁর সঙ্গে একা মুখোমুখি বসা হল না। মাদলেন আমাদের যত ঘনিষ্ঠ ও যত বিচক্ষণই হোক না কেন, কিছু কিছু কথা তো কেবল দু'জন মানুষের মধ্যেই বলা যায়!

আমাদের এখানে মধ্যাহ্নভোজন করতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে বাগানে গিয়ে ছবি তুললাম। ঐ চমৎকার ছবিগুলির একটি আমি তোমায় পাঠাব।— আমরা তাঁর সঙ্গে গাড়িতে একটা চক্কর দিয়ে এলাম তেরিতে, মঁরো আর ভ্যভে পর্যন্ত— সাভোয়ার উপকূল অবধি নৌকো চড়ে ঘুরলাম আমরা।— গ্লুক আর বেটোফেন থেকে কয়েক পৃষ্ঠা তাঁকে বাজিয়ে শোনালাম আমি (গ্লুকের[১২] 'অর্ফিয়াস' শুনে তিনি তার কদর করতে পারলেন)। জেনিভার একদল তরুণ-তরুণী কবিকে গেয়ে শোনাল ষোড়শ শতকের কোরাস, যা তিনি বুঝতে পারছেন বলে মনে হল।— বেশ কিছু দর্শনপ্রার্থী এসেছিলেন তাঁর কাছে— স্যর্ জেম্‌স্ ফ্রেজার,[১৩] অধ্যাপক ফেরিয়ের,[১৪] শার্ল বোদুয়্যাঁ[১৫] (রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা তাঁর একটি সুন্দর নাটক পড়া হল) এবং অর্ধেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ওগ্যুস্ত ফোরেল,[১৬] যার আসাটা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল।— তাছাড়া, আমরা খেয়াল রেখেছিলাম যাতে তিনি যথেষ্ট বিশ্রাম পান। খবরের কাগজগুলোকে জানানোই হয়নি, যেদিন তিনি রওনা হয়ে গেলেন সেদিনই সবেমাত্র তারা ব্যাপারটা আঁচ করতে শুরু করেছিল।

দুর্ভাগ্যবশত, ভালমঁ-র প্রধান চিকিৎসক আমার সেই অসাধারণ ডাক্তার-বন্ধু ডাঃ এমেরলি[১৭]— যাঁর ওপর রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসার জন্য আমি এতখানি নির্ভর করেছিলাম, যিনি গত দু বছর ধরে তাঁর ভার নেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছনোর দু সপ্তাহ আগে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে শেষ পর্যন্ত যে ডাক্তারদের ডাকতে হল তাঁরা বেশ ভাল, কিন্তু তাঁদের ডাঃ এমেরলির কর্তৃত্বময়, স্নিগ্ধ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব ছিল না, যার

প্রয়োজন ছিল কবির। তাঁরা তাঁকে কীভাবে নির্দেশ দেবেন ঠাহর করে উঠতে পারছিলেন না, তাঁকে উৎসাহিত করতে পারলেন না আরো কিছুদিন থেকে যেতে। যাই হোক অন্তত তাঁদের রোগ নির্ণয়টা ঠিক হয়েছিল। সন্দেহ নেই, আর একটু যত্নআত্তিতে থাকলে এরকম সুন্দর আবহাওয়ায় তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়, কাজের তৃষ্ণা তাঁকে টেনে নিয়ে গেল।

প্রতিমা ঠা. কে ভীষণ ভাল লেগেছে আমাদের। এই তরুণীর ব্যবহার ও বুদ্ধিতে বেশ একটা নিজস্বতা আছে, এক বিষণ্ণ গাম্ভীর্য, যা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। তরুণী রাণী মহলানবিশও সুন্দরী— তারুণ্যের পূর্ণতা ও আনন্দে ভরা। খুব তাড়াতাড়ি আমার বোনের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল তাঁর, বাগান থেকে তাঁর মিষ্টি হাসির শব্দ শোনা যেত।— মনে হল রবীন্দ্রনাথের ছেলে[১৮] খুবই পিতৃভক্ত, আড়ালে আড়ালে থাকতে চায়, একটু বেশি রকমই যেন। শান্ত মানুষটি, একটু দুঃখই হয় তাকে বাবার ছায়ায় হারিয়ে যেতে দেখে।— কিন্তু একথা মোটেই মহলানবিশের ক্ষেত্রে খাটে না। ওই বিশাল প্রতিভার প্রভাবেও সে কিছুতেই তার ব্যক্তিত্ব খোয়াতে রাজী নয়। তার ধীশক্তি রয়েছে, সে কাজের মানুষ, সে কথা বলে, প্রশ্ন করে। অবশ্য আমায় বিশ্বভারতীর সাংগঠনিক দিকটি ভাল করে বুঝিয়ে বলার আগেই তাকে চলে যেতে হল, বলা হল না ঠিক কী ধরনের সাহায্য সে আমার ও অন্যান্য ইউরোপীয় বন্ধুদের কাছে প্রত্যাশা করে... যদিও সেটাই ছিল আমাদের সাক্ষাৎকারের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। সে রবীন্দ্রনাথের সরকারি ইতালি সফরের বিরোধী ছিল এবং আমার মনে হয়, ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিচার আদায় করতে সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

মহলানবিশ ও রথীন্দ্রনাথ রণিগারের[১৯] সঙ্গেও আলোচনা করে। আমি তাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। আশা করছি এর থেকে কিছু একটা হবে যদিও ঐ ফরাসি-জার্মান বই বিক্রেতার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

কবি খুব স্নেহভরে মাদলেনকে বেশ কয়েকদিন সকালে তাঁর ওখানে আসতে বলেছিলেন বাংলা শেখানোর জন্যে— আর কবিতা পড়ে শোনানোর জন্যে। একদিন কবিতা পড়ার সময় মার্সেল মার্তিনে সেখানে উপস্থিত ছিল। সে একটি শব্দও বুঝতে পারেনি বটে, কিন্তু ছন্দ ও ধ্বনিমাধুর্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

'কবি'— যতই রবীন্দ্রনাথকে চেনা যায় ততই বোঝা যায় কীভাবে এই অভিধাটি তাঁর সারসত্তাকে পরিস্ফুট করে। ঐ ঐশ্বর্যবান আলোকময় ব্যক্তিত্বের মধ্যে কবিরই প্রাধান্য। সেটাই তাঁর ব্যক্তিত্বের ভিত্তিভূমি, মনের অন্যান্য সমস্ত গুণই সেখানে গৌণ হয়ে যায়। আর তিনি সেটা পছন্দ করুন বা নাই করুন, তাঁর বাকি সমস্ত ক্রিয়াকর্মই তাঁর মনের এই দিকটির দ্বারা নির্ধারিত হয়। সেইখানে তিনি রাজা— সর্বকালের মহত্তম কবিদের একজন।

আমরা তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসি, আমরা তাঁকে সুখী করতে চেয়েছি। তাঁর প্রাগ-যাত্রা সম্পর্কে আমি রাষ্ট্রপতি মাদারিককে লিখেছি। আশা করি রবীন্দ্রনাথকে সরকারি অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করা হবে। আমি চাই ইউরোপের দেশনেতাদের মধ্যে নৈতিকভাবে সবচেয়ে বলশালী ব্যক্তিত্বটির সাথে কবির পরিচয় হোক।

কবির মনোরম ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশের মানুষকে কতখানি মুগ্ধ করেছে তা আর তোমায় বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না। হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে নেমে আসতে দেখে একজন মহিলা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন: 'ওই যে পরম কল্যাণময় ঈশ্বর এসে পৌঁছেছেন!' এ আমার নিজে চোখে দেখা।

কল্যাণময় তো তিনি নিশ্চয়ই, গভীরভাবে! এই কল্যাণময়তা তাঁর সর্বসত্তা থেকে উৎসারিত হচ্ছে।

তবু আমি বলব, প্রিয় কালিদাস নাগ, তোমার মতো আরো কয়েকজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে থাকলে ভাল হত। শুধু ভক্তিভাব (তার অভাব ছিল না) দেখানোর জন্য নয়, ব্যবহারিক ব্যাপারে তাঁকে সজাগ ও দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করার জন্যও! কারণ আমার মনে হয়েছে এ ব্যাপারটাকে খানিকটা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর সময় ও শক্তির প্রচুর অপব্যয় করে— বিপদসংকুল পৃথিবী নিজস্ব স্বার্থে এই সুযোগগুলিকে কীভাবে কাজে লাগায় সেকথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

সুইজারল্যান্ডে আমাদের এই ছোট্ট বাড়িটা ঐ বিরাট বন্ধুটিকে কয়েকদিনের জন্য পেয়ে ধন্য হয়েছে। তিনি চলে যাওয়ামাত্র আকাশ কালো হয়ে এল, ভিলন্যভে আছড়ে পড়ল ঝড়, আর সেই থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। তবু বুকের মধ্যে ওই আলো আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি।

তোমার কথা মনে পড়েছে আমাদের। আশা করি আমাদেব পোস্টকার্ড পেয়েছ। বায়রন হোটেলে রবীন্দ্রনাথের ঘরে বসে ওই কার্ডে সই করেছিলাম আমরা— চল্লিশ বছর আগে আমার ছেলেবেলায় ওই ঘরেই বাস করতেন ভিক্তর য়্যুগো।[২০]

তুমি ও শান্তা আমাদের স্নেহাশিস নিও।

তোমার বন্ধু
রম্যাঁ রলাঁ

পুঃ জুরিখ থেকে মহলানবিশ লিখছে যে তেমন কিছু ক্লান্তি ছাড়াই রবীন্দ্রনাথ সেখানে পৌঁছতে পেরেছেন। তাঁরা ভিয়েনা রওনা হচ্ছেন, মধ্যে মিউনিখে এক রাত্তির থাকবেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. মাতৃভূমি ফ্রান্স ছেড়ে ১৯২২ সালের মে মাস থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডের ভিলন্যভে স্বেচ্ছানির্বাসিত ছিলেন রলাঁ।
২. 'আমরা' অর্থে রলাঁ ও তাঁর চেয়ে ছ'-বছরের ছোট বোন মাদলেন রলাঁ (জ. ১৮৭২)— ইংরেজি ও কিছুটা বাংলা জানার সুবাদে ইনি দীর্ঘদিন (সম্ভবত ১৯৩৪ সালে মারিয়া কুদাশেভার সঙ্গে রলাঁর দ্বিতীয় বিবাহের আগে পর্যন্ত) দোভাষীর কাজ করেন। কালিদাস নাগের সঙ্গে এঁর পত্রাবলি আজও অপ্রকাশিত।
৩. 'গীতাঞ্জলি'র আঁদ্রে জিদ-কৃত ফরাসি অনুবাদ পড়েই অবশ্য রলাঁ রবীন্দ্র-কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু অনুবাদে যে মূলের প্রায় কিছুই ফোটেনি সেটা বোঝার ক্ষমতা তাঁর ছিল।
৪. এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। রলাঁ তাঁকে প্রথম চিঠি লেখেন ১৯১৯ সালের ১০ এপ্রিল। ২৬ জুন *L'Humanité* পত্রিকায় প্রকাশিত মুক্তমনের ঘোষণাপত্রে (Déclaration de l'indépendance de l'Esprit) দুজনে সই করেন। পরে ১৯২১ সালে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ নিজে রলাঁর মোঁপারনাসের বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।
৫. জিওভান্নো আমেনদোলা (১৮৮৬-১৯২৬): ইতালীয় দার্শনিক, সমালোচক ও সাংবাদিক। সম্মানিত 'ডেমোক্র্যাটিক লিবারাল', ফ্যাসিবাদীদের হাতে বারবার নিগৃহীত হন।

৬. জিয়াকোমো মাত্তেয়ত্তি (১৮৮৫-১৯২৪): ইতালীয় রাজনীতিবিদ, ১৯২৪ সালে সমাজবাদী, দলের মুখ্যসচিব হন। ওই বছর ৩০ মে পার্লামেন্টে ফ্যাসিবাদীদের নানা অপরাধমূলক ক্রিয়াকর্মের নিন্দে করার দশ দিনের মধ্যে তাদের হাতে নিহত হন।

৭. কার্লো ফরমিকি (১৮৭১-১৯৪৩): ইতালীয় ভারততত্ত্ববিদ, রয়াল অ্যাকাডেমির সদস্য, রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ১৯২৫-২৬ সালে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ও মুস্‌সোলিনির সাক্ষাৎকারের সময় দোভাষীর কাজ করেন।

৮. গাল্লারাতি তোমাস্যো স্কত্তি (১৮৭৮-?): ইতালীয় লিবারাল রাজনীতিবিদ ও লেখক। ফ্যাসিবাদবিরোধী, কিন্তু কখনো খোলাখুলি সংঘর্ষে আসেননি।

৯. বেনেদিত্তো ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২): ইতালীয় দার্শনিক, সমালোচক। প্রথমে সমর্থন করলেও পরে ফ্যাসিবাদবিরোধী হয়ে যান। ক্রোচের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কী কথা হয়েছিল তা আজও রহস্যে ঢাকা। মারি প্রেয়ারের সাম্প্রতিক গ্রন্থ *In Search of an Entente: India and Italy* (১৯৯৪) থেকে জানা যাচ্ছে যে ক্রোচে ইঙ্গিতে ফ্যাসিবাদের সমালোচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ তা ধরতে পারেননি।

১০. জর্জ দ্যুয়ামেল (১৮৮৪-১৯৬৬): ফরাসি কবি ও মানবতাবাদী।

১১. গায়েতানো সালভেমিনি (১৮৭৩-১৯৪৭): ইতালীয় অধ্যাপক, ঐতিহাসিক ও রাজনীতি-বিষয়ক লেখক। মুস্‌সোলিনির নানা অপরাধ ফাঁস করে দেন। ১৯২১ সালে পার্লামেন্টের সদস্য হন, ১৯২৫ সালে ইতালি ছাড়তে বাধ্য হন। ফ্রান্সে বসে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৯৪৭ সালের আগে দেশে ফিরতে পারেননি।

১২. ক্রিস্টোফার গ্লুক (১৭১১-৮৭): জার্মান সংগীতস্রষ্টা।

১৩. জেম্‌স ফ্রেজার (১৮৫৪-১৯৪১): আধুনিক নৃতত্ত্বের অন্যতম জনক। *The Golden Bough* (১৮৯০-১৯১৫)-এর লেখক।

১৪. এঁর সম্পর্কে কোনো তথ্য পাইনি।

১৫. শার্ল বোদুয়্যাঁ (১৮৯৩-১৯৬৩): সুইস সাহিত্যিক।

১৬. ওগুস্ত ফোরেল (১৮৪৮-১৯৩১): সুইস চিকিৎসক ও প্রকৃতিপ্রেমিক। বিখ্যাত গ্রন্থ: *The Socialist World of Ants compared to that of Men* (1921-23).

১৭. ডাঃ এমেরলি: বিশের দশকে ভালমঁ-স্যুর তেরিতে-তে চিকিৎসক।

১৮. রবীন্দ্র-পুত্র সম্পর্কে রলাঁর আস্থা আরো কমবে। দ্র. *The Tower and the Sea: Romain Rolland-Kalidas Nag Correspondence*, Papyrus, 1996, 2004.

১৯. এমিল রনিগার (১৮৮৩-১৯৫৮): লেখক, সংগীতজ্ঞ, শিল্পী, প্রকাশক। রলাঁর মহৎ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। তাঁর অনুপ্রেরণায় Weltbibliothek (বিশ্বগ্রন্থাগার) গড়ার কথা ভেবেছিলেন।

২০. এই চমকপ্রদ তথ্য 'ভারতবর্ষ' দিনপঞ্জিতেও আছে। অনেক পরে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ তারিখে কালিদাস নাগকে লেখা এক চিঠিতে রলাঁ ওই বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে বলে দুঃখ করেছেন। দ্র. *The Tower and the Sea* (পৃ. ২৮৫)।

১৯৯৬

পরিশিষ্ট ২

দিনান্তের চিঠি

ভিলা অলগা, ভিলন্যভ
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

আমার বন্ধু, আমার ভাই কালিদাস,

বোন মাদ্‌লেন আমাকে কলম্বো থেকে লেখা তোমার চিঠিখানি পড়ে শুনিয়েছে, সেটি আমাদের মনকে স্পর্শ করল। আমরা জানতামই না তুমি এত অসুস্থ, আমাদের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে প্রার্থনা করি যে তোমার বিপদ কেটে যাক। মনে রেখো, এই অসুস্থতার সময় যখন প্রতি মুহূর্তে তুমি জীবনের জন্য সংগ্রাম করতে ব্যস্ত, আমরা মনে মনে তোমার পাশে আছি, শুভেচ্ছা-স্নিগ্ধ ভাইবোনের মতো।

শেষ যাত্রার প্রস্তুতির জন্য তোমার চেয়ে অনেক বেশি কারণ রয়েছে আমাদের। আমার বয়স বাহাত্তর, আদ্যিকালের শরীরে দু'-তিনটে কঠিন ব্যাধি, যেগুলি আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তোমায় যখন এই চিঠি লিখছি, তখনও তিন সপ্তাহ ধরে আমি বিছানায় বন্দি, ব্রঙ্কাইটিস ও প্লুরিসি এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। বহু বছর ধরে একদিনের জন্যও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকিনি, তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি যেন একটি দিনও নষ্ট না হয়! আমার কাজ কখনও থেমে থাকে না।

বেটোফেন সম্পর্কে আমার সাম্প্রতিক বইটির জন্য অপেক্ষা করতে করতে (বছর শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে যাবে, গ্যালি-প্রুফ দেখে দিয়েছি) আমি শুরু করেছি রবেসপিয়ের, যার কথা বহুদিন ধরে ভেবেছি আমি, আমার ফরাসি-বিপ্লব নাট্যমালার প্রধান নাটক হিসেবে। প্রতি পদক্ষেপে আমি পুনর্নির্মাণ করছি সেইসব ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতকে যা আজও এত জীবন্ত—সেই একই সমস্যা, একই আবেগ, একই অবধারিত ভবিতব্য যা আজ ইউরোপ ও সোভিয়েত রাশিয়াকে রক্তে ভিজিয়ে দিচ্ছে। মানবতার চরম অগ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে দেড়শো বছর আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই মহান লড়াই যারা শুরু করেছিলেন, তাঁরা বুঝেছিলেন তাঁদের একাকিত্বের কথা। যিনি মাঝে মাঝে আশ্চর্য সব উক্তি করেছেন, সেই স্যাঁ-জ্যুস্ত্ নিজের সম্পর্কে বলেছেন:

'নিজেকে পৃথিবীর থেকে, নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তবেই ভবিষ্যতের গর্ভে নোঙর ফেলা যায়...'।

আমরা স্যাঁ-জ্যুস্ত ও তাঁর সহযোগীদের সেই 'ভবিষ্যতে' পৌঁছোতে পারিনি আজও। আর আমরাও তো নোঙর ফেলতে চাই সুদূর কোনও এক শতাব্দীতে।

তুমি লিখেছ তোমার দান্তের কথাটা মনে ধরেছে। জিজ্ঞেস করেছ ওটা ডিভাইন কমেডি থেকে নিয়েছি কি না... না, ওটা *De Vulgari eloquentia*, ১-৬ থেকে নেওয়া।* দুর্ভাগ্যবশত, আমি পুরো স্তবকটা খুঁজে পাচ্ছি না, হাতের কাছে দান্তের রচনাবলি নেই। কাছে-পিঠে তেমন কোনও বড় লাইব্রেরিও নেই। তবে আমি বাক্যটা ডায়েরিতে টুকে রেখেছি, পারলে তুমি সেটাকে সম্পূর্ণ করে নিও।

সুইজারল্যান্ডের এই আশ্রম আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ফ্যাসিবাদী প্রতিবেশীদের মাঝে কোণঠাসা আজকের সুইজারল্যান্ড বিদেশ থেকে আসা আমার অধিকাংশ চিঠিপত্র আত্মসাৎ করছে, আমাকে আমার প্রাপ্য সৌজন্যটুকু পর্যন্ত না দেখিয়ে, স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিয়ে জীবনধারণ করা এক মুক্তচেতা লেখকের মৌলিক অধিকারকে গ্রাহ্য না করে। কিন্তু আমি যে কিছুতেই আমার দেখা ও শোনাকে আচ্ছন্ন হতে দেব না!—আগামী বছরই আমি আবার ফ্রান্সে ফিরে যাচ্ছি। আজই আমার স্ত্রী ফ্রান্সের ভেজ্‌লেতে আমার হয়ে একটি বাড়ি কেনার ব্যবস্থাপনা করছেন (ব্রঙ্কাইটিসের জন্য আমার পক্ষে আর যাতায়াত করা সম্ভব হয় না)। তুমি নিশ্চয়ই আমার দেশ নিভের্‌নের ওই ছোট্ট শহরটার কথা শুনেছ। দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়ের ওপর মুকুটের মতো সেই বিরাট বেসিলিকা, যেখান থেকে সেন্ট বার্নার্ড তাঁর দ্বিতীয় ক্রুসেড শুরু করেছিলেন। সেখানে চমৎকার একটা বাড়ি পেয়েছি আমরা, যার সংলগ্ন বিরাট বাগানটি দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে নেমে গেছে। গাড়ি করে পনেরো মিনিটে ব্রেভ্-এর যাজকের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়, আধ ঘণ্টার মধ্যে ক্লামসির কোলা ব্রন্যতে। কাজেই বেশি খোঁজাখুঁজি না করেই আমি আমার স্বদেশে ফিরে যাচ্ছি, সেখানেই বাঁধব আমার সর্বশেষ আস্তানা।—তাছাড়া, ভিলা অলগাকে ১৯৪০-এর অক্টোবর পর্যন্ত ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি, প্রতি বছর সেখানে কয়েক মাসের জন্য আসতে চাই। তবে সামনের বছর মে-জুন মাস

থেকে আমার ঠিকানা হবে ভেজ্‌লে। বোনের জন্যও আমি একটি বাড়ি কিনতে চাই, যদিও আমার বাড়িতেও তার জন্য নির্দিষ্ট একটি ঘর থাকবে। আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবনকে ঘিরে যে বিপদ-সংকুলতা (বহির্জগতের ভয়াবহ কাণ্ডগুলোর কথা নাই বা বললাম), তা-সত্ত্বেও আমি আশা রাখব ভাই কালিদাস, একদিন না একদিন আবার আমাদের দেখা হবে ভেজ্‌লেতে আমার বাড়িতে।

সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমরা তোমাকে আশীর্বাদ করি। তোমার ও তোমার স্ত্রী-কন্যার জন্য রইল আমাদের স্নেহার্দ্র বন্ধুত্ব।

রম্যাঁ রলাঁ

গত ক-মাস ধরে খবরের কাগজে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নানা আশঙ্কাজনক খবর পাই। আশা করি, সেসব সত্যি নয়, অথবা ভীষণভাবে বাড়িয়ে বলা। ওই মহান বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে বোলো, আমার দীর্ঘ নীরবতার অর্থ কোনওমতেই এই নয় যে, আমি তাঁকে ভুলে গেছি। ঠিক তার উল্টো। তাঁর স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে খোদাই হয়ে আছে। হোটেল বায়রনে আমাদের প্রতিবেশী হয়ে যে-ক'টা দিন তিনি কাটিয়ে গিয়েছিলেন তার ছবি মনে আজও জ্বলজ্বল করছে। (সেই সুন্দর হোটেলটি আগেই পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত গত গ্রীষ্মে তা মাটিতে মিশে গেছে।)—কাগজে ওঁর বিষয়ে যা বেরোয় সবই আমরা খুব মন দিয়ে পড়ি। আর আজও আমি নিজেকে কবির খুব কাছের লোক বলে মনে করি যখন শুনতে পাই তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর নেতা হিসেবে তাঁর অধিকার ও দায়িত্বকে কাঁধে তুলে নিচ্ছেন, কারণ তিনিই পারেন তাঁদের সত্যি করে রক্ষা করতে ও পথ দেখাতে!

১৯৯৬

---

* *De Vulgari eloquentia*:

এখানে এইসব লোকের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে যারা 'অন্ধের মতো যে জিনিসগুলি বাস্তবিকপক্ষে সামনে আছে তাই পিছনে আছে মনে করে পথ চলে।' দ্র. এক্ষণ, দান্তে সপ্তম জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৬৫।

অন্নদাশংকর ও রম্যাঁ রলাঁ

যখন চতুর্দিকে ভিতর-বাইরের ভাঙচুরের সামনে 'ভয়ে (আমাদের) কান বধির হয়ে আছে। অন্ধ হয়ে আছে চোখ', 'যখন আমরা হলুদ হতে থাকা শ্বেতকরোটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি স্থির,' তখন অন্নদাশংকর রায়ের মতো ক্রান্তদর্শী জীবনজিজ্ঞাসুর দ্বারপ্রান্তে যাব না তো কার কাছে যাব?

অন্নদাশংকরের চিন্তার ব্যাপ্তিকে বিশ্লেষণ করার ধৃষ্টতা আমি দেখাব না। আমি শুধু তাঁর প্রসঙ্গে আরেকজন জীবনদ্রষ্টার কথা বলব যাঁকে তিনি একজন গুরু ও পথপ্রদর্শক বলে মেনেছিলেন, যাঁর কথা না বললে অন্নদাশংকরের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে আমার ধারণা: আমি রম্যাঁ রলাঁর কথা ভাবছি। যাঁর সঙ্গে অন্নদাশংকরের মানবতাবাদ ও যুগজিজ্ঞাসার এত মিল।

প্রথম কৈশোরে বাবার মধ্যবিত্ত আলমারিতে কঠিন কঠিন ইংরেজি বইয়ের পাশে তিনটি বাংলা বই আবিষ্কার করেছিলাম। সেগুলি হল অন্নদাশংকরের 'পথে প্রবাসে', 'তারুণ্য' আর 'বিনুর বই'। 'তারুণ্য'টা ভাল বুঝিনি, 'বিনুর বই'-টাই বারবার পড়তাম। সেখানেই আলাদা করে রম্যাঁ রলাঁর নাম করেছিল বিনু একটি অধ্যায়ে আর সেই অধ্যায়ের নাম দিয়েছিল 'জীবনবেদ'। সেখানে জীবন ও সৃজনদর্শন এক বাণবেঁধার বিন্দুতে এসে মিশেছিল। সে লিখেছিল:

> টলস্টয় রাশিয়াকে তাঁর এপিক উপন্যাস 'সমর ও শান্তি' দান করেছেন। রম্যাঁ রলাঁ পশ্চিম ইউরোপকে দিয়েছেন 'জন ক্রিস্টোফার'। এখানিও এপিক উপন্যাস, সঙ্গীতকার বেঠোফেন এর নায়কের মডেল। বিনুর জীবনে 'জন ক্রিস্টোফার' পড়া এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এপিকের লক্ষণ ওতে আছে কি নেই, অত তর্কে কাজ কী? ও যে আধুনিক ইউরোপের, পশ্চিম ইউরোপের জীবনবেদ। ওর নায়ক যুদ্ধবিগ্রহের বীর নন, জীবনযাপনের বীর। কেমন করে বাঁচতে হয়, বাঁচা উচিত, বেঠোফেনের জীবন তার নিঃশব্দ জবাব। বিনু খুঁজছিল জীবনযাপনের বিভিন্ন ধারা। এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারা তাকে অনুপ্রাণিত করল। কিছু কালের জন্য এ বই হল তার জীবনবেদ। সেও যদি এমন একখানি বই লিখে যেতে পারত!

পরের অধ্যায়ের শুরুতেও সে লিখেছিল নিজের কথা: 'যারা সংগ্রামবিমুখ, যারা অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে, যারা প্রাণকে মূল্য দেয় সত্যের চেয়ে বেশি, তাদের ক্ষমা করা বিনুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল 'জন ক্রিস্টোফার' পড়ার পর থেকে।'

এর পর দ্বন্দ্ব বাঁধল জীবনটা যার চোখে লীলা সেই দ্বিতীয় বিনুর সঙ্গে। সেই দোটানা, অন্নদাশংকর লিখছেন, এক দিনও বিরতি পায়নি। বিনু যখন সাহিত্যের সত্যের কথা বলে তখন তো সে ভাবনায় টলস্টয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্পষ্ট ভাবে রলাঁর যুগজিজ্ঞাসাও অন্তঃস্যূত হয়ে যায়। সমুদ্রকে ভালবাসার কথা বলতে বলতে, যে সমুদ্রকে রূপকার্থে ব্যবহৃত বলে মনে হয়েছে, সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গে বিনু লিখেছিল, 'তার জীবনের উপর স্বাধীনতার ছাপ আঁকা হয়ে রইল সিন্ধুর নীল রঙে।' রলাঁকে বাদ দিলে সমুদ্রযাত্রা ও স্বাধীনতার মহাপরিসর সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না অন্নদাশংকরের চিন্তা ও দর্শনে।

সুইজারল্যান্ডের ভিলন্যভে জেনিভা হ্রদের পাশে রলাঁর কুটির ভিলা অলগায় গিয়ে প্রায় অনিবার্য সাক্ষাতের যে বর্ণনা 'পথে প্রবাসে'-তে আছে, সেটি না থাকলে অন্নদাশংকরের পাঠকের হাতছাড়া হয়ে থাকত তাঁর আপসহীন দৃঢ় ও স্বচ্ছ মানবমুখী প্রত্যয়কে অনুধাবন করে নেওয়ার একটি অপরিহার্য চাবি। যেন রলাঁকে না বুঝলে অন্নদাশংকরকে পুরোপুরি বোঝা যাবে না! অন্নদাশংকর লিখেছেন: 'রলাঁর সাক্ষাৎ পাবার পরমুহূর্ত পর্যন্ত মনেই জাগেনি যে তাঁর ঘরের অন্তর বাহির তাঁর নিজের অন্তর বাহিরের প্রতিরূপ।' স্টেফান ৎসোয়াইগ রচিত 'রম্যাঁ রলাঁ: ডের মান উন্ড ডাস ভের্ক' গ্রন্থে রলাঁর মুখচ্ছবি অথবা পিয়ের জাঁ-জুভের লেখা রলাঁ-জীবনীতে তাঁর বর্ণনা পড়েছি যাঁরা, তারা অবাক হয়ে দেখি অন্নদাশংকর-কৃত রলাঁ-ভাস্কর্য:

দীর্ঘদেহ ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষটি, মুখখানি লাজুকের মতো ঈষৎ নত, মুখের গড়ন উল্টো করে ধরা পেয়ারা ফলের মতো চওড়া সরু উঁচু নীচু। প্রশস্ত, উন্নত ললাট, সুদীর্ঘ শাণিত নাসা, ক্ষুধিত শীর্ণ কপোল, উদগ্র সংকীর্ণ চিবুক। চোখদুটিতে কতকালের ক্লান্তি, হরিণশিশুর নিরীহতা। ওষ্ঠে গান্ধীর চেয়েও

সরল হাসি, বেদনায় পাণ্ডুর।... এক হাতে দারিদ্রের সঙ্গে অন্য হাতে অসত্যের সঙ্গে জীবনময় যুদ্ধ করে এসেছেন, তবু ক্ষান্তি নেই। সাহিত্য ও সংগীতের কথা উঠল। এতক্ষণ সহজভাবে কথা বলছিলেন...। যেই ভাবী যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠল অমনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন রাজা লীয়ারের মতো। নির্বাণোন্মুখ শিখার মতো স্তিমিত নেত্র আরও জ্বলে উঠল। দক্ষিণ হস্ত আবেগে উঠতে পড়তে লাগল, বেগময়ী ভাষার সঙ্গে তাল রেখে!...

প্রতীতির সহিত বললেন, নেশনরা যতদিন না ঠেকে শিখছে যে এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি, যুদ্ধ ততদিন থাকবেই। কাতর স্বরে বললেন, মানুষের ইতিহাসে যুদ্ধের দেখছি অবসান হল না!...উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলুন! যুদ্ধের প্রতিষেধ—শিক্ষা।

শিক্ষা সম্বন্ধে আর্টিস্টের কর্তব্য নিয়ে কথা উঠল। আর্টিস্ট কি কেবল চিরকালের সৌন্দর্য সৃষ্টি নিয়েই থাকবে, না স্বকালের সমস্যা— সমাধানেও সাহায্য করবে? বললেন, দুই-ই করবে। সকল যুগের জন্য কিছু, নিজের যুগের জন্য কিছু। মানুষের মধ্যে একাধিক আত্মা আছে—কাজ আর্টের পূজা, কাজ সমাজের সেবা। যে-মানুষ আর্টিস্ট সে-মানুষ কেবল আর্ট চর্চা করে ক্ষান্ত হবে না, সে ভালর সপক্ষে ও মন্দের বিপক্ষে প্রোপাগান্ডা করবে, ভলতেয়ার ও জোলার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালাবে।'

অন্নদাশংকর রায় 'পথে প্রবাসে'তে স্বীকার করেছেন, তিনি সম্পূর্ণ সায় দেননি। আমরা বুঝি দ্বিতীয় বিনু, চিরায়ত ও আবহমানের পূজারি বিনু আপত্তি করছিল। কিন্তু এও জানি যে আপসহীন মানবভাবনার যে জমির ওপর দাঁড়িয়েছিলেন ভলতের ও ভিক্তর য়্যুগোর উত্তরসূরি রম্যাঁ রলাঁ, অন্নদাশংকর নিজেও সেই পথে গিয়েছিলেন অনেক দূর, যতক্ষণ না দ্বিতীয় বিনু তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। বিবেকী শিল্পীর অভিধার যোগ্যতা তাঁর মতো কজন বাঙালি লেখকের আছে?

বাইরের চেহারা নিয়ে আশাভঙ্গ সত্ত্বেও প্রথম দর্শনের পর রলাঁর প্রতি ভালবাসার কথা লিখেছিলেন তিনি : 'ভাল লাগা ভালবাসার মধ্যে কোনখানে যে একটি সূক্ষ্ম রেখা আছে চিন্তা করে তার নিরিখ পাইনে, বোধ করে তার অস্তিত্ব জানি। এক একটা বিরাট পার্সন্যালিটির সংস্পর্শে এলে এই বেধ ক্রিয়াটি একান্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

১৯৫৩ সালে অন্নদাশংকর লেখেন: 'আমার যখন সতেরো কি আঠেরো বছর বয়স তখন আমি আবিষ্কার করি যে আমি অন্তর থেকে নৈরাজ্যবাদী। ... আমি অন্তরের প্রত্যয় থেকে হলুম অহিংস নৈরাজ্যবাদী।'

চমকে উঠতে হয়: এতো রম্যাঁ রলাঁর জবানবন্দি। তাঁর আদর্শের গভীর সাযুজ্য টলস্টয় ও গান্ধীর সঙ্গে, কিন্তু রলাঁর সঙ্গে তাঁর মানসিকতার মিল। তা হলে মতভেদ কোথায়? অন্নদাশংকরের ভাষায়, 'আমার কাছে আর্ট হচ্ছে নিজেই নিজের লক্ষ্য। মহত্তর লক্ষ্যের উপলক্ষ্য হতে হলে আর্ট তার আত্মাকে হারায়। অহিংস নৈরাজ্যবাদী হিসাবে আমি আমার আত্মাকে হারাতে রাজি নই।' এখানে রলাঁর সঙ্গে মতভেদ সত্ত্বেও অন্নদাশংকরের ডিসকোর্স রলাঁর থেকে প্রধানত অভিন্ন থেকেছে। অন্নদাশংকরের 'আমি কী বিশ্বাস করি ও করি না' তো রলাঁরই অগ্নিশুদ্ধ বচনের ঘরানা। 'সত্যাসত্য' সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

টলস্টয়ের সঙ্গে আরেকটি মতভেদ: 'টলস্টয় বা গাঁধী কেউ বিশ্বাস করতেন না আধুনিক সভ্যতায়। আমি বিশ্বাস করি।' এসবই প্রায় আক্ষরিক ভাবে রম্যাঁ রলাঁর কথা। যাঁরা রলাঁর 'ল্য ভোয়াইয়াজ অ্যাঁতেরিয়র' (অন্তর্যাত্রা) পড়েছি, পড়েছি মালভিদা ফল মেজেনবুগকে লেখা বা নিজের মাকে লেখা চিঠিপত্র অথবা তাঁর জার্নাল, জানি প্রায় প্রত্যেকটি কথা রলাঁর অভিজ্ঞানের সঙ্গে মিলে যায়।

আমি স্থানান্তরে লিখেছি, গ্রিকরা যাকে বলতেন, 'পারেজিয়া', যে কথাটি ৪৫০ থেকে ৪৭০ খ্রিস্টপূর্বে এউরিপিদেস প্রথম ব্যবহার করেন, ফরাসিরা যাকে বলে franc-parler, তাই ছিল ভলতের, ভিক্তর য়্যুগো এবং রম্যাঁ রলাঁর ঘরানা। ওই মুক্তভাষীদের বীজমন্ত্র ছিল libera oratione (free speech)। মিথ্যের বিরুদ্ধে, অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই। এক প্রতিবচনের নির্মাণ, এক আপসহীন স্বচ্ছতার ইতিহাস। ভলতেরের উত্তরসূরি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সংগীতবেত্তা রম্যাঁ রলাঁই অন্নদাশংকরের জীবনবেদের প্রথম অধ্যায় রচনা করে দিয়েছিলেন, যেমন বিনু লিখেছিল তার বইতে। এ রলাঁ সে রলাঁ নয় যাঁকে আমরা শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকার বলে নিশ্চিন্তে সরিয়ে রেখেছি। এই রলাঁর অবস্থান ঝড়ের কেন্দ্রে, যিনি সমস্ত দ্বিচারিতা ও ছলনাকে উদ্ঘাটিত করতে বদ্ধপরিকর, যিনি বলতে পারেন: In Tyrannos! (সমস্ত স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে), যে-রলাঁ দেশবাসীর বিরুদ্ধে গিয়ে

জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করার আহ্বান জানিয়ে এক মহাপুস্তিকা লেখেন, যা বহু চিন্তাজীবীর স্বাধীনতাপ্রীতির সুযোগ খুলে দেয়। সমগ্র ফ্রান্সে রলাঁ হয়ে ওঠেন বিশ্বাসহন্তা। একটু চুপ করে থাকলেই একজনের সাহিত্যিকের অহমিকা যা প্রত্যাশা করে ফ্রান্সে তার সবকিছুই তিনি পেতে পারতেন। শুধু একটু নিচু হলেই হাতে আসত পুরস্কার, পদক। কিন্তু 'আমি শুনলাম বিবেকের বাণী, আর এক মুহূর্তে সমস্ত কিছু ধ্বংস করে ফেললাম: আমার সমগ্র অতীত, আমার সমগ্র ভবিষ্যৎ। কিন্তু তার জন্য আমি এতটুকু অনুতাপ করি না।' এইভাবে ১৯১৫ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, শতাব্দীর অন্যতম বহুল-পঠিত ও সম্মানিত উপন্যাস 'জাঁ-ক্রিস্তফ'-এর রচয়িতা, আকাদেমি ফ্রাঁসেজের ভবিষ্যৎ সদস্য ফরাসি দেশের ইতিহাস থেকে নিজেকে দুহাতে মুছে ফেললেন। সেই রম্যাঁ রলাঁ যাঁকে সহপাঠীরা বলত 'un volcan sous la glace' (বরফে ঢাকা আগ্নেয়গিরি)।

১৯৫৩ সালে রলাঁ সম্পর্কে বাংলায় রচিত সম্ভবত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধটিতে নিরপেক্ষ বিচারের পর অন্নদাশংকর নিজের কথা লিখেছিলেন:

> আঠারো উনিশ বছর বয়সে তাঁর 'জন ক্রিস্টোফার' আমার হৃদয় হরণ করেছিল। ইচ্ছা করত, জন ক্রিস্টোফারের মতো বাঁচতে, জনসাধারণের জন্য সৃষ্টি করতে। জানতুম যে, জনসাধারণ আমাকে বুঝবে না, ক্রিস্টোফারকেও বুঝল না, সেইজন্যে আগে থাকতে শোক করতুম।... 'জন ক্রিস্টোফার' ও 'মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা' গ্রন্থে একই জিজ্ঞাসা: কেমন করে বাঁচব? একই উত্তর : মিথ্যার সঙ্গে আপোস করব না, সত্য করে বাঁচব। এর দরুন যদি দুঃখ পেতে হয়, দুঃখ পাব, এভাবে না। জীবনে বহু দুঃখ আছে, তা জেনেও জীবনকে ভালবাসব। সেই তো বীরত্ব। মর্তলোকে একমাত্র বীরত্ব।... তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিবেক।... গত মহাযুদ্ধে এর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়।'

অন্নদাশংকর তাঁর কাছে বিবেকের নির্দেশ পালন করতে শিখেছিলেন। সবসময় যে পারেননি, আপনজনেরা জানেন তার জন্য তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না!

২০০৫

এক অসম্পূর্ণ গবেষণার খতিয়ান

এ দেশের কারণে-অকারণে ফুকো আওড়ানো, অসহায় ভাবে পাশ্চাত্যের নতুন বচনের ফাঁদে পড়ে যাওয়া পণ্ডিতেরা তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন হয়ে গেলেও, এ বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে রম্যাঁ রলাঁ ছিলেন সদ্য-সমাপ্ত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুক্তমনা ভাবুক বুদ্ধিজীবী। শুধুমাত্র 'মহান' ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সংগীতবেত্তা, ইতিহাসবিদ, জীবনী ও পত্ররচয়িতা বললে তাঁর জীবনতৃষ্ণার পরিমাপ করা যায় না। আসলে তিনি ছিলেন সেই 'ক্লাসিক' বিবেকী বুদ্ধিজীবী, যার মৃত্যু হয়েছে।

প্রখর ভাবে কর্নেলীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, পনেরো বছর বয়স থেকে নৈতিক ও শারীরিক সংকটে দিশেহারা, মৃত্যুচিন্তা ও শূন্যতাবোধে আক্রান্ত, ক্রমশ স্পিনোজার দর্শনে দীপ্ত; শেক্‌সপিয়ার, গ্যোয়েটে ও এর্নেস্ত র‍্যনাঁ, বেটোফেন-মোৎসার্টের ছাত্র, রলাঁ ছিলেন আঁদ্রে মালরোর মতে, ফ্রান্সে রোম্যান্টিকতার শেষ প্রতিনিধি। একমাত্র ভিকতর য়্যুগোর সঙ্গেই যাঁর তুলনা।

একবারও ভারতবর্ষে না এসে, ইংরেজি অথবা একটিও ভারতীয় ভাষা না জেনে ফরাসিতে গাঁধী (১৯২৪), রামকৃষ্ণ (১৯২৯) ও বিবেকানন্দ (১৯৩০) সম্পর্কে এমন তিনটি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বই রলাঁ কীভাবে লিখেছিলেন, তা সত্যিই এক বিস্ময়! মনে রাখতে হবে, তিনি মিয়ে, মিকেলাঞ্জেলো, হান্ডেল, টলস্টয়, বেটোফেন ও শার্ল পেগির জীবনকেও ধরতে চেয়েছিলেন; সেগুলিও কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীদুটি পাশ্চাত্যের কোনও কোনও মহলে খুলে দিয়েছিল নতুন চেতনার নীলাকাশ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশের পর রলাঁ ভারতবর্ষের দিকে মুখ ফেরান; কারণ 'ইয়োরোপের পতন হচ্ছে, একটি পাথরের মতো।' আরও অনেক আগেই একোল নরমাল স্যুপেরিয়রে ছাত্রাবস্থা থেকেই ভারত সম্পর্কে মুগ্ধতার নানা প্রমাণ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও রম্যাঁ রলাঁ'-য় বিশিষ্ট রলাঁ-গবেষক অবন্তীকুমার সান্যাল সেসবের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিয়ে শুরু করেছেন। বিশেষ করে ১৯২১ সালের এপ্রিলে ফ্রান্সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে মোটামুটি তিরিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কে সম্যক ভাবে রলাঁর 'ভারত-পর্যায়' বলে চিহ্নিত করা যায়। সুইজারল্যান্ডের ভিলন্যভে ভিলা অলগায় অনেক শ্রেষ্ঠ ভারতীয়ের সঙ্গে রলাঁর দেখাসাক্ষাৎ ও আলোচনার কাহিনি তাঁর 'ভারতবর্ষ' দিনপঞ্জিতে (১৯৬০) ধরা আছে, যেটির অবন্তীকুমার-কৃত বাংলা অনুবাদটির (১৯৭৬) সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। এই সময় ভালবাসার পাশাপাশি অশান্তি ও টানাপোড়েনও কম হয়নি। ১৯২৬ সালে এক চূড়ান্ত যন্ত্রণার মুহূর্তে, রবীন্দ্রনাথের মুস্‌সোলিনি-মুগ্ধতায় মর্মাহত ও বিদীর্ণ রলাঁ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'দ্য ফেস অব সাইলেন্স' (১৯২৬)-এর মাধ্যমে রামকৃষ্ণের কথা জানতে পারেন।

৪ অক্টোবর ১৯২৬ সুইজারল্যান্ডের ভিলন্যভে রলাঁর বাড়ি এসে উপস্থিত হন ধনগোপাল স্বয়ং। ওই দিনই রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জিতে লিখেছেন : 'বইটির যে কয়েকটি পাতা আমার বোন আমাকে পড়ে শুনিয়েছে, তাতে আমাকে এমনই পেয়ে বসেছে যে, আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছি, রামকৃষ্ণ ও তাঁর তেজস্বী শিষ্য বিবেকানন্দের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পড়াশোনা করা এবং ইউরোপে তাঁদের পরিচিত করা আমার কর্তব্য। রামকৃষ্ণ ছিলেন অসংস্কৃত, শিক্ষাদীক্ষাহীন মানুষ কিন্তু তিনি স্বতঃউপলব্ধির অন্যতম অতি শক্তিশালী প্রতিভার অধিকারী বলে মনে হয়। নিজের মধ্যে তিনি সমস্ত মহৎ ধর্মের একীভবন করেছিলেন।' ('ভারতবর্ষ', অনু. অবন্তীকুমার সান্যাল) তিনি লিখেছিলেন, রামকৃষ্ণের সহজাতবৃত্তির শক্তি 'মহাকাব্যোচিত', যার জন্য 'অতি-সংস্কৃত, এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্য অহংকারী', বিবেকানন্দকেও 'দামাস্কাসের পথে পলের মতো রামকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়তে হয়েছিল।' ভারতীয় প্রোটেস্ট্যান্ট কে টি পলের কাছে আগেই রামকৃষ্ণপন্থীদের কথা শুনেছিলেন রলাঁ। ১২ সেপ্টেম্বর বিশ্বস্ত বন্ধু ও 'lieutenant intellectuel' কালিদাস নাগকে রলাঁ লিখেছিলেন: 'তাঁর খ্রিস্টধর্ম রামকৃষ্ণভাবনার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। তিনি যা বললেন তা মুখার্জীর বইয়ের মতোই কৌতূহলোদ্দীপক...এ ব্যাপারে আরও যথাযথ তথ্য দরকার।' ১৫ জুন ১৯২৭ লিখছেন তাঁর বোন ও তিনি প্রচুর পরিমাণে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ পড়ছেন। পাশাপাশি শেষ করছেন বেটোফেনের পরিবর্ধিত জীবনী! ১৫ মে ১৯২৮ রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বই লেখার আগে মরতে

ভয় পাচ্ছেন। তাঁর মনে হয়েছিল: 'একজন মানুষ যতই প্রকৃতি-শক্তিকে অতিক্রম করে যান, ততই তিনি শ্রদ্ধার্হ হয়ে ওঠেন। খ্রিস্ট ও রামকৃষ্ণের চূড়ান্ত মূল্য এখানেই।...তিনি মানবতার বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ এক সৃষ্টি, এক পরিণত মুহূর্তের জাদু-ফল।' এর পর সেই গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো বাক্য: 'রামকৃষ্ণ এক সিম্ফনি, যা বেটোফেন ও ভাগনার, রাফায়েল ও মোৎসার্টের মতো অতীতের শত শত সাংগীতিক উপাদানের অপূর্ব এক সমন্বয়।' মনে হল, অবন্তীবাবু ওই পত্র-সংলাপ মন দিয়ে পড়েননি। পড়লে উপরিউক্ত অপরূপ ও বিস্ফোরক চিঠিটির প্রসঙ্গ আসত, সেগুলি রলাঁর চাবি-বক্তব্য বলে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে জানতে জানতে রলাঁ এক অনন্ত 'সমুদ্রপ্রতিম অনুভূতি' (Sensation océanique)-র সন্ধান পান, সে কথা ৫ ডিসেম্বর ১৯২৭ জানিয়েছিলেন স্বয়ং ফ্রয়েডকে। সেই অনুভূতির কথাটি নাকি ফ্রয়েডকে পুরো দেড় বছর 'এক মুহূর্ত শান্তি দেয়নি,' তাঁকে প্ররোচিত করেছে 'নতুন চিন্তায়' (রলাঁকে ফ্রয়েড, ১৪ জুলাই ১৯২৯)। ১৭ জুলাই ১৯২৯ রলাঁ উত্তর দেন, তিনি ওই অনুভূতিকে আজ আরও গভীর ভাবে চিনেছেন, এবং 'লা মিস্তিক এ লাকসিয়ঁ দ্য ল্যাঁদ ভিভাঁত' নামে তিনটি খণ্ড প্রকাশ করতে চলেছেন। তিন দিন পর ফ্রয়েড জানান, তিনিও একটি ছোট বই লিখছেন, তবে সেটি সমুদ্রপ্রতিম অনুভূতির সপ্রশংস 'অ্যাপ্রিসিয়েশন' নয়, সেটি হবে একটি 'বিশ্লেষণধর্মী' বই। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন মিস্টিসিজম্ ও সংগীত তাঁর অনুভূতিকে নাড়া দেয় না। রলাঁ লেখেন, যুক্তির খাতিরে ফ্রয়েড 'মিস্টিসিজম'কে ভয় পান, কিন্তু তিনি নিজে ছোটবেলা থেকেই 'স্বজ্ঞা' ও 'স্ববিচার'-এ বিশ্বাসী। তিনি কর্ণেইকে উদ্ধৃত করে লেখেন, তিনি 'দেখতে, বিশ্বাস করতে ও সন্দেহ করতে' চান। এর পর হেরাক্লিটাস থেকে মূল গ্রিকে যে উদ্ধৃতি দেন, তার মর্মার্থ হল, 'বিরুদ্ধশক্তির সমন্বয়ই হল শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য'। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী দুটি পেয়ে ও পড়ে ১৯ জানুয়ারি ১৯৩০ ফ্রয়েড যে উত্তর দেন, অবন্তীকুমার তার একটি তারিখবিহীন খণ্ডিত উল্লেখ করেছেন মাত্র। অথচ, রামকৃষ্ণ বিষয়ে ফ্রয়েড-রলাঁর সংলাপের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কী হতে পারে? সেই চিঠিতে ফ্রয়েড লিখেছিলেন, তিনি রলাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ শ্লেষোক্তিতে রাগ করছেন না। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলতে চান যে 'বহির্মুখিতা' ও 'অন্তর্মুখিতা'-র বিভাজনের ধারণাটি এসেছিল কার্ল ইয়ুং-এর কাছ থেকে, যিনি নিজেই ছিলেন এক ধরনের মিস্টিক এবং যাঁকে তিনি

মনোবিশ্লেষকদের আপনজন বলে মানেন না। বিবেকানন্দ-জীবনীতে (২য় ভাগ, ২য় অধ্যায়, ইং অনু পৃ. ২৩১-২) 'ড. ফ্রয়েড'-এর প্রতি শ্লেষোক্তি থেকে বোঝা যায়, ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে ফ্রয়েডের সঙ্গে রলাঁর একটি নিঃশব্দ যুদ্ধ চলেছিল।

গাঁধী বিষয়ক বইটির মতো, আলোচ্য জীবনীদুটিও যেন ছেনি-বাটালি হাতে এক ভাবুক ভাস্করের সৃজন, যা পশ্চিম ইয়োরোপের এক শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের পক্ষেই সম্ভব। অথচ, রলাঁর নতুন ফরাসি জীবনী বেরনার দ্যুশাৎলের 'রম্যাঁ রলাঁ তেল কাঁ ল্যুই-মেম' (২০০২) ও রিচার্ড ফ্রান্সিসের ইংরেজি বইটিতে (১৯৯৯) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামমাত্র উল্লেখ রয়েছে। আলোচনা তো দূরের কথা! দ্যুশাৎলে অবশ্য সম্প্রতি এক আলোচনাচক্রে জানিয়েছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীতেই রলাঁর প্রকৃতিকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চিনতে পারা যাবে। কিন্তু তিনি নিজে এখনও কিছু লেখেননি। সুতরাং ভারতবর্ষ-এর অনুবাদক, রলাঁ-বিশেষজ্ঞ অবন্তীকুমার সান্যালের কাছে প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু 'কয়েক দশকের শ্রমে ও সাধনায় প্রধানত মূল ফরাসি ভাষা থেকে তথ্য নিষ্কাশিত করে, নির্মোহ ইতিহাসের দৃষ্টিতে' শেষে এই বই? লেখকের 'প্রসঙ্গ রম্যাঁ রলাঁ' বা 'মস্কোর দিনলিপি'-র ভূমিকার স্বচ্ছ যুক্তি এবং বিশ্লেষণের বদলে এটি হয়ে উঠেছে এক ধরনের এলোমেলো, ভাসাভাসা ধারাবিবরণী। পার্শ্বরেখালেখ যদি আলোই না ফেলে, তবে তার উদ্দেশ্য সফল হয় না।

বইটির অন্যতম প্রধান ভর বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার অন্তরঙ্গ বান্ধবী মেধাবী, ফরাসি জানা মার্কিন মহিলা জোসেফিন ম্যাকলাউড। (ইংরেজি বানান Josephine Macleod, যদিও দায়িত্বহীন উদাসীনতায় এখানে সেটি হয়েছে Jasephine Mcleod [পৃ. ২৬৬]!) কিন্তু মিস ম্যাকলাউডের শত মন্তব্য যোগ করলেও রলাঁর উদ্ভাসিত জীবনী নির্মিত হয় না। 'নিবেদিতার মনোভাব চিরকাল নির্মল' হলেও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মধ্যে 'বিপদের গন্ধ পেতেন', এই রকম সাংঘাতিক কথা রলাঁ কেন লিখলেন (ইং অনু পৃ. ১৩৮), কোন সূত্রে পেলেন, খতিয়ে দেখলে ভাল হত। উল্লেখ্য যে রলাঁ 'হয়তো' শব্দটি লিখেছিলেন, যা অবন্তীকুমার উদ্ধৃতি থেকে বাদ দিয়েছেন (পৃ. ৪০)। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যোগাযোগের অংশগুলি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু রলাঁর গ্রন্থদুটির অভিজ্ঞানকে বুঝতে সাহায্য করে বলে মনে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইটিকে কঠোর ভাবে সম্পাদনা করার প্রয়োজন ছিল। পুনরাবৃত্তি ও মামুলি কথা এবং বক্রলেখের যথেচ্ছ ব্যবহার বইটির ক্ষতি করেছে। সারা বই জুড়ে বন্ধনীতে বড় বড় ফরাসি বাক্য ও বাক্যাংশ না থাকলেই ভাল হত। যাঁরা ফরাসি জানেন না, তাঁরা এতে ঘাবড়ে যাবেন, যাঁরা জানেন তাঁরা অস্বস্তি বোধ করবেন।

ফরাসি শব্দের প্রাথমিক স্তরের অশুদ্ধ উচ্চারণগুলির দু'-চারটি উদাহরণ দিই: 'মিত্‌রাঁ' নয়, 'মিতেরাঁ'; 'লা মার্সেইজ' নয়, 'লা মার্সেইয়েজ'; 'য়্যুরোপ' নয়, 'য়্যরোপ'; 'তাক্‌স্‌ত্‌' নয়, 'তেক্‌স্‌ত'; 'এউজেন' নয়, 'য়্যজেন'; 'মারি-লোর প্রভস্ত' নয়, 'প্রেভো'; 'বিবলিওথেক নাশিওনেল' নয়, 'বিবলিওতেক নাসিওনাল'; 'Ontology' নয়, 'Ontologie'। অসংগতির শেষ নেই। সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি-কে হঠাৎ ফরাসি ভঙ্গিতে 'ফ্রাঁসোয়া দাসিজ' (পৃ. ১৫৬) বলা কেন? প্লেটো-কে (গ্রিক 'প্লাতোন') কি আমরা 'প্লাতোঁ' বলি? ফরাসি বাগধারা না ধরতে পেরে আক্ষরিক অনুবাদের জন্য কিছু কিছু কেলেঙ্কারি হয়েছে। জার্মান বানান ও উচ্চারণও অনেক সময় সঠিক নয়। তবু এই ক্ষুব্ধ ও প্রশ্নার্ত সময়ে রলাঁর আবিষ্কার-অভিযানের কথা আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা অবন্তীকুমার সান্যালের কাছে কৃতজ্ঞ। রলাঁর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে আবিষ্কার এবং তাঁদের জীবনীরচনা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অঙ্গ।

২০০৩

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরের বাঁধনে : রবীন্দ্রনাথ ও স্যাঁ-জন পের্স

"তোমার মত কবির জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি..."

একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে আধুনিক ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ কবি স্যাঁ-জন পের্স (১৮৮৭-১৯৭৫)। প্রথম জনের কাছে একদিন নতজানু হয়েছিল সারা পৃথিবী, আর দ্বিতীয় জনের ভক্তদের মধ্যে পড়েন সমকালের শ্রেষ্ঠ কবিরা : উঙ্গারেত্তি ও রিলকে, এলিয়ট ও আরাগঁ, ভালেরি ও জিদ।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যখন এক ভাঙাচোরা, বিপন্ন বাস্তবের হাড়মাংসের দিকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ইউরোপের কবিতা, বিষয় ও ভাষা নিয়ে চলছে বিতর্ক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, স্বয়ংক্রিয় লিখন-পদ্ধতির সহজ ও বিপজ্জনক রাস্তা বেছে নিয়েছেন নতুন প্রজন্মের প্রতিভাবান কবিদের কেউ কেউ, সেই সময় স্যাঁ-জন পের্স ছদ্মনামে ওই তরুণ সম্পূর্ণ নতুনভাবে লিখছেন বস্তু ও মানুষকে নিয়ে মর্মরিত এক মহাকবিতা। যেখানে তাৎক্ষণিকতার কোনও জায়গা নেই।

সতীর্থদের পরিপ্রেক্ষিত যে ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, সময়চিহ্নের ছাপ হয়ে উঠছে কাব্যগুণের মাপকাঠি, সেসব তোয়াক্কা করছেন না তিনি।

কোথা থেকে এল তাঁর রচনার এই মহাকাব্যিক বিস্তার? তাঁর অনুরণনময় সাংগীতিক গদ্যের জনক পল ক্লোদেলের কাছ থেকে, বলবেন ফরাসি কবিতার সমালোচকেরা। অথবা মরমিয়া কবি ফ্রাঁসিস জামের কাছে, যাঁর বাড়িতে ১৯০৫ সালে ক্লোদেলের সঙ্গে প্রথম তাঁর দেখা হয়েছিল? নাকি অন্য এক মাত্রা রয়েছে তাঁর স্বতন্ত্র বয়নশিল্পের আড়ালে, যা অজানা রয়ে গেছে সকলের?

লন্ডনের সাউথ কেনসিংটনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্যাঁ-জন পের্স (আসল নাম মারি-রনে-অগুস্ত আলেক্সিস স্যাঁ-লেজে লেজে[১], ছদ্মনাম ব্যবহার করবেন আরও পরে) দেখা করেছিলেন ১৯১২ সালের ১৭ অক্টোবর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ তখন জুন থেকে ইংলন্ডে, গীতাঞ্জলির ঐতিহাসিক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হতে চলেছে, তার আগে একবার তিনি আমেরিকা ঘুরে আসবেন ভাবছেন, যেখানে ইতিমধ্যেই তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এজরা পাউন্ডের উৎসাহে। লন্ডনের একটি কাগজে[২] ইয়েট্সের উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি নাকি প্রকাশিতব্য ইংরেজি অনুবাদটি প্রুফে পড়েছিলেন (যা তাঁকে দেখিয়ে থাকবেন ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ)। ১৪ অক্টোবর স্ট্র্যাংওয়েজের পরিচয়পত্র-সহ ওই আনন্দমুগ্ধ ফরাসি লিখেছিলেন: '...Will you, will you be so kind as to let me know at what time I might find you at home, from now to next Sunday?'[৩] ১৮ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায়কে লেখেন: 'কাল সকালে একজন ফরাসী গ্রন্থকার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি প্রুফে আমার তর্জ্জমাগুলো পড়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে এসেছেন। তিনি বল্লেন, তোমার মত কবির জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি। আমাদের Lyrics-এ আমরা কেবল accidental-কে নিয়ে বদ্ধ হয়ে আছি—তোমার লেখা দেশকালের অতীত, চল তুমি আমাদের ফ্রান্সে চল, সেখানে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে। ইত্যাদি। ইনি আমার এই তর্জ্জমাগুলো ফরাসীতে অনুবাদ করবার অনুমতি নিয়ে গেলেন।'[৪]

রবীন্দ্রনাথকে তিনি দিয়েছিলেন এক বছর আগে প্রকাশিত তাঁর *Eloges* গ্রন্থের একটি কপি। আর কী কথা বলেছিলেন তাঁরা? অনেক দশক পার হয়ে, পাশ্চাত্যে রবীন্দ্র-বিষয়ে উৎসাহ নিঃশেষ হওয়ার পরও, তাঁদের সেই আশ্চর্য সংলাপ অব্যাহত থেকেছে। ১৯৬১ সালের মার্চে ব্রজমোহন নেহরুকে লেখেন স্যাঁ-জন পের্স: 'আপনার বইটি দেখে আমার মনে পড়েছে পঞ্চাশ বছরের পুরনো এক সংলাপ, যা খুব কম বয়সে আমি শুরু করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লন্ডনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধরও আগে।'[৫]

পাঁচ দশক পরে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সময় ফ্রান্সের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে গিয়ে সাউথ কেনসিংটনের সেই শান্ত বাড়িটির স্মৃতিচারণ করেছেন: 'তিনি আমাদের মাঝে বসেছিলেন পুরাণের সেই অতিথি সেবকের মতো, পরনে শ্বেত পোশাক, বহন করে এনেছিলেন তাঁর বাণী। মানব-মৃত্তিকা দিয়ে নির্মিত অমন সুন্দর মুখ প্রায় দেখা যায় না। তিনি কথা বলছিলেন সংগীতকার হিসেবে, দার্শনিক হিসেবে, চোখে তাঁর মহাত্মাদের

অদ্ভুত কোমলতা। জ্যোতির্বলয়ের মতো একটি কিংবদন্তী তাঁকে ঘিরে রেখেছিল।... সারা ইয়োরোপে চতুর্দিকে ধোঁয়া ছড়াচ্ছিল বিরাট বিরাট সব চুল্লি, আর রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন বস্তুবাদের বিপদ সম্পর্কে তাঁর গভীর উদ্বেগ ও ভয়ের কথা...'[৬]

স্যাঁ-জন পের্সের মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ এক পুরোহিত, দুই পৃথিবীর, দুই যুগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, পুরাণ-পুরুষের মতো। তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্যের শুরুতেই লিখেছিলেন: 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বড়, কারণ তাঁর আধ্যাত্মিকতা ছিল মানবতায় প্রোথিত। তাঁর কপালে আজও জ্বলজ্বল করছে মহত্ত্বের যৌথ টীকা: কবি হিসেবে তিনি জানতেন কীভাবে মানুষের কাছ থেকে সরে না এসে স্বপ্নকে উঁচুতে তুলে ধরতে হয়। সময় ও স্থানোত্তর (spaceless) তাঁর কবিতা, আবহমান মানুষের পদচিহ্ন ধরে যা শেকড়ের কাছে ফিরে যায়। সেই নদীতীরের সন্ধানে তাঁর যাত্রা যেখানে সমস্ত রাত্রির অবসান।'

'রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব হল কবিতার মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠায়, সৎ ও তীব্রভাবে জীবন্ত।' গীতাঞ্জলি পাঠের পাঁচ দশক পরেও তাঁর কাছে বইটির 'পরিপূর্ণ স্নিগ্ধতা ও নির্যাস' এতটুকু ম্লান হয়নি। রবীন্দ্রনাথের শুদ্ধতম শিল্প তাঁর সম্পূর্ণ সত্তাকে মধুরভাবে আন্দোলিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতে এত উত্তেজিত হয়েছিলেন আলেক্সিস লেজে যে এক সপ্তাহের মধ্যে (২৩ অক্টোবর ১৯১২) জিদকে লেখেন: 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ' আর্নল্ড বেনেটের বদলে ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পরিচিত করালে অন্তত একটা কাজের কাজ করত। তাঁর কবিতার স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ পনেরো দিনের মধ্যে প্রকাশিত হতে চলেছে। বহু বছরের ভেতর এটিই ইংরেজিতে একমাত্র উল্লেখযোগ্য কবিতার বই।'[৭] ডিসেম্বরের চিঠিতে তিনি জিদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে 'grand vieillard pélerin d'un charme délicat et d'une distinction très sure' ('গভীরভাবে বিশিষ্ট ও সূক্ষ্ম আকর্ষণময় এক মহান বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী') বলে বর্ণনা করেন এবং তাঁকে সদ্য-প্রকাশিত ইংরেজি গীতাঞ্জলির ব্যক্তিগত কপিটি পাঠিয়ে দেন, বইটি খোয়াতে একেবারেই প্রস্তুত নন সেকথা যোগ করে। তারপর ১৯১৩-র ১২ জানুয়ারি লন্ডন থেকে সমান উৎসাহে লেখেন: 'Cher ami, I'oeuvre de Tagore est belle... প্রিয় বন্ধু, রবীন্দ্রনাথের বইটি সুন্দর। নিঃসন্দেহে ফ্রান্সে একমাত্র আপনিই ওটা পড়েছেন।' ২৮ জানুয়ারি চিঠিতে খোঁজ নিয়েছেন জিদ সেটিকে

তাঁর পত্রিকার জন্যই অনুবাদ করার কথা ভাবছেন, না বই হিসেবে বের করার পরিকল্পনা আছে তাঁর।

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরাসি সাহিত্যপত্র 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ'-এর নবতম আবিষ্কার আলেক্সিস স্যাঁ-লেজে লেজে-র (যাঁর পাঠকদের মধ্যে তখনই পল ভালেরি, লেয়ঁ-পল ফার্গ ও স্বয়ং জিদ) অভিমতের মূল্য রবীন্দ্র-গবেষকেরা ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

ফরাসি অনুবাদ-স্বত্ব পাওয়া খুব সহজ হয়নি, কারণ ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ তিনজন অতি সাধারণ মানের অনুবাদকের সঙ্গে কথা বলে রেখেছিলেন। অবশেষে আলেক্সিস লেজে রবীন্দ্রনাথকে আঁদ্রে জিদের পরিচয় দিয়ে অনুবাদ-স্বত্ব সংগ্রহ করার পর, ১০ জুলাই ১৯১৩ তারিখে জিদকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন তাঁর অনুবাদ-কর্ম হয়ে উঠুক 'শুদ্ধতা ও আবহমানতার একটি দীর্ঘ ঋতু' ('Une longue saison pure et sans âge')। রবীন্দ্রনাথ পড়ে অভিভূত জিদ তরুণ কবির কাছে তাঁর অশেষ ঋণ স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। প্রত্যুত্তরে আলেক্সিস জানালেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জিদের প্রতিভাকে মেলাতে পেরে তিনি সম্মানিত। তিনি চেয়েছিলেন বোদল্যের যেমন এডগার অ্যালান পো-কে, জেরার দ্য নেরভাল যেমন গ্যোয়েটেকে, জিদ তেমনি ফরাসি ভাষায় জীবন্ত করে তুলুন রবীন্দ্রনাথকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও ১৯১৩ সালের গোড়ায় এই কাঙ্ক্ষিত মণিকাঞ্চন-যোগের কথা লিখেছেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত জিদের অনুবাদে গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয় প্রথমে 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ' পত্রিকার ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যায় (১ ডিসেম্বর ১৯১৩) ও পরে সেই প্রতিষ্ঠানের বিখ্যাত প্রকাশনায়। স্বভাবতই তা স্যাঁ-লেজে লেজেকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। উৎসর্গপত্র Epître dédicatoire-এ জিদ স্পষ্টই লিখেছেন স্যাঁ-লেজে লেজের জন্যই তিনি ফরাসি দেশে প্রথম রবীন্দ্রকবিতার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন।[৮]

ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে আঁদ্রে জিদের ফরাসি অনুবাদের (অবশ্য ইংরেজি থেকেই) ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইংরেজিমুগ্ধ বাঙালি সম্ভবত তা কোনওদিন বুঝতে পারেননি। স্পেনে হুয়ান রামোন হিমেনেথ, আর্জেন্টিনায় ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো, পর্তুগালে প্লাসিদো বারবোসা এবং ইতালিতে জুসেপ্পে উঙ্গারেত্তি থেকে শুরু করে লাতিন বিশ্বের বহু সংবেদী পাঠকের কাছে খুলে

গিয়েছিল এক অনাস্বাদিতপূর্ব জগৎ। এমনকী প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্র-উৎসাহী রিলকেও জিদের অনুবাদেই গীতাঞ্জলি পড়েছিলেন। হয়তো ইংরেজির জানলা দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে গিয়ে আমরা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলেছি।

১৯০৮ সালে *La porte étroite* ('শীর্ণ তোরণ') প্রকাশিত হওয়ার পর জিদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি তখন তুঙ্গে। তাঁর সাহিত্যপত্রটিকে ঘিরে (যদিও সম্পাদক হিসেবে কখনও তাঁর নাম ছাপা হয়নি) সৃজনশীলতার জোয়ার, যাতে সামিল ছিলেন ভালেরি, ক্লোদেল, পেগি, জিরোদু, ফ্রাঁসিস জাম, জাক রিভিয়ের, আল্যাঁ-ফুর্নিয়ে, ভালেরি লারবো, লেয়ঁ-পল ফার্গ, মার্সেল প্রুস্ত, জর্জ দ্যুয়ামেল, দ্রিয়্য লা রোশেল...। ছাপা হচ্ছে জিদের 'শীর্ণ তোরণ', *Si le grain ne meurt, Isabelle* (এবং পুস্তকাকারে ও বেনামে কুখ্যাত *C.R.D.N*) ছাড়াও পল ক্লোদেলের *L' Annonce faite à Marie* ও ভালেরি লারবোর *A. O. Barnabooth; Journal d'un milliardaire*, আল্যাঁ ফুর্নিয়ের *Le grand Meaulnes* ও ক্রমশ মার্সেল প্রুস্তের *A la recherche du temps perdu*, ভালেরির *Le cimetière marin*, র‍্যাঁবো ও লাফর্গের অপ্রকাশিত লেখা, আঁদ্রে ব্র্যতঁর *Pour dada*, আঁদ্রে সালমঁ-র *L'Age de l'humanité*... এক কথায় সমকালীন ফরাসি সাহিত্যের সোনার ফসল। এঁদেরই পাশে জায়গা করে নিল রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি।

আর ১৯১০ সালের ১ এপ্রিল 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ'-এর ১৬ নং সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল এক অনন্যসাধারণ তরুণ কবির রচনা, স্যাঁ-লেজে লেজে-র *Eloges* (পৃ. ৪৩৮-৪৪৯, রচনাকাল ১৯০৭)। এই কবির সন্ধান জিদকে দিয়েছিলেন ফ্রাঁসিস জাম। গদ্য-কবিতাগুলি পড়ে হতবাক হয়ে যান ভালেরি লারবো এবং যুবকটির সঙ্গে দেখা করতে ফ্রান্সের প্রত্যন্ত শহর পো পর্যন্ত দৌড়ে যান। ১৯১১ সালে জিদের সুপারিশে গাস্তঁ গালিমার *Eloges*-কে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ওই বছর ২০ ডিসেম্বর *La phalange* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় *Eloges* সম্পর্কে লারবোর সমালোচনা। ঠিক ওই সময় প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টারে বাস করছিলেন এক তীর্থার্থী মার্কিন তরুণ, যিনি লা নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ-এর প্রতিটি সংখ্যা সংগ্রহ করতেন। দু-দশক পরে তিনি স্যাঁ-জন পের্সের (ততদিনে ছদ্মনামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখছেন স্যাঁ-লেজে লেজে) কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করবেন। সারা জীবনে আর কারও কবিতা তিনি অনুবাদনীয় মনে করেননি! এই মার্কিন কবিটির নাম টি. এস. এলিয়ট।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় স্যাঁ-লেজে লেজে ইতিমধ্যেই কবিতার জগতের বাসিন্দা। রবীন্দ্রনাথকে ফ্রান্সে পরিচিত করানোর আত্মবিশ্বাস তাঁর ছিল, ইংরেজি-জানা অনুবাদক-কবি লারবোকে সে ব্যাপারে রাজি করানো কঠিন হত না; কিন্তু তিনি চাইছিলেন তুমুল সৃজনশীলতার ফাঁকে আঁদ্রে জিদই ফরাসি সাহিত্যে নতুন ঢেউ আনুন। বোদল্যেরের এডগার অ্যালান পো-অনুবাদের তুলনাটি বিশেষ তাৎপর্যময়; বোদল্যের শুধু ফরাসিতে পো-অনুবাদই করেননি, ফরাসিতে পো-প্রভাবিত বোদল্যের এক নতুন শিহরনের ('frisson nouveau' : বোদল্যের প্রসঙ্গে ভিক্তর য়্যুগোর উক্তি) সূত্রপাত করেন, যা মালার্মের ভাষায় 'purified the dialect of the tribe' ('এডগার পো-র সমাধি')। ফরাসি কবিতার পাঠক জানেন কীভাবে পো প্রায় সম্পূর্ণ এককভাবে প্রতীকবাদকে শাসন করেছেন, এবং তৈরি করে দিয়েছেন এক নতুন বচন।

অর্থাৎ স্যাঁ-লেজে লেজে গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদটিতে এমন কিছু পেয়েছিলেন যা তাঁর মতে পো-র মতোই ফরাসিতে এক নতুন দিগন্তের উদ্বোধন করবে। জিদের সম্মানিত অনুবাদটি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে?

স্যাঁ-জন পের্স নিজে সারা জীবন এক অভ্রময় গদ্যকবিতা ছাড়া কিছু লেখেননি। তাঁর কাব্যের মর্মস্থলে যে গভীর ধ্বনিময়তা ও স্তোত্রধর্মিতা তার আড়ালে কি রবীন্দ্রনাথ, অথবা হ্যারল্ড ব্লুম যাকে বলেছেন 'misreading', যা পো-র ক্ষেত্রে ফরাসিদের সাহায্য করেছিল?

বাইবেলে ব্যবহৃত টানা, ছন্দিত গদ্যের স্তবক—যা তিনি ক্লোদেলের কাছ থেকে নিয়েছিলেন—ফ্রান্সে verset ('ভের্সে') নামে খ্যাত। সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্যকে এক ঐশ্বরিক সম্পূর্ণতার অনুভবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন ক্লোদেল। আর পের্স তাতে ঝর্নাধারার মতো এক স্বাধীন সুর সঞ্চার করেছিলেন। মালার্মের রুদ্ধ ও মানব-বিচ্ছিন্ন কৃত্রিম জগতের থেকে এ-একেবারে আলাদা, প্রত্যক্ষ জীবনের ধূলিধূসর ব্যঞ্জনাই এখানে কাব্যের উৎসারকে সম্ভব করে তুলেছে। বস্তু ও মানুষকে নিয়ে তৈরি করেছে এক বিরাট সিম্ফনি।

স্যাঁ-জন পের্সের অখণ্ড সৃষ্টিতে সমস্ত খনিজ ও উদ্ভিদের সঙ্গে একাত্মতা, আলোর ঝর্নার সঙ্গে, মাটি, বাতাস ও সমুদ্রের সঙ্গে এক মৌলিক সংযোগ। গতিবেগ, ঘনত্ব ও ভাবনার বিস্তারে তা এক সাংগীতিক মাহাত্ম্য পায়। এক ফরাসি সমালোচকের ভাষায়, তা কথার সত্যকে ('verite verbale') মহাবিশ্বের সত্যের সঙ্গে ('vérité cosmique') একসূত্রে গ্রথিত করে।

স্যাঁ-জন পের্স লিখেছেন, 'প্রশ্নটা সমুদ্রকে নিয়ে নয়, মানুষের হৃদয়ে সমুদ্রের রাজত্বকে নিয়ে।'

টি. এস. এলিয়ট যখন ইংরেজিতে অনুবাদ করছিলেন তাঁর *Anabase*, পাণ্ডুলিপির ওপর পের্স লিখে দিয়েছিলেন, 'এ এক অন্তর্যাত্রার কবিতা।'[৯]

জীবনের প্রতি ভালবাসায় মুখরিত এক ভারতীয় কবির কাছে কি এ কারণেই তাঁকে আসতে হয়েছিল? খুচরো অভিনবত্বের পেছনে ধাবমান সমসাময়িক ফরাসি বা ইংরেজি কবিতায় এই মানব-অনুরণন তিনি পাননি বলে?

উজ্জীবনের গান, নবজীবনের উৎসবের গান আর কার কাছেই বা শিখতে পারতেন স্যাঁ-জন পের্স? সমস্ত জীর্ণতা ও পচনকে ধুয়ে মুছে শেষ করার গান, যেমন আছে *Vents* কাব্যে?

যে অন্তহীন জীবনমুখিনতা তিনি রবীন্দ্র-কবিতায় খুঁজে পেয়েছিলেন, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য তা তাঁর কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছিল। ১৯৬০ সালের ১০ ডিসেম্বর স্টকহোমে নোবেল পুরস্কারের ব্যাংকোয়েটে মানুষের যে ছবিটি স্যাঁ-জন পের্স এঁকেছিলেন তার সঙ্গে রবীন্দ্র-ভাবনার মিল খুব স্পষ্ট। তিনি বলেছিলেন কবির সততা (intégrité) নির্ভর করে অনন্তের সঙ্গে, সত্তার সঙ্গে তার আত্মীয়তার ওপর। স্যাঁ-জন পের্স চেয়েছিলেন কবি হয়ে উঠুন সময়ের বিবেক।

আধুনিক স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিমেনেথের মতো, বিশ শতকে ফরাসি দেশের মহত্তম কবিটিও (লুই আরাগঁ-র মতে) লিখতে পারতেন:

একদিন আমি পরিচিত সমুদ্রবেলায় দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় এল এক চেনা ঢেউ, সেই ঢেউয়ের ফেনা ধরলাম হাতে, মুক্তাজননীশুক্তির মতো শুভ্র সেই ফেনপুঞ্জ; আমার হাতে আটকে গেল সেই ফেনা।[১০]

উল্লেখপঞ্জি:

১ পেশায় কূটনীতিবিদ ছিলেন, বিশিষ্ট কবি পল ক্লোদেলের মতো। ১৯১৬ সাল থেকে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র দপ্তরে চাকরি করতেন: দূতাবাসের সম্পাদক হিসেবে পেইচিং-এ (১৯১৬-১৯২১), আরিস্তিদ্ ব্রিয়াঁর মন্ত্রীসভার পরিচালক হিসেবে (১৯২৫-১৯৩২) এবং 'কে দর্‌সে' অর্থাৎ পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান কার্যালয়ে প্যারিসে (১৯৩৩-১৯৪০)। নাৎসী জার্মানির তাঁবেদার ভিশীর পেত্যাঁ সরকার 'bellicisme' বা নিজ স্বার্থে যুদ্ধ বাঁধানোর মিথ্যে অভিযোগ তুলে তাঁকে সাসপেন্ড করায় ১৯৪১ সালে তিনি ফ্রান্স ছেড়ে ওয়াশিংটন চলে যান এবং ১৯৪৬ পর্যন্ত সেখানকার কংগ্রেস গ্রন্থাগারে পরামর্শদাতার কাজ করেন। ফরাসি দেশে ফিরে আসেন ১৯৫৭ সালে ও ১৯৬০ সালে আধুনিক ফরাসি কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান (সুলি প্রুদমকে না ধরলে)। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ নটি: *Eloges*, ১৯১১; *Anabase*, ১৯২৪; *Exil*, ১৯৪৪; *Vents*, ১৯৪৬; *Amers*, ১৯৫৭; *Chronique*, ১৯৬০; *Chanté par celle qui est là*, ১৯৬৯; ও *Chant pour un équinoxe*, ১৯৭৫।

২. মনে হয় ১৩ জুলাই-এর টাইমস পত্রিকা, যেখানে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা মুদ্রিত হয়: 'I was not aware of the moment when I first crossed the threshold of this life' ও 'In the deep shadows of the rainy July'। দ্র. 'রবিজীবনী', প্রশান্তকুমার পাল, ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ, ১৯৯৩, পৃ. ৩১৮। ইয়েটসের 'উদ্ধৃত' বলতে সম্ভবত 'ইয়েটস-পঠিত' বোঝানো হয়েছে। টাইম্‌স্-এর ওই প্রতিবেদনে ১০ জুলাই ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজের খবর দেওয়া হয়েছিল। ইয়েট্‌স্ সেখানে তিনটি কবিতার অনুবাদ পাঠ করেন।

একটি জিনিস এখানে স্পষ্ট: ট্রোকাডেরো রেস্তোঁরায় ওই ডিনারে স্যাঁ-লেজে লেজে নিজে উপস্থিত ছিলেন না। টাইম্‌স্-প্রকাশিত অভ্যাগতদের তালিকাতেও তাঁর নাম নেই।

একটিই খটকা রয়ে গেল: অতখানি উত্তেজিত হয়েও স্যাঁ-লেজে লেজে কেন তিন মাস অপেক্ষা করলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্যে? এমন কি হতে পারে যে তিনি লন্ডনে ছিলেন না?

৩. রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি। তাছাড়া, 'খ্যাতি-অখ্যাতির নেপথ্যে', সৌরীন্দ্র মিত্র, আনন্দ, ১৯৯৫ সং, পৃ. ৩২২। সৌরীন্দ্র মিত্র লিখেছেন আলেক্সিস স্যাঁ-লেজে তখন ফরাসি কূটনৈতিক মিশনের চাকুরে হিসেবে লন্ডনে ছিলেন। এ তথ্য ভুল, তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেবেন ১৯১৪ সালে। তা ছাড়া কূটনীতিক হিসেবে তিনি লন্ডনে নিযুক্ত ছিলেন না। দ্র. টীকা ১। দ্বিতীয়ত, একথাও ঠিক নয়

যে স্যাঁ-লেজে লেজে তখন 'অখ্যাত'। আধুনিক ফরাসি কবিতার ধার না ধারা ইংরেজদের কাছে অখ্যাত হতেও পারেন, তবে ফরাসি কাব্যজগতে নয়।

৪. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬, ১৭ নং পত্র। দ্র. 'রবিজীবনী', প্রশান্তকুমার পাল, ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ, পৃ. ৩৪১।

৫. 'স্যাঁ-জন পের্স রচনাসমগ্র' প্লেইয়াদ সংস্করণ, গালিমার এন. আর. এফ। পরবর্তী সমস্ত সূত্রই এখানে পেয়েছি।

৬. ১৯৬২ সালে অ্যাস্তিত্যু দ্য সিভিলিজাসিয়ঁ অ্যাঁদিয়েন কর্তৃক প্রকাশিত। পের্স-রচনাসমগ্রের অন্তর্ভুক্ত।

৭. ১৯৯১ সালের ১২ মে দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'Tagore and Perse' নামক নিবন্ধের উত্তরে এক পত্রলেখক জানান জিদ নাকি আগেই রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্যাঁ-জন পের্স-রচনাসমগ্রে জিদ ও পের্সের চিঠিপত্র থেকেও বোঝা যায় কথাটি ঠিক নয়।

৮. পের্স-রচনাসমগ্র।

৯. পের্স রচনাসমগ্র।

১০. শিশিরকুমার দাশ-অনূদিত হিমেনেথের 'রবীন্দ্রনাথের ভস্ম' (Ceriza de Rabindranaz Tagore), 'শাশ্বত মৌচাক: রবীন্দ্রনাথ ও স্পেন', শিশিরকুমার দাশ ও শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, প্যাপিরাস, ১৩৯৪, পৃ. ১৪৮।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথ-পাঠে যে 'প্রাথমিক মুগ্ধবোধ ও পরিণামী মোহভঙ্গের' কথা লিখেছেন ('শরণার্থীর ঋতু ও শিল্পভাবনা', আনন্দ, ১৯৯৩, পৃ. ৯৭) হিমেনেথ ও স্যাঁ-জন পের্স তার দুই আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কেন? রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সৃজন-চেতনার উন্মেষে সাহায্য করেছিলেন বলে?

১৯৯৯

রদ্যাঁ ও সত্যজিৎ: ভাস্কর্যের চলচ্চিত্র

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখছি তার সমস্ত তীব্র বিদ্যুৎময়তা নিয়ে চলচ্চিত্রের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত আমার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। মাথা ঈষৎ পেছনে হেলানো, মুখ খোলা, হাত ওঠা, বুকফাটা চিৎকারে এক্ষুনি সে ভেঙে ফেলবে চতুর্দিক: দুগ্‌গা...দুগ্‌গামা...। আমার এতটুকু অসুবিধে হয় না হরিহরকে চিনতে। মনে হয় এই মৃত্যুশোককে আবহমানে স্থিরীকৃত করে রাখতে মুখ, চোখ, মাংসপেশীর (বা ছত্রখান হয়ে যাওয়া গোয়াল, কম্পমান গোরু, চিত হয়ে থাকা ব্যাং ও ঝুলন্ত মালসার) যে অবর্ণনীয় টেনশন সেলুলয়েডে তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ, ১৮৯৮ সালেই এক ফরাসি ভাস্করের ব্রোঞ্জমূর্তিতে তার এক নিখুঁত রূপকল্প তৈরি হয়ে ছিল!

দুঃসহ যন্ত্রণার আবেগকে সময়ের গায়ে খোদাই করে রাখছেন দুজন শিল্পী, তাঁদের মাঝখানে সময়ের টুকরো, ভিন্ন সাংস্কৃতিক বৃত্তরেখা। তাঁদের ভাষা আলাদা, মাধ্যম আলাদা, একজনের শিল্পের উদ্ভাস ব্রোঞ্জের ওপর মূর্ত হয় আঙুল ও তালুর স্নায়ুচাপে; অন্যজনের শব্দ, আলো, সুরযন্ত্র ও জীবন্ত মানুষের গ্রন্থনায়।

তবু কীভাবে আসে এই মিল, এই সুরসংগতি? সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালি' তৈরির আগে রদ্যাঁর Le cri (আর্ত চিৎকার) বা la tête de la douleur (যন্ত্রণার মুখ) দেখেছিলেন প্যারিসে গিয়ে? অথবা কোনও অ্যালবামে? যা তাঁর সজাগ মস্তিষ্কের যোজন যোজন নীচে শুয়ে ছিল! রেমি দ্য গুরমঁ-র ভাষায়, যে-স্মৃতি অনুপ্রেরণা হয়ে ফিরে আসে! অথবা নানা কাজের চাপে কখনওই দেখেননি তিনি, কিন্তু বিশাল অ্যান্টেনা নিয়ে অন্য এক শিল্পীর মতোই তিনি বুঝতে চেয়েছেন মানব-যন্ত্রণার মুহূর্তে ঠোঁট কতখানি খোলে, ঘাড় কত ডিগ্রিতে বেঁকে যায়, হাত ও কনুইতে বিধৃত হয় কী ঝোড়ো কম্পন!

আমরা জানি, সত্যজিতের সেরা কাজের পর্যবেক্ষণ ও মেধানুভূতি (কোলরিজ বা এলিয়টের কাছে যা সবচেয়ে জরুরি ছিল) ছুঁতে চেয়েছে নানা ধরনের প্রতিচ্ছায়া, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবির প্রতিটি আলাদা দৃশ্যের, প্রতি শাঁসের নির্মিতির কথা খেয়াল রাখি না আমরা, মানুষ ও অন্য মানুষ, মানুষ ও বস্তু, রং ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যামেরার চোখের ছন্দিত দূরত্বের কথা, যার গ্রাফিক কম্পোজিশন চিত্রপট, স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। চলমান দৃশ্যের অনায়াস চিত্রধর্মী দৃশ্যসংস্থাপন আরও স্পষ্টভাবে নজরে পড়ে যদি আমরা তাকে হঠাৎ থমকে দিই। যেমন ধরা যাক, হরিহরের ফিরে আসার দৃশ্যের কম্পোজিশন:

> সর্বজয়া ভেঙে পড়ে। ক্যামেরা উঠে সরে আসে হরির মুখের ওপর। কী ঘটেছে সে বোঝে। সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে: তার মাথা ফ্রেমের বাইরে চলে যায়, ক্যামেরার সামনে তার ভাঁজ করা হাঁটু ও অস্বাভাবিকভাবে ঝুলে থাকা হাত, সবচেয়ে তীব্র আবেগ—একটি দুঃসহ যন্ত্রণামুহূর্তের স্থিতিকাল—আমাদের সামনে পৌঁছে দেওয়া হয় শারীরিক অসহায়তা ও তার প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে।
>
> (অপু ট্রিলজি, রবিন উড : অনু প্যাপিরাস পৃ. ৪০)

অথবা সর্বজয়া ও মৃত্যুপথযাত্রী দুর্গার সেই ভয়ংকর রাতের ছবি, যা প্যারিসের রদ্যাঁ-প্রদর্শশালার দোতলায় মার্বেলে খোদিত। ১৯১০ সালে তৈরি ওই ভাস্কর্যের নামও 'মা ও মৃত্যুযাত্রী মেয়ে' (Mère et fille mourante)! আমি রদ্যাঁর চোখ দিয়ে দুর্গাকে সবলে আঁকড়ে থাকা মা'র প্রতিমাকে দেখি, এ কি কোনও ফরাসিনী মা যাকে ওই অনিশ্চয়তার, প্রাকৃতিক মুখব্যাদানের মুহূর্তে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি? আর তার অনবদ্য প্রতিরূপ চলচ্চিত্রের বহুমাত্রিকতায় চলমান সময়ে খোদাই করলেন কোন শিল্পী, রদ্যাঁ না সত্যজিৎ, না দুজনেই, না তাঁরা কেউ নয়, শিল্পের নিজস্ব অন্বয়ে নিজে থেকেই তা বিধৃত হয়ে যায়! অলোকরঞ্জনের শব্দ চুরি করে বলা যায়, শিল্পের দুই ডানার এ এক নিপুণ উড়াল।

আমরা সবিস্ময়ে দেখেছি, *Dreams* (১৯৯০)-এর কুরোসাওয়া সোজা ভ্যান গখের ক্যানভাসে উঠে যান। সত্যজিৎ-ও হাঁটেন কুয়াশাঢাকা পাহাড়ের বিশাল বৃক্ষরাজির ভেতর দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘায়, হাতে তুলি আর রং। জাঁ রনোয়ারের ছবির সত্তার সঙ্গে সত্যজিতের ছবির মিলের কথা জেনেছি আমরা, কিন্তু কেউ কেন দেখিনি পিয়ের রনোয়ারের 'উঁচু ঘাসের ভেতর দিয়ে উঠে যাওয়া রাস্তা' (*Chemin montant dans les hautes herbes* ১৮৭২-৭৫) দিয়ে কাশফুলের মাঠে অপুদুর্গার হাঁটা, রেলের লাইনের দিকে, হুবহু যেভাবে কুরোসাওয়ার যুবকটি ভ্যান গখের ক্যানভাসে উঠে পড়ে। অথবা কখনও মনে হতে পারে ভূপতি আর চারুকে নিয়ে এদুয়ার মানের ক্যানভাসে সমুদ্রতীরে বসিয়ে দেন

সত্যজিৎ (নাকি তখনও ছবিটি দেখেনইনি তিনি, সুরে সুর মিলে গেছে কীভাবে), যেখানে মানের স্ত্রী ও ভাই চারু-ভূপতির অন্তবর্তী নিস্তব্ধতা ও সমুদ্র-ঢেউয়ে মিলেমিশে যায়। যারা প্যারিসের ম্যুজে দরসে-তে মানের 'সমুদ্রতীরে' (*Sur la plage*, 1873) দেখেছেন অথচ 'চারুলতা'র কথা ভেবে বিদ্যুস্পৃষ্ট হননি তাঁরা শিল্পের অন্তর্বলয়ের খোঁজ রাখেন না। কী নিখুঁত এক ওই দুটি ফ্রেম! কী নিখুঁত এক ওই চারটি মানব-মানবীর আর্তি।

ভাস্কর ও চিত্রকরের চোখ দিয়ে দেখা এ এক অন্য অতলতা, ভিন্ন এক মাত্রা। অথচ প্লাস্টিক গুণ সত্ত্বেও কোথাও ভারী হয়ে থেমে যাচ্ছে না চলচ্চিত্রের ডানা, অন্য অনেকের ক্ষেত্রে যা হতে পারত।

পাশাপাশি ফ্রেমের ভেতরকার চলমান চিত্রপট আঁকতে গিয়ে সত্যজিৎ যে বহুসুরের সমন্বয়কে অনুভব করতে চান সেকথা স্বীকার করেছেন নিজে:

> ছন্দ গতি নৈঃশব্দ্য মিলিয়ে চলচ্চিত্রের যে একটা সাংগীতিক দিক আছে সে-সম্বন্ধে আমি সব সময়ই সচেতন। আমি মোৎসার্টের ভক্ত। 'চারুলতা' ছবির মেজাজ ও গঠনশৈলীতে মোৎসার্টের প্রভাব আছে।...*

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র নির্মাণ প্রসঙ্গে 'রন্দো' (Rondo)-র ধাঁচে একটি প্রধান সুরের বিচিত্র বিন্যাসের কথা বলেছিলেন তিনি। অথবা বেঠোফেনের তাৎপর্য তাঁর কাছে কী তা বোঝাতে গিয়ে সংগীত ও চলচ্চিত্রের অনিবার্য ও স্বতোশ্চল সম্পর্কের কথা।

কিন্তু তাঁর ছবিতে ভাস্কর্য ও চিত্ররেখার সুর বোনার কথা আলাদা করে বলেননি। নিজের কথা বলতে গিয়ে নন্দলাল বা পিয়ের বনার-এর শিল্পবীক্ষার প্রসঙ্গ তুলেছেন। হয়তো এই বহুকৌণিকতার ইশারাটুকু আরও ভাল করে বুঝতে রদ্যাঁর নির্মিতির কাছে পৌঁছতে হয় আমাদের।

আন্তঃসাংস্কৃতিক বয়নের এই ভেতরের ইতিহাসটুকু আরেকটু সম্পূর্ণ করে তোলে আমাদের দেখা।

১৯৯৪

---

* বর্তমান আলোচককে লেখা।

বাংলা অনুবাদের সমস্যা

বাংলায় অনুবাদের সমস্যা নিয়ে কয়েকটি কথা লিখতে বসেছি। কিন্তু প্রথমেই বলে নিই যে, আমি অনুবাদ-বিজ্ঞানী বা অনুবাদ-দার্শনিক নই এবং আমি জানি যে অনুবাদ নিয়ে তত্ত্বায়ন শুধু অযথা যানজটের সৃষ্টি করে, যা অনুবাদ-তাত্ত্বিককে বেঁচে থাকতে সাহায্য করলেও অনুবাদককে তেমন কোনও সাহায্য করে না। সুতরাং, আমি এখানে অনুবাদতত্ত্ববিদদের অনুবাদবিষয়ক কচকচি শুনিয়ে আপনাদের বিভ্রান্ত করব না। অনুবাদ নিয়ে এলেন শুকে, আঁতোয়ান বেরমান, মিশেল বালার, ফ্রেদি প্লাসার অথবা আঁপারো য়্যুরতাদো আলবীরের নানান ভাবনা আমাদের খুব কাজে লাগবে বলেও আমার মনে হয় না। আমি শুধু বাংলাভাষী এক অনুবাদক ও অনুবাদ-পাঠক হিসেবে আমার ব্যক্তিগত ভয়ভাবনাকে পেশ করব।

আমরা সবাই জানি জানলা বন্ধ হয়ে গেলে কী ভয়ংকর হয়ে ওঠে আলোবাতাসহীন জীবন, আর 'অনুবাদ' ও 'জানলা' কথা দুটো যখন ভাষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমার্থক, তখন দেখা দরকার জানলা খোলে না কেন, বা খুললেও এত কম খোলে কেন! জানলা না খুলে বেশ আছি ভাবলে সেটা আত্মহননের সামিল। তা ছাড়া সতেরো শতকের বিশিষ্ট জীবনদ্রষ্টা লা রোশফুকো তো মনেই করিয়ে দিয়েছেন: 'বোকা বনে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হল নিজেকে অন্যদের চেয়ে চালাক ভাবা।'

অনুবাদ ছাড়া আমাদের চলবে না। আমরা গীতা, বাইবেল, মহাভারত, রামায়ণই হোক, গ্রিক ট্র্যাজেডি, মোপাসাঁ, চেখভ বা তলস্তয়, ইবসেন, কাম্যু, কাফকা, সার্ত্র, ব্রেশট হোক, অথবা ফুকো, দেরিদা, লেভি-স্ত্রোস, মার্কেস, একো কিংবা মার্ক্স-লেনিন... যতটুকু জানি, অনুবাদ পড়েই জেনেছি। যদিও সেগুলি ইংরেজি অনুবাদ, বাংলা অনুবাদ নয়, যেন আমাদের প্রাক্তন ঔপনিবেশিক সিংহ-প্রভুর ভাষা বলে ইংরেজি পাঠটি মূলের মতোই অভ্রান্ত, আর বাংলা ভাষায় কদাচিৎ অনূদিত পাঠটি নিছকই অনুবাদ—যার বিশ্বাস্যতা নেই, যার কোনও ঐতিহ্য একুশ শতকেও কোনও মতেই গড়ে ওঠেনি। যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃজনসাহিত্যের থেকে আলাদা, সেটা একটা হীনতর রচনা, যা সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য নয়। আর বাংলা ভাষার অনুবাদক? তাঁর কোনও পরিচয় আছে? তাঁর আলাদা কোনও স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা আছে? তার বাঁচামরা কি কোনও ভাবে সারস্বত সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

মনে রাখতে হবে, অনুবাদ সম্পর্কে এই অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার দিকটি অনুবাদ ও অনুবাদকের একটি বৃহত্তর মৌলিক সংকটের রূপরেখাকে তুলে ধরে।

আমরা যেন অবোধ শিশু, তাই কোনও দিন জানিনি, জানতে চাইনি, জানা ও জানানোর দরকার বোধ করিনি মূল রচনাগুলির নরওয়েজিয়, রুশ, জার্মান, ফরাসি নাম কী ছিল। ইংরেজির দুরতিক্রম্য পাঁচিল অতিক্রম করে মূল রচনা তার মূল চরিত্র নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়তো আমাদের কাছে অজানা থেকে গেছে। 'সব রাঙা কামনার শিয়রে সে দেয়ালের মতো এসে জাগে'— এই দেয়াল যেন ইংরেজি ভাষা। এ ভাষার নিজস্ব ভাষাবৈশিষ্ট্য তো বটেই, নিজস্ব রাজনীতি যে অনেক সময় মূল টেক্সটকে বিকৃত করে দিতে পারে তার বহু উদাহরণ আমি নানা ফরাসি টেক্সটের ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে দেখেছি। তার ফলে কোনও এক লেখকের বা চিন্তকের ভিন্ন এক মূর্তি উপস্থিত হয় আমাদের সামনে। এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রম্যাঁ রলাঁ।

১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে ইস্টারের দিন প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণারত তরুণ ঐতিহাসিক কালিদাস নাগকে রলাঁ লিখেছিলেন : 'ভারতের দুর্ভাগ্য যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সংস্পর্শে এল ইওরোপের সবচেয়ে সংকীর্ণমনা মানুষদের, যারা নিজের অনুভূতিহীনতার খোলসের মধ্যে কারারুদ্ধ হয়ে থেকেছে, যারা সবচেয়ে কম পেরেছে নিজেদের মানিয়ে নিতে। অন্যদিকে, লাতিন, জার্মানীয় ও স্লাভীয় ইওরোপ ভারতপ্রতিভাকে বোঝা ও ভালবাসার জন্য অনেক বেশি প্রস্তুত। কিন্তু তাদের দেখা হওয়ার সুযোগই হল না।' এক 'নতুন ভারতে'র সঙ্গে একদিন সেই স্বপ্নের সংযোগসেতু তৈরি হবে বলে আশা করেছেন রলাঁ। বলেছেন, 'পুনরুত্থানের এই পবিত্র দিনটিতে এই আশাই আমি বুকে ধরে আছি।'

প্রাথমিক ভাবে দু তিন দশক অনেকরকম হলেও সে-সম্ভাবনা নিছক সম্ভাবনাই থেকে গেছে, ইংরেজিতে অনুবাদ হয়নি বলে আমরা জানতেই পারিনি যে স্বয়ং রলাঁ শুধু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অসাধারণ জীবনীকার নন,

তিনি বেটোফেন, তলস্তয়, মিকেলাঞ্জেলো, হান্ডেল, শার্ল পেগি ও চিত্রশিল্পী মিয়েরও জীবনীকার। ওই বিস্তার ছুঁতে পারেনি, ছুঁতে চায়ওনি ইংরেজি ভাষা, সুতরাং যে-মানুষটি সব অপ্রতিরোধ্য বাধা লঙ্ঘন করে আমাদের এত কাছে এসেছিলেন, তাঁকে হয়তো আমরা তেমন করে চিনতেই পারিনি। জানতেই পারিনি যে তাঁর অবিস্মরণীয় বিপ্লব নাট্যমালায় এমন এক শক্তিশালী মানবতরঙ্গকে ('la marée humaine') মঞ্চের ওপর এনে ফেলেছিলেন রলাঁ, যা তাঁর 'জনসাধারণের থিয়েটার' সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তার এক বলিষ্ঠ প্রয়োগ।

রলাঁর ভাষায় : 'আমি যেন একটা গাছ যার অসংখ্য শাখাপ্রশাখা, আর তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিকশিত শাখাটিই হল নাটক। নাটক আমার কাছে উপন্যাসের চেয়েও অনেক বড় শিল্পমাধ্যম, কারণ তা কাঠামোর রদবদল বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছাড়াই গহন মনের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপকে উন্মুক্ত করে দিতে পারে। ...জাঁ-ক্রিস্তফের মধ্যে যে মহাকাব্যগুণ আছে (যা আমার সৃষ্টিকর্মের সারাৎসার) তাকেই আমার অভীষ্ট থিয়েটারের প্রধান চালিকাশক্তি বলা যায়।' (২১ ডিসেম্বর ১৯২২) ইংরেজি অনুবাদের ওপর অবোধ শিশুর মতো নির্ভরতা যে কতখানি ক্ষতিকারক হতে পারে এটি তার একটি বড় উদাহরণ। অন্য উদাহরণও আছে।

যেমন, ধরা যাক, ফরাসি কবিতার অন্বেষণের কথা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভিক্তর য়্যুগো, আলফঁস দ্য লামারতিন, আলফ্রেদ দ্য ভিন্যি বা আলফ্রেদ দ্য ম্যুসের রোম্যান্টিকতা যখন জীবনের সব অন্তর্চিহ্ন ছুঁতে পারল না, তখন প্রচলিত দেখার ধরনকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কবিতা ও বাঁচাকে এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে মিলিয়ে দেওয়ার অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই অভিযান খুলে দিয়েছিল হাজার জানালা। কখনও বিপর্যস্ত করে দিল ইন্দ্রিয় নতুন বাস্তবের খোঁজে, কখনও পদ্যের সীমাবদ্ধতায় তৃপ্ত না থেকে গদ্যের বিপজ্জনক এলাকায় পা বাড়াল। কখনও যুক্তির তোয়াক্কা না করে বুঝতে চাইল স্নায়ুর যুক্তি। ফরাসি ভাষায় যে স্নায়বিক ভাঙচুর তাকে ছোঁয়ার মতো কলকব্জা নেই ইংরেজি অনুবাদকের, ইংরেজি ভাষা স্বভাবতই কঠিন ও পুরুষালি, রোমান্স-ভাষাগুলির মতো নমনীয়তা তার নেই। তার সেই স্বাভাবিক অ্যান্টেনা নেই যা দিয়ে ওই স্নায়বিক আবিষ্কারগুলিকে ধরা যায়।

পেঙ্গুইনের ইংরেজি অনুবাদগুলি অনেক ক্ষেত্রেই প্রতীকী ফরাসি কবিতার দফারফা করেছে। কাজেই এগুলির ওপর নির্ভর করে বাংলা ভাষা ও বাঙালি

মনকে সমৃদ্ধ করার কোনও প্রকল্প যদি আমাদের থেকে থাকে তা কতদূর সফল হতে পারে বলা মুশকিল। বুদ্ধদেব বসু যখন বোদল্যেরের কবিতার অনুবাদের অনুবাদ করলেন তা ইংরেজি ও বাংলার যৌথ মুদ্রাদোষে এমন এক রূপ নিল যা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বাঙালি পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও বোদল্যেরের অপরূপ সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতাকে ভাল করে ছুঁতে পারল না।

জীবনের জটিল ও অন্তহীন রহস্যকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে বিশ শতকের ফরাসি কবিতা যেন বারবার ভেঙে ফেলতে চেয়েছে সমস্ত আয়না। ইঙ্গিতময়তাকে তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়েননি। এই নিরিখে গীয়োম আপোলিনের, ব্রেজ সাঁদ্রার্স, মাক্স জাকব, স্যাঁ-জন পের্স, পিয়ের র‍্যভের্দি, জ্যুল স্যুপেরভিয়েল, ফ্রাঁসিস পঁজ, আঁরি মিশো ও য়্যজেন গিলভিক যেন এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছেন। বিংশ শতাব্দীর এই দুঃসাহসিক আবিষ্কার-অভিযান প্রায় একেবারেই অনুবাদ করা হয়নি ইংরেজি ভাষায়, এমনকী কবি জাক প্রেভেরের রচনা, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও পরে জনপ্রিয়তার সমস্ত পুরনো মাপকাঠি ভেঙে দেয়, তারও তেমন অনুবাদ হয়নি ইংরেজিতে। তেমনভাবেই সারা কীর্শ কেন অনুবাদ করা হয়নি জার্মান থেকে ঈশ্বর জানেন। আর জানেন ইংরেজ-মার্কিন প্রকাশনার কুশীলবেরা।

সুতরাং ক্রমাগত ইংরেজির মাধ্যমে বিশ্বকে চিনতে চাইলে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির আশা কম। কারণ বিশ্ববাজারে ইংরেজি একটি প্রধান খেলোয়াড়, মধ্যস্থতার সময় তা সচেতন-অবচেতনভাবে তার রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে, আড়ালে আড়ালে একটা খেলা চলে। এর উদাহরণ তো একটু আগেই দিয়েছি।

এ প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প মনে পড়ছে। গী দ্য মোপাসাঁর 'দ্য নেকলেস' গল্পের টানটান কাহিনিতে কে মুগ্ধ হননি? বোধ করি, বাংলা সাহিত্যে মোপাসাঁর ওই ছোটগল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল। পরে কিছুটা ফরাসি শিখে আমি মূল ছোটগল্পটির অনুসন্ধান করি, এবং ওই নামে কোনও গল্প নেই জানতে পারে হতভম্ব হয়ে যাই। ফরাসিতে যে গল্পটির সঙ্গে 'দ্য নেকলেস' গল্পের মিল সেটির নাম 'La Parure' বা সাজ, অলংকার। অর্থাৎ এতদিন ধরে মূল গল্পের যে দার্শনিক বার্তা—সাজসজ্জার তুচ্ছতার পেছনে ছুটতে গিয়ে জীবন নষ্ট করার কি কোনও মানে হয়? —তাকে ইংরেজি

ভাষান্তরে মুছে দিয়ে গল্পটির দৃষ্টিকোণকে সংকীর্ণ করে ফেলে মূল কাহিনি ও কাহিনিকারের এক ভুল ছবি উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইংরেজির ক্ষেত্রে এই ধরনের 'পেশাদারী বিকৃতি'-র অসংখ্য উদাহরণ আছে। ১৯৭০ সালে প্যারিসের ল্য সই প্রকাশনা-সংস্থার Points নামক গ্রন্থমালায় প্রকাশিত রলাঁ বার্ত-এর যুগান্তকারী ফরাসি বই *Mythologies*-র সঙ্গে ইংরেজি *Mythologies*-এর অনেক অমিল। সেখানেও ইচ্ছেমতো গ্রহণবর্জন করা হয়েছে। একথা অবশ্য ইংরেজি জানা পণ্ডিতেরা জানেন না, তাঁদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে তাঁরা খুব খুশি। সম্প্রতি মিশেল ফুকোর রচনার একটি ইংরেজি অনুবাদ *Fearless Speech* ফরাসিতে খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারলাম ওই নামে আদৌ কোনও বই নেই। কিছু প্রবন্ধ নিয়ে অনুবাদ করে ওই নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ওই ইংরেজি ভাষান্তরগুলি ফরাসি দর্শন ও সাহিত্যকে এক বিশেষ ভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছে, যা মূল লেখকের উদ্দেশ্য নয়।

সুতরাং জানলা খুলে সুবাতাস এনে বাংলা ভাষাকে সজীব করার জন্য বাংলাতেই সরাসরি অনুবাদ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ইতিহাসের এই বিশেষ মুহূর্তে, বাংলা ভাষাকে তরলীকরণ থেকে বাঁচাতে গেলে এই বিরাট কাজটি আমাদের করতে হবে।

আমাদের সর্বপ্রধান অসুবিধে হল বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে হীনমন্যতাজনিত অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা। ইংরেজি-জানা (এবং অনেক ক্ষেত্রেই, অন্য কিছু না জানা) বাঙালি বাংলা অনুবাদের খুঁত দেখিয়ে আনন্দ পান। যেখানে কখনও কখনও সম্পূর্ণ বাক্য বাদ পড়ে, কঠিন লাগলে অনুচ্ছেদও! এ এক অচ্ছেদ্য চক্র। চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতা ও যথেচ্ছাচারের এমন সব উদাহরণ দেখে শ্রদ্ধা জাগার কোনও কারণ নেই।

আগেই বলেছি, 'শিক্ষিত' বাঙালির কাছে বাংলায় কদাচিৎ অনূদিত পাঠটি নিছকই 'অনুবাদ', যার বিশ্বাস্যতা নেই, যার কোনও সম্মানজনক ঐতিহ্য আজও তৈরি হয়নি। অনুবাদ আজও বাংলায় একটি দ্বিতীয় শ্রেণির রচনা বলে গণ্য। দ্যনি দিদেরোর 'জাক ল্য ফাতালিস্ত'-এর বাংলা ভাষান্তর কুড়ি কপিও বিক্রি হয়নি। ইংরেজি থেকে অনূদিত জাঁ-পল সার্ত্র-এর 'সত্তা ও শূন্যতা' পয়সা খরচ করে কে কিনবেন জানি না। পৃথিবীর সঙ্গে সেতুবন্ধনের এই অপরিহার্য মাধ্যমটি বাংলায় এত অশ্রদ্ধার বস্তু হয়ে গেল কেন? আমার বিনীত

মত, পরিভাষার প্রশ্ন উঠবে পরে। সততা, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা থাকলে সেটা খুব বড় সমস্যা হবে না। আগে তৈরি হোক ন্যূনতম বিশ্বাস্যতা, আগে তৈরি হোক একটি স্কুল। আগে তৈরি হোন অনুবাদক, যিনি সম্মান আদায় করে নিতে পারবেন এবং যাঁকে সমাজ সম্মান করে। যেমন করে ফ্রান্সে, ইংলন্ডে, জার্মানিতে, জাপানে। তখন হয়তো বাংলায় অনুবাদ-জগতের এক নিজস্ব পরিকাঠামো তৈরি হয়ে যাবে। আর তখন এই আলোচনাচক্রে পরিভাষা-নির্মাণের এক শক্ত ভিত্তিভূমি তৈরি হতে পারবে।

অথচ বাংলায় অনুবাদের বিশিষ্ট এক ধারা তৈরি না হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। উনিশ শতকে যে আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা নিয়ে রনেসাঁসের অন্বেষণ শুরু হয়েছিল, তা অনুবাদকে কোনও ভাবেই ছোট করে দেখেনি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি 'শকুন্তলা' (১৮৯৯), 'উত্তররামচরিত' (১৯০০), 'রত্নাবলী' (১৯০০), 'মালতীমাধব' (১৯০০), 'মৃচ্ছকটিক' (১৯০১) প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদের পাশাপাশি ফরাসি থেকে মলিয়েরের 'ল্য বুর্জোয়া জাঁতিয়ম'-এর বাংলা অনুবাদ 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), পিয়ের লোতির 'ল্যাঁদ সাঁ লে জাঁগ্লে'-র বাংলা ভাষান্তর 'ইংরাজ-বর্জিত ভারতবর্ষ', নানা ছোটগল্প ও কবিতা এবং মারাঠি থেকে 'ঝাঁসির রাণী' (১৯০৩) ও বালগঙ্গাধর তিলকের 'গীতারহস্য' অনুবাদ করতে পারেন, মাইকেল মধুসূদন যদি মূল গ্রিক থেকে 'হেক্টরবধ' (১৮৭১) অনুবাদ শুরু করে থাকতে পারেন, স্বয়ং বিদ্যাসাগর যদি হিন্দি থেকে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), ইংরেজি থেকে শেকসপীয়ারের গদ্যানুবাদ, সংস্কৃত থেকে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' বা ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'-এর বঙ্গীকরণ করতে পারেন, তবে আজ একুশ শতকে অনুবাদের জগতে এই নৈরাজ্য, যথেচ্ছাচার ও চিন্তাদৈন্য কেন? ইবসেন অবলম্বনে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'বীরবিক্রম' (১৯২২), বা যামিনীকান্ত সোমের 'খেলাঘর' (১৯২২), শান্তি বসুর 'দশচক্র', প্রেমেন্দ্র মিত্র বা বুদ্ধদেব বসুর কাম্যু বা লরেন্স, মূল ফরাসি থেকে অরুণ মিত্রের অনুবাদে ভলতেরের 'কাঁদিদ'—যা যে কোনও ইংরেজি অনুবাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি নির্ভরযোগ্য ও সুখপাঠ্য—এবং জার্মান থেকে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদে গ্যোয়েটের 'দিভান' বা ব্রেশটের কবিতা সেই জমি তৈরি করতে চেয়েছে যা অনুবাদসংস্কৃতির পক্ষে অপরিহার্য। লোকনাথ ভট্টাচার্য, পুষ্কর দাশগুপ্ত ও নারায়ণ মুখোপাধ্যায় বিক্ষিপ্তভাবে চেষ্টা করেছেন।

তবু ইংরেজির পেশী-সঞ্চালনের নীচে চাপা পড়ে গেছে এইসব বিক্ষিপ্ত একক প্রয়াস।

আমার আশঙ্কা, বিশ্বায়ন ও বিশ্বায়নের প্রধান অস্ত্র ইংরেজি বাংলা অনুবাদের সমস্ত সম্ভাবনাকে নির্মূল করে দেবে। ইংরেজি অনুবাদের ওপর অতিরিক্ত আস্থা বাংলা অনুবাদের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। এই সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। কিছুদিন আগে ফ্রান্সে এক আলোচনাচক্রে কয়েকজন জার্মান, ফরাসি, সুইডিশ, চিনে ও জাপানি অনুবাদকের কাছে জানা গেল পৃথিবীর নানা দেশের দর্শন ও সাহিত্যগ্রন্থ জার্মান ও ফরাসিতে তো বটেই, জাপানিতেও মূল ভাষা থেকে বিস্তৃতভাবে অনূদিত হয়েছে। জাপানিতে রম্যাঁ রলাঁর রচনাই অনূদিত হয়েছে ৪৩ খণ্ডে। এর জন্য বিশিষ্ট প্রকাশকেরা আছেন। এবং সর্বোচ্চ সম্মানমূল্য আছে। মোট কথা, অনুবাদ ও অনুবাদক সেখানে পার্শ্বরেখায়িত নন। আমার বলতে লজ্জা হল, অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের কোনও প্রশিক্ষণকেন্দ্র পর্যন্ত নেই! আর সম্মানমূল্য? সেকথা উল্লেখ না করাই ভাল! (বাংলায় ভলতেরের 'কাঁদিদ'-এর অসামান্য অনুবাদক কবি অরুণ মিত্রকে আমি অনেকবার প্রশ্ন করেছি, আর কেন তিনি অমন নজির সৃষ্টি করলেন না? তিনি প্রকাশকদের যে আচরণের কথা বলেছিলেন তা কহতব্য নয়। আর যে এককালীন পারিশ্রমিক তিনি এক সর্বভারতীয়, সরকারি প্রকাশকের কাছে পেয়েছিলেন তা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করা যাবে না।)

বাইরের সমস্যার ওপর আছে ঘরের সমস্যা। একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ অনুবাদের যে কী যন্ত্রণা সেটা সৎ অনুবাদক মাত্রেই জানেন। একটি রচনাকে এক ভাষাপদ্ধতি থেকে অন্য ভাষাপদ্ধতিতে, একটি সাংস্কৃতিক মানচিত্র থেকে অন্য একটি সাংস্কৃতিক মানচিত্রে, একটি semantic network থেকে অন্য একটিতে, যার অন্য একটি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস আছে, পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে যন্ত্রণাকে স্নায়ুতে বহন করতে হয় তার প্রস্তুতি সবসময় আমাদের থাকে না। লেখক স্বাধীন (অবশ্য তাত্ত্বিকরা বলবেন, স্বাধীন নয়, কিন্তু সেটা অন্য প্রশ্ন), অনুবাদকের শরীরমন শেকল দিয়ে বাঁধা। মনকে বাঁধা কি সহজ কাজ? শ্লেগেল বলেছিলেন, অনুবাদকের সঙ্গে লেখকের এ এক রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বযুদ্ধ—a deadly duel, যেখানে যে কোনও একজনের মৃত্যু হবে, লেখক বা অনুবাদক। এই হত্যা এড়াতে অনুবাদককে এক ভারসাম্য আনার চেষ্টা করতে হয়। কাজেই সিরিয়াস অনুবাদ সবসময়ই এক অসম্ভব প্রকল্প।

মূলের চরিত্র বজায় রাখা ও একই সঙ্গে তাকে নিজের করে তোলা, দুটি বিপরীত অবস্থানের সীমাহীন মানসিক চাপের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই ও চাপান-ওতোর করার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি। তত্ত্বের বিপুল আয়োজন অনুবাদ-সমস্যাগুলি সমাধানে সাহায্য করে না। তাঁর কাজের টেবিলে তিনি একা। অন্য এক ভাষায় রচিত টেক্সটের খাঁজের মধ্যে আরেকটি মনোভাবনার, আরেকটি ইতিহাস ও ভূগোলের ভিন্ন এক লিখনকে চারিয়ে দেওয়া যায়, এই আশাতে তিনি কাজ করে চলেন। মূল ভাষা ছাড়া এটা হতেই পারে না।

যেভাবে কনস্ট্যানস গার্নেট রুশ সাহিত্যের ইংরেজি পুনর্নির্মাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, বা এডউইন মুর ও তাঁর স্ত্রী কাফকা এবং জাস্টিন ওব্রায়ান কাম্যুর লিখনে, অথবা গ্রেগর রাবাসা গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের রচনায়, সেরকম কি বাংলায় পারব আমরা? কে দেবে বিদেশি প্রকাশকের মোটা রয়্যালটি? কে জোগাবে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক? আমরা তো পড়ে পাওয়া দুআনির ওপর নির্ভরশীল! কোন শিক্ষিত প্রকাশক সম্মান জানাবে সেই গ্রন্থকে? কে দায়িত্ব নেবে বিপণনের? যখন এত জল মিশে গেছে বাংলা ভাষায়, যখন তা ধারণ করতে পারছে না পরিবর্তমান পৃথিবীর নতুনতম ভাবনার বিদ্যুৎরেখা, তখন বাঁচার জন্য বিজ্ঞান দর্শন ও সাহিত্য থেকে অনুবাদের এক প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবতেই হবে আমাদের। যেখানে আইনি অনুমোদন, চুক্তিপত্র, পারিশ্রমিক প্রভৃতি ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে কাজের জিনিস, যেমন বইপত্র বা অভিধানের অভাব হবে না। ভাষা সমস্যা-সংক্রান্ত আলোচনাচক্র ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এবং সেখানে অনাবশ্যক সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না।

সর্বোপরি, সেই কাজগুলি পাঠকের কাছে পৌঁছবে। পার্শ্বরেখার বাইরে থেকে মূলস্রোতে যুক্ত হবে অনুবাদ। আমাদের সাহায্য করবে এক অন্য স্রোত সৃষ্টি করতে।

হয়তো সেই দিন আমরা খুঁজে পাব, অধরা এক সুরসাম্য, এক মেরুমৈত্রী।

২০০০

অন্য জলবাতাস অন্য তুলিতে

অশোক মিত্র তাঁর আত্মজীবনী 'তিন কুড়ি দশ'-এর শুরুতে বায়রনের 'ডন জুয়ান'-এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন: 'But the fact is that I have nothing planned/Except perhaps to be a moment merry.' তিনি ছিলেন সেই আজ বিরল হয়ে আসা সুসভ্য বাঙালি মনীষার সদস্য যাঁরা সাফল্যের গা ঘিনঘিনে মিষ্টতাকে হেলায় পরিহার করে, লাভ-লোকসানের অঙ্ককে তোয়াক্কা না করে খোলা মনে নিজস্ব রুচি অনুযায়ী মননের চর্চা করে গেছেন।

তাঁকে যারা চিনতুম জনগণনাতত্ত্ববিদ, প্রশাসক, সমাজতাত্ত্বিক, গবেষক ও অধ্যাপক হিসেবে, শিল্পরসিক ও ঐতিহাসিক হিসেবেও যিনি পথিকৃৎ বলা চলে ('purified the dialect of the tribe' কথাটা তো নিশ্চয়ই তাঁর শিল্পসমালোচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য), সেই অশোক মিত্রই তাঁর দীর্ঘ ও বিচিত্র কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ইংরেজিতে উপস্থাপন করেছিলেন বাংলা সৃজনসাহিত্যের অসামান্য নমুনা: রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' ও কমলকুমার মজুমদারের 'গোলাপসুন্দরী', এবং সমর সেনের ব্যতিক্রমী আত্মজীবনী 'বাবু বৃত্তান্ত'। এই সুচিন্তিত, রুচিমান নির্বাচন থেকে আধুনিক বাঙালি মনের বহুমুখিতা ও বহুকৌণিকতার রূপরেখাটি ফুটে ওঠে।

বাংলায় অনুবাদসাহিত্য সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে ও মানে এত দীন ও সাধারণভাবে এতই অনির্ভরযোগ্য যে তা আমাদের চরিত্রের একটি অস্বাস্থ্যকর দিককে তুলে ধরে। কিন্তু উলটোদিকে, বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের ব্যাপারে (অন্য ভাষার কথা বাদ দিচ্ছি)—যাকে বলে translating out—ইংরেজি জানা বাঙালি যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে, তা সে অনাসক্তি বা আত্মবিশ্বাসের অভাব যে কারণেই হোক না কেন, তাকে দুঃখজনক বললে কম বলা হয়। অথচ অবাংলাভাষীর হাতে বাংলা সাহিত্যের 'সঠিক' মূল্যায়ন না হলে অভিযোগ করার জন্য আমরা সর্বদা আঙুল উঁচিয়ে প্রস্তুত। সেদিক থেকে অশোক মিত্র কতিপয় ব্যতিক্রমের একজন।

১৯৬৩ সালে সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত 'চতুরঙ্গ'-এর তর্জমার ভূমিকা থেকে জানতে পারছি কৃষ্ণ কৃপালনীর উৎসাহে তিনি ওই কাজে হাত দেন। যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনের দশকে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র (পরে অক্সফোর্ডের মার্টন কলেজের), তাঁর ভাষায় 'ধৃষ্টতার সীমা অতিক্রম করেও' প্রচণ্ড কৌতুক করতে ভয় পাননি ('তিন কুড়ি দশ', ১ম খণ্ড, দেজ, পৃ. ৭২), পূর্বনির্ধারিত সংগৃহীত ধারণা যাঁর পছন্দ নয়, তিনিই পরে 'চতুরঙ্গ' (১৯১৪-১৫)-র ছিপছিপে, নির্মেদ ঋজুতা ও পরিমিতির পুনর্নির্মাণের কঠিন পথে পা বাড়িয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্য-পঞ্চাশে লেখা এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটির চারভাগে বিন্যস্ত সাংগীতিক কাঠামো (সূচনা, অগ্রগতি, বৈচিত্র্য ও পুনর্ভাবনা), তার ছন্দ ও গতিময়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অশোক মিত্র তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন:

> I believe it is this underlying musical form, more tersely phrased and constructed in 'Chaturanga' than perhaps in any other of his early stories, except 'Nastanir', that gives the book its rich texture, its many voices, its symbolic quality. And because musical form provides the frame without intruding as a funeral design and because it is always there, hidden, unseen, it gives the strangely agitated, stormy world of 'Chaturanga', its still point, its privacy...

তাঁর এই সজীব অনুসৃজনটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে সাংগীতিক ঠাসবুনোনকে অতিক্রম করে এই still point, এই privacy-কেই অনেকটা ছোঁয়া যাচ্ছে যেন। নিচুগলার কথোপকথন, অর্ধস্ফুট স্বগতোক্তি। এক অতি-ব্যক্তিগত মনোজগৎ—যার ওপর আছড়ে পড়ছে অর্ধশতাব্দীর বঙ্গজীবনের খরস্রোত। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পাঁচ দশকে বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, নিবেদিতার চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত এই উপন্যাসের চরিত্রদের (জেঠামশায়, শচীশ, দামিনী) মধ্যে ফিরে এসেছে। এই ইতিহাসকে বিধৃত করার যে অন্তর্তাগিদ অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই তাঁর ভাষাকে দিয়েছে ইঙ্গিততীক্ষ্ণ পরিমিতি, বহমানতা, স্থাপত্যগুণ আর চিত্রকল্পের জোর।

অনুবাদের পক্ষে সমগ্র রচনাটিই একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ, ভিন্নধর্মী চরিত্রগুলির ঋজুতা পুনর্নির্মাণের কথা ভাবুন, কিংবা ধরা যাক ননীবালার ছোট্ট বাক্সয় চিঠিখানি। কিন্তু সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য মনে হয় গুহার ভেতর শচীশের আত্মোপলব্ধির বর্ণনা। বাংলা গদ্যের ওই অবিশ্বাস্য সাফল্য, ওই আর্তি, ওই ঝড়—এলিয়টের

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষায় যাকে বলা যায়, 'raid on the inarticulate'—ইংরেজিতে কোন তীব্রতায় পৌঁছোতে পেরেছে তার উদাহরণ দিই:

...The darkness of the cave was like a black brute breathing its moist breath on the first primordial beast with neither eyes nor ears but only a vast hunger, eternally confined in the cave. It had no mind, no awareness of anything at all. Some bird, perhaps a bat, flew in or out from the dark into the dark, heavily flapping its wings. The flutter gave me the creeps all over.

I thought of coming out and sleeping in the open but had forgotten the way to the entrance of the cave. I crawled this way and that but each time my head struck the wall. Once I fell into a small pit where the seepage of the cave had collected in a little pool.

Finally I gave up and lay on the blanket. I felt as if the primordial beast put me into its dripping, salivating mouth, barring all escape. It was but one black hunger that would lick my flesh off, little by little until nothing was left. Its secretion was corrosive, quietly dissolving everything without a trace.

...Someone slunk away in the darkness. I thought I heard some sort of a sound. Was it a strangled cry?

অনুবাদক 'চতুরঙ্গ'-এর ভাষার নমনীয়তা ও আকুলতাকে শচীশ, শ্রীবিলাস, দামিনীর বিভিন্নতার সমস্ত তল ছুঁয়ে ধরতে চেয়েছেন। একে ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। নেওয়া যাক আর একটি অংশ, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ভাষার বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে এসে চৈতন্যপ্রবাহী গদ্যের উদাহরণ রেখে যাচ্ছেন:

চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলিও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনও ডাকের কোনও সাড়া, কোনও প্রশ্নের কোনও জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি; যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

It was infinitely bare and empty all around with no sign of any life. The waves of sand were as the sun, crouching like sentinels of the void.

Damini's heart sank as she stood in the centre of this pale, limitless white, which refused to answer questions or harken to calls. Everything about the place seemed to have been wiped down clean to a primeval dry whiteness, like a big 'No' under one's feet, devoid of sound or motion, of the red of blood or the green of vegetation, the blue of the sky or the ochre of the earth,—like the vast lipless smile or a skull, like some enormous dry tongue holding out one long petition of thirst to the unpitying and fiery sky.

দ্বন্দ্বের দুঃখ আর প্রত্যয়ের দৃঢ়তা 'চতুরঙ্গ'-এর অনুসন্ধানকে যে দ্বিমেরুতা দিয়েছে তা তুলনাহীন। বিশের দশকে রম্যাঁ রলাঁ যে বিশ্বগ্রন্থাগার (Weltbibliothek) নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটি শুরু করতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজের হাতে করা 'চতুরঙ্গ'-এর ফরাসি অনুবাদ দিয়ে। কেন তা বর্তমান অনুবাদ পড়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না।

শুনে পণ্ডিতেরা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠবেন হয়তো, তবু বলি: শচীশের সঙ্গে সমর সেনের কোথায় যেন মিল। বন্ধু সমর সেনের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অশোক মিত্র সর্বদা তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। 'তিন কুড়ি দশ'-এ তিনি তাঁকে র‍্যাঁবোর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, কারণ সমর সেন জানতেন কোথায় থামতে হবে। তাঁর ৭০-তম জন্মদিন (১৯৮৬) উপলক্ষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে অশোক মিত্র

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁরই 'বাবু বৃত্তান্ত' ইংরেজিতে অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেন। ওই সময় সমর সেনের সম্মানে যে সংকলনটি প্রস্তুত হয়েছিল এটি হয়তো তার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।

সমর সেনের বলিষ্ঠ চাঁছাছোলা গদ্যের স্বচ্ছতা, তাঁর অতি নিজস্ব ভঙ্গিতে আত্মকৌতুক (যা তাঁর কবিতারও প্রধান গুণ: মস্তিষ্ক দিয়ে অনুভব করার বিশেষ ক্ষমতা) ইংরেজিতে ধরতে পারা যার তার কর্ম নয়। এজন্য প্রয়োজন ছিল এক স্বচ্ছদৃষ্টি সমসাময়িকের, যিনি সর্বদা একই মত পোষণ না করেও একই সঙ্গে কাছ ও দূর থেকে সমকালীন পৃথিবী ও কুশীলবদের দেখেছেন। মুখবন্ধে অনুবাদক জানিয়েছেন ১৯৮৫-৮৬ সালে একটি ইংরেজি দৈনিকের সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই অনুবাদ পড়ে সমর সেন মন্তব্য করেন তাঁর 'chirpy Scottish Church voice' চেনা গেলেও তা 'filtered through a staid Presidency College accent'। এ ধরনের শিক্ষিত রসিকতা করার মতো মন কলকাতায় আর সহজলভ্য নয়।

এই একাগ্র পুনর্নির্মাণে ভালবাসার স্পর্শ লেগে আছে। অনুবাদকের একাকিত্ব ও বিষণ্ণতা এতে কমে, কাজটি স্বতঃস্ফূর্ত হয়। মনে আছে তরুণসুলভ কৌতূহলে প্রথমেই আমি বাবু বৃত্তান্তের প্রথম পৃষ্ঠায় বর্ণিত ঠাকুরদা দীনেশ সেনের কথার উত্তরে সমর সেনের 'পুরুষাঙ্গ বাঁধা' দেওয়ার প্রসঙ্গটি ইংরেজি অনুবাদে অশোক মিত্রের হাতে কী দাঁড়িয়েছে জানতে উৎসাহী হয়ে পড়েছিলাম। মন সম্পূর্ণ সায় না দিলেও পরে ভেবে দেখেছি অনুবাদকের অন্য উপায় ছিল না, 'mortgage my penis'-ই স্টাইলের সঙ্গে মিলবে ভাল। সমর সেনের ব্যক্তিত্ব কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে ইংরেজিতে তার উদাহরণ হিসেবে ১৯৭৩ সালে শীতকালে ভোর চারটেয় বাড়িতে পুলিশি হানার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া পেশ করছি:

> ...I never got to the bottom of this practical joke on a wintry dawn.
>
> I kept mum for fear some of my regular contributors to 'Frontier' might funk if they knew. A couple of close friends suggested that a protest should be lodged for so harassing an editor so early in the morning. But how would a protest over spoiling an editor's early morning sleep look when murder of teenage youths in gaol and police van and on the streets was patently the order of the day!

সমর সেনের এই 'candour' বাংলা না জানা দেশি-বিদেশিদের কাছে অজানা থেকে যেত যদি অনুবাদটি না বেরোত। তাছাড়া, প্রীতিশ নন্দীর ব্যর্থ ভাষান্তরে একসময় যাঁরা কষ্ট পেয়েছেন তাঁদের বলব *A Babu's Tale*-এর ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট কবিতার অনুবাদগুলি পড়ে দেখতে। আমি কেবল একটি নমুনা এখানে তুলে দিলাম:

'Amor Stands upon You'—Ezra Pound

Wherever you go,
In the stillness of a startled moment
You suddenly hear
Death's solemn ceaseless footfall
And where, after all, will you go on leaving me?
Wherever you go—
From the vast emptiness of the sky Jupiter's sharp eye
Will fall on Leda's white breast.

অশোক মিত্রের সম্ভবত শ্রেষ্ঠ অনুবাদটি কমলকুমার মজুমদারের 'গোলাপসুন্দরী'—ইংরেজিতে যার নাম 'Rose-Beauty' (প্যাপিরাস, ১৯৯২)। মুখবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে তিনি জীবনের এক সংকটের সময় কমলকুমারের সংস্পর্শে এসে লাভবান হয়েছিলেন। কমলকুমার তাঁর শেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'খেলার প্রতিভা' অশোক মিত্রকে উৎসর্গ করেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই অভিনব উপায় বেছে নিলেন অশোক মিত্র। এমনভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালির কখনও মনে হয় না কেন?

'গোলাপসুন্দরী' উপন্যাসের টেক্সট্‌টি তাঁকে ওয়াশিংটনের ফ্রিয়ার গ্যালারিতে জাপান রুমে রক্ষিত কোগেৎসু সোগানের (১৫৭৪-১৬৪৩) বাঁশির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল: 'Its uniqueness lay in its ability to produce, a kind of sound which has infinite resonance, is audible, yet inaudible.' কত বড় রসবোদ্ধা হলে, বাংলা ও ইংরেজিতে কতখানি কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকলে শব্দের এই অনুপুঙ্খময় উজ্জ্বলতা, এই কোমলতা ও দৃঢ়তা, এই সূক্ষ্ম নিপুণ তুলিটান অনুবাদে ফুটিয়ে তোলা যায়!

অশোক মিত্র ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় কমলকুমারের কাজে 'unification of sensibility'-র দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—'be it a full-length novel, or a 'novella' like the present one or a miniature.' লেখকের পাণ্ডিত্য (আমি বলব dilettantism), বহুবিষয়ে কৌতূহল, ভেনিসের গোলাপমুখী লেসের সঙ্গে ব্রাসেল্‌স্‌ ও আলাসঁ-র লেসের পার্থক্য করার ক্ষমতা অথবা লিওনার্দোর রঙের পারস্পেকটিভ-বিষয়ক তত্ত্ব বা গত তিন শতকে ফরাসি উপন্যাসের বিবর্তন সম্পর্কে সমান আগ্রহের উদাহরণ দেখিয়ে তিনি বলেছেন কমলকুমারের কাছে ভাষা শুধু কথিত বা লিখিত শব্দ ছিল না, ছিল অন্যান্য শিল্পের উদ্বোধন। এ এমন এক স্টাইল যাকে লেখকের চারিত্র্য থেকে আলাদা করা যায় না, যা প্রকৃতপক্ষে অননুবাদনীয়। এই টেক্সট্‌টির বহুকৌণিকতাকে ইংরেজি জানা পাঠকের সামনে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অশোক মিত্রের মতো রুচিমান শিল্পরসিকের প্রয়োজন ছিল।

কয়েকটি বিষয় তিনি খুব স্পষ্ট করে নিয়েছেন। তিনি উপন্যাসের জটিল ন্যুয়ান্সকে ধরতে চেষ্টা করবেন সহজ, প্রচলিত ইংরেজি শব্দে। কমলকুমারের যৌগিক বাক্যের কাঠামোর ভেতর ছোট ছোট স্রোতের মতো উপবাক্যগুলির কথা স্মরণ করুন, যেখানে একই সঙ্গে বিভিন্ন কাল ও মুডের বিন্যাসে এক অন্তঃশীল সাংগীতিকতার সৃষ্টি হয়। রাগসংগীতধর্মী এই বাক্যবিন্যাসকে অশোক মিত্র কীভাবে ধরেছেন তার নমুনা:

> বিলাস অন্যত্রে, কেননা সম্মুখেই, নিম্নের আকাশে, তরুণসূর্য্যবর্ণ কখনও অচিরাৎ নীল, বুদ্বুদ সকল, যদৃচ্ছাবশতঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি আর একটি এইরূপে অনেক অনেক—আসন্ন সন্ধ্যায়, ক্রমে নক্ষত্র পরম্পরা যেমন দেখা যায়—দূর কোন হরিত ক্ষেত্রের হেমন্তের অপরাহ্ন মন্থনকারী রাখালের বাঁশরীর শুদ্ধনিখাদে দেহ ধারণ করত সুডৌল দ্যুতিসম্পন্ন বুদ্বুদগুলি ইদানীং উঠানামা করে, এগুলি সুন্দর, উজ্জ্বল, বাবু, অভিমানী আশ্চর্য্য!

> Bilas was elsewhere, for, right before him against the low sky, bubbles, the colour of the young Sun, occasionally turning blue all too suddenly, floated around. One, then another, and then so many and still so many, even as the stars swim into view in rows out of the

oncoming dusk, the wellrounded, luminous bubbles bobbed up and down, their shapes issuing like pure notes in the upper register from a shepherd's pipe across green fields afar on an autumn afternoon; beautiful, scintillating, debonair, proud, marvellous.

সংগীতধর্মী, আবার ছবির মতো। কখনও তেল, কখনও জলরং।

একটি গোলাপ গাছে টর্চ পড়িতেই আশ্চর্য্য হইয়া একটি ফুটন্ত গোলাপের মধ্যে অমোঘ দুর্ব্বিনীত জোয়ার খেলা করিতেছে, কম্পমান একটি পাপড়ি রমণসুখ অনুভবের পর ষোড়শী যেমন নিশ্চিন্তভাবে এলাইয়া পড়ে তেমনই ক্রমে ধীরে এলাইয়া পড়িল...

As soon as his torch fell on a rose plant, it touched off an astonished rose bud: an irresistible, defiant tide coursed through it as it opened up, and one of its tremulous petals, like a young woman of sixteen all relaxed at the end of her orgasm, slowly lay back peacefully.

বাক্যের দুরূহ জট ছাড়াতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলতে পারে অমনোযোগী পাঠক, অনুবাদগুণে বিন্যাস বুঝতে সুবিধে হয় অনেক সময়। ফলে গুণগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটা নতুন স্বচ্ছতা যুক্ত হয়।

একদিক থেকে তাই এই আশ্চর্য অনুবাদ বহুস্তর মূল টেক্সট্‌টির পর্ব থেকে পর্বান্তরে পৌঁছে দিয়ে তাকে নতুন করে আবিষ্কার করায়।

শূন্যগর্ভ কথা আর ব্যর্থতা ছাড়া যখন বিশেষ কিছুই সম্বল নেই আমাদের, সেই সময় ভালবাসা, সাহস ও দায়বদ্ধতার জন্য এই তিনটি অনুবাদ এক অতি মূল্যবান অবদান হয়ে রইল।

১৯৯৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~